ভারতের
সাধক
শঙ্করনাথ রায়

ভারতের সাধক

(সপ্তম খণ্ড)

শঙ্করনাথ রায়

করুণা প্রকাশনী । কলকাতা-১২

সূচীপত্র

মহাযোগী গোরখনাথ

শিবচতুর্দ্দশীর ঘন অন্ধকারময় রাত্রি। পশুপতিনাথের মন্দিরে সেদিন বড় সমারোহ। দলে দলে নেপালী ভক্তেরাই শুধু জড়ো হয় নাই, সারা ভারতের দিগ্‌দিগন্ত হইতে ছুটিয়া আসিয়াছে বহু শিবভক্ত নরনারী, সন্ন্যাসী ও কৌল সাধকের দল। মেলার উৎসব-ক্ষেত্রটি আলোয় আলোময়। আর মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রহরের পর প্রহর চলিয়াছে পূজা-অর্চ্চনা ও স্তবগান। দেবাদিদেবের জয়ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখর হইয়া উঠিয়াছে।

কৌল-অবধূত মৎস্যেন্দ্রনাথ তাঁহার কয়েকটি অন্তরঙ্গ শিষ্য সেবক সঙ্গে মন্দিরে আসিয়া বসিয়াছেন। রাত্রি অবসান প্রায়। ধ্যান জপ শেষে পশুপতিনাথের মাথায় বিল্বপত্র চড়াইয়া প্রণাম শেষ করিবেন, এমন সময় মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিল এক অলৌকিক দৃশ্য! ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত কে এই নবীন যোগী? নতজানু হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতেছে, বারবার চাহিতেছে আশ্রয়ভিক্ষা!

অন্তরে কৌতূহল জাগে। বারবার প্রশ্ন উঠে, কে এই চিহ্নিত সাধক, পরমশিব যাঁহার ভার মৎস্যেন্দ্রনাথের উপর ন্যস্ত করিতে চাহেন? কোথায় রহিয়াছে সে? কি করিয়া ঘটিবে সাক্ষাৎকার?

মনে হয়, এ তরুণ দেবাদিদেবেরই প্রেরিত। এ যেন তাঁহার বড় আপনার জন, তাঁহার তপস্যাময় জীবনের পরম ধন।

নির্দ্দেশ অচিরেই মিলে। অস্ফুট দৈববাণী শ্রবণ করেন মৎস্যেন্দ্রনাথ, —"বৎস, আমার দর্শন শেষ করে সে-যে তোমারই উদ্দেশে রওনা হয়ে গিয়েছে। অরণ্যপথ ধরে, ক্লান্তপদে, তোমারই আশ্রমের সন্ধান ক'রে ফিরছে। তুমি তাড়াতাড়ি ফিরে যাও, ডেকে এনে তাকে অঙ্গীকার

ক'র। এই সাধক হবে তোমার শ্রেষ্ঠ ধারক ও বাহক। নিগূঢ় যোগ-সাধনার পথসন্ধান সে দেবে অগণিত নরনারীকে।"

ভক্তিভরে মৎস্যেন্দ্র বিগ্রহকে প্রণাম নিবেদন করেন, ত্রস্তপদে আশ্রমে ফিরিয়া আসেন। সেবকদের নির্দ্দেশ দেন, "অদূরে, জঙ্গলের ভেতর দেখা পাবে এক সুন্দর সুঠাম তেজদৃপ্ত যুবকের। সে হয়তো পথ ভুলেছে। এখানকার পরিচয় জ্ঞাপন ক'রে এক্ষুনি তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো।"

খানিক বাদেই যুবককে আশ্রমে উপস্থিত করা হয়। বকুলতলার সিদ্ধপীঠের আসনটিতে মৎস্যেন্দ্রনাথ সমাসীন। দিব্যকান্তি, সমুন্নতদেহ মহাপুরুষের সারাদেহ ভস্মে আচ্ছাদিত। শিরে জটার ভার, গলায় নাদ, সেলি, শিঙ্গা। হাতে জড়ানো রুদ্রাক্ষের মালা। পরণে কৌপীন। পার্শ্বে শায়িত রহিয়াছে সিন্দুর-চর্চিত ত্রিশূল, আদারি ও খর্পর।

মহাযোগীকে দর্শন করিয়া যুবক বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়। অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব, অলৌকিক অনুভূতিতে সারা মন-প্রাণ তাঁহার পূর্ণ হইয়া উঠে। ভাবাবেগে কম্পিত হইতে থাকে সারা অঙ্গ।

সাষ্টাঙ্গ প্রণতি সারিয়া যুক্ত করে সে নিবেদন ক'রে, "প্রভু, আপনার দর্শন পেয়ে আজ আমার জীবন ধন্য হলো। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসেছি আমি অন্তরের দুটি আশা নিয়ে। শিবচতুর্দ্দশীতে পশুপতিনাথের মাথায় চড়াবো বিল্বপত্র, আর মহাকৌল মৎস্যেন্দ্রনাথের চরণে আশ্রয় নিয়ে শুরু করবো আমার সাধনা।"

"কিন্তু বৎস, এত লোক থাকতে, আমার কাছে আসার সিদ্ধান্ত তুমি ঠিক করলে কেন, বলতো?" প্রসন্নমধুর কণ্ঠে বলেন মৎস্যেন্দ্র।

"কৌলজ্ঞাননির্ণয়-এর রচয়িতারূপে আপনার ভারতজোড়া খ্যাতি কে না জানে? তাছাড়া, প্রবীণ সাধকদের মুখে আমি শুনেছি, যোগ ও তন্ত্রসাধনার যুগ্মরশ্মি আপনি অনায়াসে ধারণ ক'রে রয়েছেন। আমার প্রার্থনা, আপনি আমায় দীক্ষা দিন।"

আশীষ জানাইয়া মৎস্যেন্দ্রনাথ বলেন, "বৎস, দেবাদিদেবের তুমি

অনুগৃহীত। তুমি তাঁর চিহ্নিত সাধক। প্রভু পশুপতিনাথের ইঙ্গিত পেয়েই যে তোমার জন্য আমি এখানে অপেক্ষা করছি। মনস্কামনা তোমার সিদ্ধ হবে। লগ্ন উপস্থিত, ভোগমতীতে তাড়াতাড়ি স্নান সেরে এসো। আজই, এখনি আমি তোমায় যোগদীক্ষা দেবো।”

বিভূতি-স্নানের শেষে যুবক যুক্তপাণি হইয়া দণ্ডায়মান হয়। গুরু পরম স্নেহে তাঁহার দেহে তুলিয়া দেন গেরুয়া কৌপীন ও বহির্ব্বাস, সারাদেহ ভস্মে বিলেপিত করিয়া ললাটে অঙ্কন করেন ত্রিপুণ্ড্র-চিহ্ন। উপবীতে ‘শিংনাদ’ ও ‘পবিত্রী’ বাঁধিয়া দিয়া নবদীক্ষিত শিষ্যের হস্তে দেন সিদ্ধিপ্রদ পরম পবিত্র মালা। প্রসন্ন মধুর কণ্ঠে কহেন, “বৎস, হিংলাজ-তীর্থ থেকে সর্ব্ব-অভীষ্টপ্রদ ঠুমরা ও আশাপুরীর এই মালা আমি সংগ্রহ করেছিলাম। এ তুমি গ্রহণ ক’র। শিব-পার্ব্বতীর কৃপা তোমার ওপর নিরন্তর বর্ষিত হোক।”

অতঃপর, যোগদীক্ষা ও নিগূঢ় সাধন-পদ্ধতি দান করিয়া মৎস্যেন্দ্রনাথ নূতন শিষ্যের নামকরণ করেন—গোরক্ষনাথ। জনসাধারণের মুখে মুখে এই নামই পরে হইয়া উঠে—গোরখনাথ।

উত্তরকালে ভারতীয় জনজীবনের সমক্ষে গোরখনাথ আবির্ভূত হন অপরিমেয় যোগবিভূতির অধিকারী এক মহাসাধকরূপে। শিবাবতার বলিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধি রটে, দিকে দিকে পূজিত হন লক্ষ লক্ষ ভক্তের হৃদয়-মন্দিরে।

এ দেশের অধ্যাত্মজীবনে আচার্য্য শঙ্করের অভ্যুদয়ের কয়েক শত বৎসরের মধ্যে এমন বিরাট পুরুষের সাক্ষাৎ আর মিলে নাই।

সাধন-ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে যোগীরাজ গোরখনাথের জীবনে মিলিত হইয়াছিল অপূর্ব্ব ব্যক্তিত্ব ও সংগঠনশক্তি। তাই স্বল্পকাল মধ্যে আদিনাথ ও মৎস্যেন্দ্রনাথের যোগীগোষ্ঠীকে পুনর্গঠিত করিয়া তুলিতে তিনি সক্ষম হন, নূতন প্রেরণা ও দিক্‌দর্শন দিয়া তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁহার আশ্রিত এই সাধক ও সন্ন্যাসীর দল উত্তর ভারতের

সকল তীর্থ ও জনপদে ছড়াইয়া পড়ে, পরিচিত হয় কানফট্ যোগী নামে।

এই যোগী সাধকদের তপস্যা ও ঋদ্ধি সিদ্ধির প্রভাব যে ভারতের দূর-দূরান্তে এবং বর্হিভারতে ব্যাপ্ত হয় তাহার প্রমাণ আছে। পূর্ববাঞ্চলে কামরূপ, উত্তরে নেপাল, গোরখপুর ও বারাণসী, পশ্চিমে ধিনোধর ও হিংলাজে এই সাধকদের বহু সাধনকেন্দ্র গড়িয়া উঠে। দক্ষিণে মলয়ালম-ভাষী যোগী গুরুক্কলদের মধ্যে নাথসাধনার ঐতিহ্য পাই। সুদূর ইরাণ, আরব ও রাশিয়ায়ও যে নাথযোগীরা পদার্পণ করেন তাহা বিশ্বাস করিতে হয়। রাশিয়ার বাকুতে জ্বালামুখী দেবীর এক মন্দির আছে, জনৈক নাথপন্থী এবং শৈবসাধক ইহার প্রতিষ্ঠাতা—এ কথা ঐ মন্দিরগাত্রে খোদিত দেখা যায়। ইরাণ ও আরবের সুফী সাধকেরা নাথপন্থীদের মতই কায়াযোগ সাধনের উপর জোর দেন—তাঁহাদের উপর ভারতীয় নাথযোগীদের প্রভাব কতটা পড়িয়াছিল তাহাও অনুসন্ধানের যোগ্য।

গোরখনাথের জন্ম কোথায়, কোন্ সময়ে তিনি আবির্ভূত হন তাহা সঠিক বলার উপায় নাই। তাঁহার নিজের বাণী ও রচনার বিচারবিশ্লেষণ এ সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত হয়তো করিতে পারে, কিন্তু প্রক্ষিপ্ত অংশের বিভ্রান্তি ভেদ করিয়া তাহা হইতে সত্য নির্দ্ধারণ করা কঠিন। রূপকথা ও জনশ্রুতির ধূম্রজালও এই মহাযোগীর জীবন ও যোগবিভূতিকে কেন্দ্র করিয়া কম গড়িয়া উঠে নাই। কাজেই এ সম্পর্কে যাহা কিছু বলার, মোটামুটিভাবেই শুধু বলা যায়।

আনুমানিক দশম শতকে, পূর্ব্ব ভারতের সিদ্ধপীঠ 'কামরূপে' গোরখনাথ আবির্ভূত হন।[১] 'গোরখ-বাণী'র একটি ভণিতায় তিনি বলিতেছেন,—

---

[১] গ্রিয়ারসন, ব্রিগ্স্, তেসিতোরী প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিত অনুমান করেন, যোগীবরের জন্মস্থান পাঞ্জাবে বা পশ্চিম ভারতের অপর কোন অঞ্চলে। 'গোরখনাথ' প্রণেতা ডক্টর মোহন সিং-এর মতে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন পেশোয়ারের কাছাকাছি অঞ্চলে।

পূরব দেশ পঁছাহী ঘাটী
(জনম) লিখ্যা হমারা জোগঁ,
গুরু হমারা নাঁওগর কহীএ,
মেটৈ ভরম বিরোগঁ।[১]

—দেশ আমার পূর্ব্বাঞ্চল, আর পশ্চিমে রয়েছে বিচরণের ক্ষেত্র। জনম অবধি ভাগ্যে আমার লেখা আছে যোগ। গুরু আমার যেন নৌকার মাঝি, ভ্রমরূপ রোগ সদা করেন নিরাময়। দেশ পূর্ব্বাঞ্চল এবং জন্মাবধি যোগের বিধিলিপি—এ কথা হইতে পূবর্বীয় সিদ্ধপীঠ, যোগী তান্ত্রিকদের তপঃক্ষেত্র কামরূপের কথাই স্বাভাবিক ভাবে মনে আসে।

গোরখনাথের নামে প্রচারিত বাণী ও রচনা বাংলা-ভাষায় পাওয়া যায় না, ইঁহাদের অধিকাংশই হিন্দিতে রচিত। বিশিষ্ট গবেষক ডক্টর মোহন সিং-এর মতে, যোগীবর গোরখনাথই হিন্দি গদ্যের প্রথম লেখক। এই কারণে একদল পণ্ডিত মনে করেন, যোগীবর গোরখনাথ মোটেই পূর্ব্বাঞ্চলের লোক নন। কিন্তু এই ধারণা যুক্তিসহ নয়। গোরখনাথ সম্পর্কে যে সব কথা ও কাহিনী সারা ভারতে বিস্তারিত হইয়াছে, তাহার মূল কাহিনী রহিয়াছে বাংলাদেশে। বহির্ব্বাংলায় প্রচলিত গোরখের বাণী ও গোরখের রচনায় বাংলার মূল বাণী ও কাহিনীর প্রতিধ্বনি মিলে এবং নানা অংশের বিক্ষিপ্ত ও পরিবর্ত্তিত অবস্থার রূপ পাওয়া যায়।

বাংলা সাহিত্যের খ্যাতনামা গবেষক ডক্টর সুকুমার সেনের মন্তব্য

---

[১] গোরখবাণীর সম্পাদনাপ্রসঙ্গে ডক্টর পীতাম্বর বড়থোয়াল এই ভণিতার এক অলৌকিক রূপক ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বিশ্বভারতী বিদ্যাভবনের উপাধ্যায় পঞ্চানন মণ্ডল সে সম্পর্কে যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা সমীচীন মনে করি। তিনি লিখিতেছেন, "…এই সম্পাদকীয় রূপক ব্যাখ্যার আবরণ উন্মোচন করিলে আমরা যে তথ্যটি পাই তাহাতে গোর্খনাথকে ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তের অধিবাসী এবং পশ্চিমের নানা অঞ্চলে বিচরণকারী বলিয়া স্বচ্ছন্দে ধরিয়া লইতে পারি। তিনি পূর্ব্ব দেশের অধিবাসী বলিয়া তাঁহার ভাগ্যে যোগ লিখা থাকার মধ্যে বাংলা প্রান্তের বিখ্যাত যোগপীঠের ধারণা অনায়াসেই করা যায়। গোর্খবিজয়ের 'পশ্চিমেতে গোর্খ গেল' আমাদের এই উক্তিকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত করে।"

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, "নাথপন্থের, উৎপত্তি ও বিকাশ যে বাঙ্গালা-কেন্দ্রিক পূর্বভারতে ঘটিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। ইহার প্রাচীন সাহিত্য বাঙ্গালাতেই পাওয়া যায় এবং তাহারই মধ্যে ইহার প্রাচীনতর রূপটি প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে। বাঙ্গালাদেশের বাহিরের যোগীসম্প্রদায়ের ঐতিহ্যের ধারা যে বাঙ্গালাদেশ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল তাহারও প্রমাণ অবিরল নয়।"

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার উপান্তস্থিত মহা-শক্তিপীঠ কামাখ্যা অঞ্চলে গোরখনাথ আবির্ভূত হন একথা বলা মোটেই অযৌক্তিক নয়।

অখ্যাত অজ্ঞাত দীন-দুঃখীর ঘরে যোগী গোরখনাথের জন্ম। মাতা ছিলেন পরম ভক্তিমতী। সংসারের কাজকর্ম্ম সারিয়া শিবের উপাসনা ও জপধ্যানে তাঁহার সময় কাটিয়া যাইত পরম আনন্দে। নিত্যকার পূজাশেষে ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ মাগিতেন আর অন্তরে চকিতে খেলিয়া যাইত একটি গোপন অভিলাষ—ইষ্টদেব শিবেরই মত একটি পুত্র যেন তাঁহার কোল জুড়িয়া আসে।

অন্তরের কথা অন্তর্য্যামী প্রভু শুনিলেন। একদিন গভীর রাত্রে পূজার শেষে এই ভক্তিমতী সাধিকা ঠাকুরের চরণে প্রণাম নিবেদন করিতেছেন, হঠাৎ সবিস্ময়ে দেখিলেন—সারা কুটির স্নিগ্ধ শুভ্র জ্যোতিতে ভরিয়া উঠিয়াছে, আর সেই জ্যোতিঃপুঞ্জের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে দেবাদিদেবের করুণাঘন মূর্ত্তি।

দিব্য আনন্দের তরঙ্গ তুলিয়া প্রভু কহিলেন, "বৎসে, তোমার ভক্তিনিষ্ঠায় আমি প্রসন্ন হয়েছি। তোমার অন্তরের আকাঙ্ক্ষাটি আমার কাছে ব্যক্ত ক'র। আমি তা পূর্ণ করবো।"

সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতের পর সাধিকা উত্তর দেন, "প্রভু, আমার প্রাণের ইচ্ছে তো তুমি ভাল করেই জানো। তোমারই মতন পুত্র আমি চাই।"

"তথাস্তু। যোগসিদ্ধ মহাজ্ঞানী এক তনয় আসবে তোমার গৃহে।"

সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত রমণীর সম্মুখে পতিত হয় বিল্বপত্রে জড়ানো কিঞ্চিৎ ভস্ম।

প্রভু বলিয়া দিলেন, "ওগো, এই ভস্মটুকু তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলবে, লাভ করবে তোমার প্রার্থিত ধন।"

বৎসরেক কালের ব্যবধানে এই শিব-উপাসিকার কোলে আবির্ভূত হয় দিব্যকান্তি শিশু—উত্তরকালের শিবকল্প মহাযোগী গোরখনাথ।

দরিদ্রের সন্তান যেমন করিয়া বাড়িয়া উঠে, গোরখনাথের জীবনে তাহার ব্যত্যয় দেখা যায় নাই। মায়ের সঙ্গে নিত্যকার দুঃখ দারিদ্র্যের কষাঘাত তাঁহাকেও সহ্য করিতে হয়। মায়ের কাছে কাছে থাকিয়া প্রতিদিন বালক সংগ্রহ করে শিবপূজার উপচার, পূজাশেষে শ্রদ্ধাভরে মাথায় তুলিয়া নেয় নির্ম্মাল্য ও প্রসাদ।

আর কেহ জানুক না জানুক, জননী মর্ম্মে মর্ম্মে জানেন—পুত্র তাঁহার শুদ্ধ সংস্কার নিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, শিব-বরের সৌভাগ্য নিয়া হইয়াছে আবির্ভূত। গৃহস্থের ধনজন গৃহ যে এই বৈরাগী পুত্রের জন্য নয়, এ বিষয়েও তিনি নিঃসংশয়। অতঃপর শ্রীভগবান এ পুত্রকে নিয়া কোন্ নিগূঢ় খেলা খেলিবেন তাহা কে জানে? পুত্রের ভবিষ্যৎ-চিন্তা জননীর অন্তরকে মাঝে মাঝে চঞ্চল করিয়া তোলে।

গোরখনাথের যখন বারো বৎসর বয়স তখন হঠাৎ গৃহে একদিন বড় অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। ভাঁড়ারে সেদিন চাল বাড়ন্ত, ঘরে পয়সাকড়ি কিছুই নাই। কি উপায় করা যায়? কুটির-প্রাঙ্গণে একরাশ গোবর ঢালিয়া নিয়া জননী ঘুঁটে তৈরী করিতে বসিলেন, বাজারে ইহা বেচিয়া যদি কিছু পাওয়া যায়।

বালক গোরখনাথও এসময়ে মায়ের পাশে আসিয়া বসে, হাত বাড়াইয়া তাহাকে সাহায্য করিতে থাকে।

এ সময়ে অদূরস্থ রাস্তায় শোনা যায় বহু লোকের কলরব। জটাজুট-সমন্বিত এক প্রবীণ সন্ন্যাসী তাঁহাদেরই ক্ষুদ্র কুটিরের দিকে ধীরপদে আগাইয়া আসিতেছেন। পিছনে গ্রামের একদল লোক। সকলেরই চোখে-মুখে কৌতূহল ও বিস্ময়ের ছাপ।

বালক গোরখনাথের সম্মুখে আগাইয়া আসিয়া সন্ন্যাসী নিবেদন করেন সশ্রদ্ধ প্রণাম, উদাত্ত স্বরে গাইয়া উঠেন স্তুতিগান। বালকেরও দেখা যায় অপূর্ব্ব ভাবাবেশ। দিব্য চেতনায় সারা দেহ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, নয়ন দুটি নিষ্পলক। গোময়লিপ্ত হস্ত দুটিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে নিগূঢ় যোগমুদ্রা।

গোরখনাথের জননীর দিকে ফিরিয়া সন্ন্যাসী এবার মৃদু মধুর স্বরে কহিলেন, "মা, তোমার এই গোময়স্তুপের মাঝ থেকে আজ আমি আবিষ্কার করে গেলাম এক মহাযোগীকে। স্বয়ং শিবই কৃপা করে আমায় দিয়েছেন এর ইঙ্গিত। তোমার কোল পবিত্র, কুল পবিত্র। আর সারা দেশ ধন্য হয়েছে এমন ছেলেকে পেয়ে। কিন্তু মাগো, তোমার কোন কাজেই এ আর লাগবে না। এ বালক প্রেরিত-পুরুষ, অচিরে সে বেরিয়ে পড়বে ঈশ্বরের নির্দ্ধারিত কাজে।"

সন্ন্যাসীর কথা ফলিতে দেখা গিয়াছিল। পরের দিন প্রত্যূষে উঠিয়া জননী বালককে আর দেখিতে পান নাই, চিরতরে সে সংসার ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

নেপালে আজো একটি কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে—এক পুত্রার্থিনী নারীর প্রার্থনায় ভগবান আশুতোষ কৃপাপরবশ হন এবং তাঁহাকে নিজ ধুনীর ভস্ম প্রদান করেন। ঐ ভস্ম ছিল তাঁহার ভক্ষণের জন্য কিন্তু ভুল বুঝার ফলে নারী ঐ ভস্মমুষ্টি গোময়ের স্তূপে নিক্ষেপ করেন। বারো বৎসর পরে এক সিদ্ধযোগী ঐ গোময় হইতে আবিষ্কার করেন সিদ্ধাচার্য্য গোরখনাথকে।

গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার পর গোরখনাথ সাধু-সন্ন্যাসীর দলে ভিড়িয়া পড়েন। পরিব্রাজন ও তীর্থদর্শনে অতিবাহিত হয় কয়েকটি বৎসর। শৈবসাধনার পূর্ব্ব সংস্কার নিয়া জন্মিয়াছেন, তাই কোথাও শৈবসাধক ও যোগী দেখিলেই আগাইয়া তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা করেন। তাঁহাদের উপদেশ ও শিক্ষায় ধীরে ধীরে গোরখনাথের সাধন-প্রস্তুতি গড়িয়া উঠিতে থাকে।

উত্তরভারতে তখন যোগিনী কৌলসিদ্ধ মৎস্যেন্দ্রনাথের খুব নাম-ডাক। তাঁহার রচিত কৌলজ্ঞান-নির্ণয়-এর প্রচার দিকে দিকে। যুবক গোরখনাথ মনে মনে স্থির করিলেন, এই মহাসাধকের আশ্রয়ই তিনি গ্রহণ করিবেন, মাগিবেন তাঁহার কাছে যোগদীক্ষা। তাই শিব চতুর্দ্দশীর পুণ্যদিনে পশুপতিনাথ দর্শন করিয়াই মৎস্যেন্দ্রনাথের আশ্রম-সন্ধানে তিনি বাহির হইয়া পড়েন। তারপর সিদ্ধ হয় তাঁহার মনস্কামনা।

দীক্ষার পর গুরু কহিলেন, "বৎস, তোমার সংস্কার শুদ্ধ, দেহ পরম পবিত্র, উত্তম অধিকারী তুমি, সন্দেহ নেই। কিন্তু যে মহান্ নাথযোগ-ধর্ম্মে আজ আশ্রয় নিলে তার সাধনা ও সিদ্ধি কিন্তু অতি দুরূহ।"

"আপনার কৃপা ও উপদেশে আমি আমার ব্রত উদ্‌যাপন করতে পারবো, এ বিশ্বাস রয়েছে। আপনি গুরু—নবজীবনদাতা, নবজীবনের প্রতিষ্ঠাতা। প্রাণ দিয়েও যে আপনার নির্দ্দেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে যাবো।"—যুক্তকরে উত্তর দেন গোরখনাথ।

"বৎস, লৌকিকভাবে আমি গুরু ঠিকই, কিন্তু আসল গুরু হচ্ছেন তিনি—যাঁর ভেতর সৃষ্টির আদি ও অন্ত বিধৃত রয়েছে। 'স পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ'—কালজয়ী সেই পরম শিবই সকল সাধকের প্রকৃত গুরু। তোমার সাধনার সিদ্ধির অন্তে রয়েছে সেই চিরন্তন গুরুর স্বরূপ অর্জ্জন করা—নাথত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়া।"

"সেই পরম সত্তার সাথে যাতে যুক্ত হতে পারি, দয়া করে তার নিগূঢ় সাধন-পথটি এবার আমায় দেখিয়ে দিন।"

"নিশ্চয়ই দেখাবো, বৎস। নাথ যোগধর্ম্মের বিরাট প্রতিশ্রুতি যে তোমার ভেতর নিহিত রয়েছে। তোমার ওপর যে আমার অনেক আশা, অনেক ভরসা।"

সস্নেহে তরুণ শিষ্যের শিরে হাত রাখিয়া গুরু আবার কহিতে থাকেন, "বৎস, একৈকনিষ্ঠ হয়ে দীর্ঘদিন তোমায় হঠযোগ, লয়যোগ ও রাজযোগের সাধন নিতে হবে। আমাদের সম্প্রদায়ে হঠযোগ দ্বারা

রাজযোগের দৃঢ় সোপান আগে নির্ম্মাণ করে নিতে হয়।”

“কৃপা ক’রে এ তত্ত্ব আমায় বুঝিয়ে বলুন।”

“প্রথমে তোমায় ধৌতি, বস্তি, নেতি, ত্রাটক, নৌলিক ও কপালভাতি—এই ষট্‌কর্ম্ম সাধন করতে হবে। এতে সাধকদেহে স্ফুরিত হয় নানা ধরণের শক্তি। পরবর্ত্তী স্তরে হবে মহত্তর শক্তির উদ্বোধন। জরা মরণ হবে তোমার আয়ত্তাধীন। মহামুদ্রা, মহাবন্ধ, মহাবেধ, খেচরী, উড্‌ডান, মূলবন্ধ, জালন্ধর বন্ধ, বিপরীত করণী, বজ্রোলী, শক্তিচালন—এই দশটি মুদ্রাও আমি তোমায় সযত্নে শিক্ষা দেবো।”

“এ আমার পবম সৌভাগ্য, প্রভু।”

“এই সব মুদ্রায় সিদ্ধ হলে জরা-মরণের ওপর আসে যোগীর প্রভুত্ব। অষ্টসিদ্ধি হয় করতলগত। কায়াসাধনের ওপর আমাদের পূর্ব্বতন যোগীবা জোর দিয়ে গিয়েছেন। এই সাধনায় সিদ্ধ হয়ে, পক্কদেহ লাভ ক’রে তুমি জীবন্মুক্ত অবধূতরূপে বিচরণ করতে পারবে। আর সেই সঙ্গে রাজযোগেব সমাধিব ভেতর দিয়ে পূর্ণজ্ঞানে হবে প্রতিষ্ঠিত, লাভ করবে নাথ-সাধনার পবম প্রাপ্তি—শিব-স্বারূপ্য।”

নেপালে কয়েক বৎসর গুরুর সান্নিধ্যে গোবখনাথ অবস্থান করেন। নিষ্ঠাভরে সম্পন্ন করেন তাঁহাব অধ্যাত্ম সাধনার প্রতিটি অঙ্গ। ভাগ্যগুণে শিবকল্প যোগীগুরুর আশ্রয় মিলিয়াছে, কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবায় তিনি প্রাণমন ঢালিয়া দিলেন। সেই সঙ্গে কঠোব কৃচ্ছ্র সাধনের মধ্য দিয়া যৌগিক সাধনার সোপানগুলি একে একে অতিক্রম করিয়া চলিলেন।

সেদিন মৎস্যেন্দ্রনাথ নিভৃতে তাঁহাকে ডাকিয়া কহেন, “বৎস, গুরুর সান্নিধ্যে থেকে, স্থির হয়ে বসে উপদেশ গ্রহণ ক’রে যে নিগূঢ় সাধনা সম্পন্ন করতে হয়, তা তোমার হয়েছে। এবার কিছুদিন আমার সঙ্গে তোমায় পরিব্রাজন করতে হবে। সম্প্রদায়ের তীর্থগুলো দর্শন না করলে সাধনার ভিত্তি দৃঢ় হয় না। পাঞ্জাব, সিন্ধু ও হিংলাজ পরিব্রাজন প্রথমে শেষ ক’র। তারপর অযোধ্যার উত্তরাঞ্চলের গভীর অরণ্যে গিয়ে

আসন বিছাও, শুরু কর কঠোর তপস্যা। সেখানেই লাভ করবে তোমার যোগসাধনার শ্রেষ্ঠ ফল।"

প্রথমে উভয়ে কাশী, বৃন্দাবন, কেদার বদরী প্রভৃতি সারিয়া চলিলেন দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে। একের পর এক রামেশ্বর, ত্র্যম্বক, পুষ্কর, দ্বারকা প্রভৃতি তীর্থ দর্শনও শেষ হইল।

এবার মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রিয় শিষ্যকে কহিলেন, "বৎস, নাথযোগীরা দীক্ষান্তে যে সব তীর্থ দর্শন ক'রে তাদের মধ্যে হিংলাজের গুরুত্ব অত্যধিক। যোগ সাধনাকে যারা সার্থক ও পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে চায়, তাদের পক্ষে এ স্থানে পরিব্রাজন ও দেবীর পূজা হোম অবশ্য অনুষ্ঠেয়। কিন্তু এ তীর্থের পথ বড় দুর্গম।"

"তা হোক না প্রভু। কিন্তু এই হিংলাজের অবস্থান কোন্ দিকে?" —প্রশ্ন করেন গোরখনাথ।

"এ তীর্থ মক্‌রাণে, পশ্চিম সমুদ্রতীরে। সিন্ধুনদের মোহনা থেকে প্রায় আশী মাইল দূরে যেতে হয়। হিংলাজ পর্ব্বতশৃঙ্গের নীচেই হিংগল নদীর ধারে অবস্থিত শক্তিসাধনার মহাপীঠ এই হিংলাজ তীর্থ।"

"কি এর বিশেষ মাহাত্ম্য, গুরুদেব?"

"একান্ন সতীপীঠের অন্যতম এটি। দেবীর কপাল এখানে পতিত হয়েছিল—কারো কারো মতে দেবীর কিরীট। আর এখানকার মন্দিরটি উৎসর্গ করা হয়েছে অগ্নিদেবীর নামে। দেবী হিংলাজ হিংগুদা নামেও অভিহিতা হন। শ্রেষ্ঠতম শক্তি বিভূতি যে সাধকেরা অর্জ্জন করতে চায়—তা সে যোগীই হোক্ কি তান্ত্রিকই হোক, তাকে এখানে আসতেই হবে, বৎস।[১]

---

[১] হিংলাজ, নাগরঠাটা ও কোটেশ্বর একসময়ে পশ্চিম ভারতের প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ তীর্থ ছিল। হিমালয় ও কাশীর তীর্থসমূহের মতই ছিল ইহাদের খ্যাতি ও মর্য্যাদা। ভারত ও পশ্চিম এশিয়ার যোগাযোগ প্রাচীনকালে এখানকার কয়েকটি তীর্থের, বিশেষ করিয়া হিংলাজের, মাধ্যমে সাধিত হইত। উত্তরকালে এই তীর্থদেবী হিংলাজকে মুসলমানেরা বলা শুরু করে বিবি-নানী। মুসলমানেরা

এই হিংলাজ মন্দিরে বামাচারী সাধন প্রথার প্রাধান্য বহুকালের। তাহা সত্ত্বেও দক্ষিণাচারী তান্ত্রিক, শৈবযোগী ও নাথযোগীরাও দলে দলে এই তীর্থ দর্শনে গমন করিত।

করাচী-মিয়ানী-হিংলাজ রোড ধরিয়া ভক্ত তীর্থকামীদের যাইতে হয় মক্‌রাণ সমুদ্রতীরের দিকে। রাস্তা যেমনি দুর্গম, তেমনি বিপদসঙ্কুল। তীর্থযাত্রীরা প্রায়ই চল্লিশ পঞ্চাশ জনের এক একটি যাত্রীদলে বিভক্ত হইয়া রওনা হয়। ব্রাহ্মণ পাণ্ডা আগুয়ারা তাহাদেব নেতৃত্ব নেয় ও সকল কিছুর তত্ত্বাবধান করে এবং রাস্তায় প্রায় পনেরটি স্থানে পূজা তর্পণ ইত্যাদি করিতে হয়। নিকটস্থ একটি পাহাড়ের গহ্বরে একটি নির্দ্দিষ্ট পবিত্র স্থান রহিয়াছে, সেখানে দেবীর উদ্দেশে বহু সংখ্যক পশুবলি দেওয়া হয়।

প্রাচীন রীতি অনুযায়ী হিংলাজে পৌঁছিয়া যাত্রীরা দেবীর চরণে ঠুমরার মালা উৎসর্গ ক'রে ও শ্রদ্ধাভরে তাহা গলায় পরে।

গোরখনাথের একটি প্রাচীন ও জাগ্রত ধুনী ঐ তীর্থে রহিয়াছে। যোগী ও কৌল সাধকদের কাছে এটি পরম পবিত্র। হিংলাজ হইতে ফিরিবার পথে যাত্রীরা কোটেশ্বরের মহাদেব দর্শন করে। গোরখনাথী যোগীরা এখানে দক্ষিণ বাহুতে যোনীলিঙ্গের চিহ্ন অর্থাৎ শিবশক্তির মিলন চিহ্ন সাগ্রহে অঙ্কিত করিয়া নেয়।

নাথযোগীদের প্রিয় ও পবিত্র চুণা-পাথরের অজস্র মালা এখানে সব সময়ে পাওয়া যায়। পাথরের এই সব ছোট ছোট দানাকে বলে হিংলাজ-কা-ঠুমরা, আর একটু বড় আকারের দানাগুলি পরিচিত আশাপুরী নামে। পাঁচশত বা হাজার দানার এক একটি মালা যোগী ও ভক্ত দর্শনার্থীরা নাগরঠাটা হইতে কিনিয়া নেয়, হিংলাজ তীর্থে পৌঁছিয়াই এগুলি দেবীর চরণে সোৎসাহে করে উৎসর্গ। তারপর পরমানন্দে উহা কণ্ঠে ধারণ করে।

এই স্থানগুলি অধিকার করার পরও হিন্দুযাত্রীদের তীর্থ দর্শনে ছেদ পড়ে নাই অন্ততঃ পাকিস্থান সৃষ্টির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত।

তীর্থ কৃত্যাদি শেষ করিয়া ফিরিবার পথে নাগরঠাটার আশাপুরী দেবীকে দর্শন করা যাত্রীদের এক অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম। ভক্তের আশা ও অভীষ্টপূর্ণ করেন, তাই নাম তাঁর আশাপুরী। দেবীর চরণে স্পর্শ করাইয়া বড়দানার চুণা-পাথরের মালা যোগীরা পরম শ্রদ্ধায় গলায় জড়াইয়া রাখে—এই মালার নামও আশাপুরী।

বহুতর অরণ্য পর্ব্বত নদী প্রান্তর অতিক্রম করিয়া মৎস্যেন্দ্র ও গোরখ সিন্ধুর রাজধানী নাগরঠাটায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আধুনিক করাচী হইতে প্রায় সত্তর মাইল ব্যবধানে মাকৃলি পর্ব্বতের মালভূমির উপরে তৎকালে এই নগরী অবস্থিত ছিল।

পথ চলিতে চলিতে, গোরখনাথ প্রশ্ন করেন, "গুরুদেব, আশাপুরীর এ মালাকে যোগীরা কেন এত কল্যাণকর মনে করেন?

সস্নেহে মৎস্যেন্দ্রনাথ উত্তর দেন, "তবে শোন, বৎস। এ পবিত্র মালার সঙ্গে হরপার্ব্বতীর এক অপূর্ব্ব লীলার কাহিনী জড়িত হয়ে রয়েছে। সিদ্ধযোগী ভক্ত ও তীর্থযাত্রীরা সে লীলার অনুধ্যান করে আসছেন প্রাচীনকাল থেকে।"

"কৃপা ক'রে সবিস্তারে আমায় সব বলুন।"

সংক্ষেপে মৎস্যেন্দ্রনাথ বলিয়া চলিলেন সেই লীলা-কথা:

—আশাপুরী অরণ্যের ভেতর দিয়ে প্রভু শিবজী ও পার্ব্বতী একবার সিদ্ধপীঠ হিংলাজে যাচ্ছেন। চলতে চলতে শিব এক সময়ে বললেন— "প্রিয়ে, আমার বড় ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে। তুমি তাড়াতাড়ি খিচুড়ি রান্না করে দাও। আর আমি ততক্ষণে এই গহন অরণ্য থেকে বার হবার সোজা পথটা একবার ঘুরে দেখে আসি।"

পার্ব্বতী পরমানন্দে তখনই রান্নার যোগাড়ে বসিলেন। যাওয়ার সময় শিব কহিলেন, "প্রিয়ে, আমার মনশ্চক্ষের সামনে একটা আসন্ন বিপদের দৃশ্য কিন্তু হঠাৎ ভেসে উঠলো। আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে এই বনের কোন হিংস্র অসুর উপস্থিত হতে পারে। তোমার

ক্ষতি সাধনের চেষ্টাও হয়ত সে করবে।”

“সে কি গো! তাই যদি হয়, তবে আমায় এমন একলা ফেলে রেখে তুমি চলে যাচ্ছো কেন?” —পার্ব্বতী অনুযোগের সুরে, বলিয়া উঠেন।

“না প্রিয়ে, কোন ভয় নেই। তোমার চারদিকে মন্ত্রঃপূত ভস্ম-রেখার এক বন্ধনী আমি দিয়ে যাচ্ছি। এই বন্ধনীর ভেতরে আসবার চেষ্টা করলে অসুর তক্ষুনি ভস্ম হয়ে যাবে। তাছাড়া, আমার ত্রিলোক-জয়ী ত্রিশূল রইলো তোমার পাশে। প্রয়োজন হলে এই মারণাস্ত্র তোমার কাজে লাগবে।”

সতর্কতামূলক ব্যবস্থাদি করিয়া শিব অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে কিছুক্ষণ বাদেই এক ভীমকায় রক্তচক্ষু দানব সেখানে আসিয়া উপস্থিত। বনমধ্যে একাকিনী পার্ব্বতীকে দেখিয়াই কাম লালসায় সে উন্মত্ত হইয়া উঠে, দুই বাহু প্রসারিয়া তাঁহাকে ধরিবার জন্য ধাবিত হয়। ক্রুদ্ধা হইয়া দেবী তখনি সক্রোধে তাহার দিকে নিক্ষেপ করেন শিবের শত্রুধ্বংসী ত্রিশূল। মুহূর্ত্তমধ্যে আহত দানবের দেহ ভূমিতে লুটাইয়া পড়ে, ফিন্‌কি দিয়া ছুটিতে থাকে রক্তধারা। ঐ রক্ত লাগিয়া দেবীর তৈরী খেচরান্ন অপবিত্র হইয়া যায়।

স্বল্পকাল পরেই শিব ঘটনাস্থলে ফিরিয়া আসেন। দানবের প্রেতাত্মা তাঁহার চরণে পতিত হয়, কাতর কণ্ঠে বলিতে থাকে, “প্রভু, তোমার নিজের ত্রিশূলে আমার মৃত্যু হয়েছে, আর জগজ্জননী পার্ব্বতী স্বহস্তে করেছেন আমায় নিধন। তাই আমায় তোমাকে মুক্তি দান করতেই হবে।”

আর্ত্তি ও স্তবস্তুতিতে বিগলিত হন আশুতোষ। দয়ার্দ্র হইয়া বলিয়া উঠেন, ‘তথাস্তু’।

দানবের আত্মা তৎক্ষণাৎ মুক্তি লাভ করে, শিবধাম কৈলাসে গিয়ে উপনীত হয়। আর তাহার মরদেহ হয়—ভস্মরাশি। সেই ভস্মই পরিণত হইয়াছে দেবপূজার সুগন্ধী ধূপে।

শিবের আদেশে, অপবিত্র-করা সবটা আহার্য্য বনতলে ঢালিয়া ফেলা হয়। ঐ খেচরান্নের দানাসমূহ অচিরে হয় প্রস্তরীভূত আর তা থেকে উৎপন্ন হয় পরম পবিত্র ঠুমরা ও আশাপুরীর দানা।

দূর দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া গোরখনাথ এবার গুরুসহ উপনীত হন মক্‌রাণের উপকূলে। মরুপ্রান্তরে অধিষ্ঠিতা রহিয়াছেন মহাশক্তির জাগ্রত বিগ্রহ হিংগুলা দেবী, তাঁহার দর্শন ও পূজা হোম সম্পন্ন করিয়া নবীন সাধক দিব্য আনন্দে ভরপুর হইয়া উঠেন।

দিনান্তের রক্তসূর্য্য দিক্‌চক্রবালের গর্ভে বহুক্ষণ তলাইয়া গিয়াছে। বিশাল মরু প্রান্তরের দিক্ দিগন্তে, রুক্ষ পাহাড়শ্রেণীর গায়ে গায়ে ছড়াইয়া পড়িয়াছে অমানিশার ঘন অন্ধকার। হিংগুলাব বলি-গহ্বর নীরব নিথর। শত শত ছাগ ও মহিষের খণ্ডিত দেহ সেখানে পড়িয়া আছে ইতস্তত। ব্রাহ্মণ পাণ্ডা আগুয়াদের ডাকহাঁক তখন আর নাই, পূজা হোম ও বলিদানের শেষে শ্রান্ত ক্লান্ত তীর্থ যাত্রীরা যে যাহার তাঁবুর আশ্রয়ে ফিরিয়া গিয়াছে। নিদ্রার কোলে গা ঢালিবার জন্য সবাই উদ্‌গ্রীব। এমন সময় গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ গোরখনাথকে নিকটে ডাকাইলেন। গোপনে মৃদুস্বরে কহিলেন, "বৎস, তুমি আর নিদ্রা যেয়োনা, মধ্য রাত্রে মন্দিরে গিয়ে আরাধনা শুরু ক'র। আজ বড় শুভ যোগ, মহাদেবী নিশ্চয় প্রসন্না হবেন, বর দানে করবেন তোমায় কৃতার্থ।"

নির্দ্দেশ অনুযায়ী গভীর রাতে গোরখনাথ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া হইলেন ধ্যানস্থ। দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, রাত্রির তখন শেষ যাম। সারা গর্ভগৃহটি হঠাৎ এক সময়ে শুভ্র বর্ণ স্বর্গীয় আলোকে উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠে। দেবী চিন্ময়ী মূর্ত্তিতে দর্শন দেন, মধুর কণ্ঠে ডাকিয়া কহেন, "বৎস, গোরখনাথ, তোমার ত্যাগবৈরাগ্য ও সাধন-নিষ্ঠায় আমি প্রীতা হয়েছি। আমার কাছে তুমি বর প্রার্থনা ক'র।"

"জগন্ময়ী, কৃপা ক'রে তুমি আবির্ভূতা হয়েছো, এতেই আমার জীবন হয়েছে সার্থক। আর আমি কি চাইবো তোমার কাছে?"

"বৎস, আমি আশীর্ব্বাদ করি, তুমি আজ থেকে অষ্টসিদ্ধির অধিকারী হবে। যোগী ও তন্ত্রসাধকের কাম্যধন মহাজ্ঞানের পথেও তুমি এগিয়ে যাবে, লাভ করবে শিব সারূপ্য।"

অন্তর্হিতা হইবার আগে দেবী একটি বিশেষ নির্দ্দেশ তাঁহাকে দিয়া গেলেন। কহিলেন, "এখান থেকে সোজা তুমি মহাতীর্থ অমরনাথে যাও, বিগ্রহীভূত পরমশিবকে দর্শন স্পর্শন করে ধন্য হও।"

পদব্রজে পথ চলিতে চলিতে গুরু ও শিষ্য উভয়ে কাশ্মীরের অমরনাথে আসিয়া উপস্থিত। দেবাদিদেবের অত্যাশ্চর্য্য প্রতীক তুষারলিঙ্গ দর্শনে গোরখনাথের আনন্দের অবধি নাই। তাড়াতাড়ি নিকটস্থ হিমধারায় স্নান সারিয়া আসিয়া গুহামধ্যে তিনি ধ্যান ভজন শুরু করিয়া দিলেন।

কয়েক প্রহর এভাবে একটানা অতিবাহিত হয়। এবার মৎস্যেন্দ্রনাথ শিষ্যকে ডাকিয়া মৃদুস্বরে কহেন, "বৎস, আজ শিবচতুর্দ্দশী। প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী আজ এই শুভলগ্নে এই গুহায়, ভগবান অমরনাথের তুষার লিঙ্গের সম্মুখে যোগী ও যোগিনীদের উলঙ্গ নৃত্যোৎসব অনুষ্ঠিত হবে।[১] তুমি তাড়াতাড়ি পেছনে সরে, দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াও।"

কিছুকাল পরেই দেখা গেল, জটাজুটবিলম্বিত চিম্‌টা করঙ্গধারী একদল নগ্ন যোগী ও যোগিনী হুড়্ হুড়্ করিয়া গুহামধ্যে প্রবেশ করিতেছে। তুষারলিঙ্গের সম্মুখে প্রণাম ও স্তবস্তুতি নিবেদন করিয়াই তাহারা পরম উৎসাহে নৃত্য গীত শুরু করিয়া দেয়। সমস্বরে উদ্‌গত হইতে থাকে ব্যোম্ ব্যোম্ ধ্বনি আর ত্রিশূল চিমটার ঠন্ ঠন্ শব্দ। সেই সঙ্গে প্রচণ্ডবেগে অবিরাম চলে উলঙ্গ নৃত্য। এ অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া অবাক বিস্ময়ে গোরখনাথের বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না। নৃত্য গীত উৎসব শেষ হইয়া গেলে লিঙ্গ বিগ্রহের পূজা ও কৃত্যাদি সম্পন্ন করিয়া মৎস্যেন্দ্র ও গোরখ শ্রীনগরে ফিরিয়া আসিলেন।

---

১. ব্রীগ্‌স: গোরখনাথ অ্যাণ্ড কানফাট্টা যোগীজ্।

গুরুর আশ্রমে থাকিয়া গোরখনাথ এতকাল সাধন ভজন করিয়াছেন, পরিব্রাজনের পথে পথে পাইয়াছেন তাঁহার অমূল্য সাহচর্য্য। তারপর কঠোর সাধনায় ও দেবীর বরে অষ্টসিদ্ধির ঐশ্বর্য্য হইয়াছে তাঁহার করায়ত্ত। কিন্তু একটা প্রশ্ন কেবলই তাঁহার মনের আনাচে কানাচে বার বার উঁকি মারিতে থাকে।

গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথের যোগসাধনার ধারা তিনি অনেকাংশে আয়ত্ত করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার কৌলমার্গের নিগূঢ় রহস্য ভেদ করিতে পারিতেছেন কই? দেবীর অপার কৃপা সত্ত্বেও তান্ত্রিক তীর্থ হিংলাজের ভয়াবহতা ও বামাচারের প্রাধান্য তিনি অন্তরের সহিত গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এই সেদিনও অমরনাথের উলঙ্গ যোগী যোগিনীদের সমবেত নৃত্যের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে তাঁহার বাধিয়াছে।

মৎস্যেন্দ্রনাথ অতি কৃপালু, পুত্রাধিক স্নেহে গোরখনাথের সাধন জীবনকে তিনি লালন করিতেছেন, কিন্তু গুরুর কৌল সাধনা ও আচার আচরণ কি জানি কেন তাঁহার তেমন মনঃপূত নয়।

গোরখনাথের ইষ্ট হইতেছেন রজতগিরিসন্নিভ দেবাদিদেব মহাদেব, ত্যাগ বৈরাগ্য ও শুচি শুভ্রতার যিনি মূর্ত্ত বিগ্রহ। তাছাড়া, আপন সাধনার পথে গোরখনাথ কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ও অপাপবিদ্ধ জীবনের আদর্শকেই বাছিয়া নিয়াছেন। তাই শৈবযোগধর্ম্মের সঙ্গে তন্ত্রের বামাচার ও বীরাচার-এর মিশ্রণ মৎস্যেন্দ্রনাথ যে ভাবে করিয়াছেন, মনে প্রাণে তাহা তো তিনি গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না।

সেদিন সুযোগ পাইয়া গুরুর নিকট নিভৃতে নিজের মনের কথাটি খুলিয়া বলিলেন।

মৎস্যেন্দ্রনাথের ওষ্ঠে খেলিয়া গেল মৃদু হাসির রেখা। সংক্ষেপে শুধু কহিলেন, "বৎস, জানতো, কলিতে মানুষ স্বল্পায়ু। শক্তি-সাধনার পথেই তাড়াতাড়ি সে তার অভীষ্ট লাভ করতে পারে। নাথযোগতন্ত্রের চরম কথা—নাথত্ব অর্জ্জন, পরম শিবের সারূপ্যলাভ। এই শিবে পৌঁছুতে হলে শক্তিকে যে আশ্রয় করতেই হবে। শক্তি ছাড়া শিব তো শব

মাত্র। তোমার সাধনা ও সিদ্ধি আরো পরিপক্ক হোক্, তারপর এ সব কথা উপলব্ধি করতে পারবে।"

যুক্তকরে, বিনয়নম্র বচনে গোরখনাথ নিবেদন করেন, "কিন্তু প্রভু, শিবকে যদি ইষ্ট বলে মেনে নিই, তবে সেই শিবেরই ত্যাগ-বৈরাগ্য ও শুদ্ধাচার অনুসরণ করাই কি ঠিক নয়? তাঁর শুদ্ধবুদ্ধ জ্ঞানময়-সত্তায় সমরস হয়ে যাওয়াই কি কাম্য নয়? আশীর্বাদ করুন, আমি যেন পরম শিবের ধ্যানেই সদা নিমগ্ন থাকতে পারি, শুচি-শুভ্র ও শিবময় হয়ে উঠ্‌তে পারি।"

"বৎস, নাথধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ সাধন তুমি পেয়েছো, অভীষ্ট তোমার লাভ হবেই। কিন্তু লক্ষ্য রেখো, শুদ্ধাচার ও নৈষ্ঠিকতার সূক্ষ্ম অহং বোধটি যেন তোমায় পেয়ে না বসে। আর কৌলসাধন সম্পর্কে বিচার করতে গিয়ে একটা কথা সব সময়ে স্মরণ রাখবে। মহামায়াকে, মহাশক্তিকে পেতে হলে মায়াকে এড়িয়ে গেলে চলবে না—তাকে ভেদ করেই এগিয়ে যেতে হবে।"

ক্ষণপরে গুরু আবার কহিলেন, "আমার সঙ্গলাভ এতকাল করেছো, তপস্যার ফলে সিদ্ধি ও যোগৈশ্বর্য্যও লাভ করেছো প্রচুর। এবার কিন্তু আমাদের ছাড়াছাড়ির পালা, বৎস।"

"সে কি কথা গুরুদেব! আপনার অদর্শনের কথা যে আমি কোনমতে ভাবতেই পারছিনে।"

"বৎস, এ বিচ্ছেদের প্রয়োজন আছে। এর ফলে গুরু-দত্ত সাধনা আরো দানা বেঁধে ওঠার অবসর পায়। এ তোমার পক্ষে কল্যাণকরই হবে। এজন্য মোটেই তুমি বিচলিত হয়ো না। সত্যকার প্রয়োজন যখনি দেখা দেবে, তখনই পাবে আমার সাক্ষাৎ। আমার দৃষ্টি সদাই করবে তোমার অনুসরণ। এবার তুমি এককভাবে পরিব্রাজন ক'র, শ্রেষ্ঠ তীর্থ ও সিদ্ধপীঠগুলোর পরিক্রমা শেষ ক'র।"

সাশ্রুনয়নে গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথের নিকট হইতে গোরখনাথ বিদায় গ্রহণ করিলেন।

পদব্রজে চলিতে চলিতে গোরখনাথ সে-বার পাঞ্জাবের পালামপুরে আসিয়াছেন। এটি একটি জনবিরল গ্রাম, অদূরে চারিদিকে ঢেউ খেলিয়া চলিয়াছে উষর পার্ব্বত্যভূমি। মনে মনে ভাবিলেন, এখানে নিভৃতে কয়েকটা দিন ধ্যানজপে অতিবাহিত করা মন্দ কি ?

সারাদিন পথ চলিয়াছেন, দেহ ক্লান্ত, ক্ষুৎপিপাসাও বেশ পাইয়াছে। আসন বিছাইয়া এক অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় বসিতেই, পাশের ক্ষেত হইতে এক চাষীর ছেলে সেখানে ছুটিয়া আসিল। অপূর্ব্ব তেজঃপুঞ্জকলেবর এই সাধু। চোখমুখ দিব্য প্রসন্নতায় ভরপুর। দেখামাত্রই বালক তাঁহার প্রতি বড় আকৃষ্ট হইয়া পড়ে।

ব্যগ্রস্বরে সে জানায়, "সাধুবাবা, যতদিন খুসী আপনি এখানে আনন্দে বসবাস করুন। সেবার জন্য, ভোজনের জন্য কোন ভাবনা নেই। এই গাঁয়েই আমরা থাকি। বাবার অনেকগুলো ক্ষেত, অনেক গরু মোষ। যা যা দরকার, বলুন। সব আমি এক্ষুনি নিয়ে আসছি।"

মধুর হাসি ছড়াইয়া গোরখ কহিলেন, "বেটা, আমার ভোজনের জন্য কিছুই তোমায় আনতে হবে না। কিছুদিন আমি উপবাসী থাকবো আর ধুনী জ্বালিয়ে এখানে ধ্যান জপ ক'রবো। তুমি বরং আমায় কিছু শুকনো কাঠ এনে দাও, তা হলেই আমি খুসী হবো।"

বালক তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইতেই গোরখ আবার কহিলেন, "বেটা, তোমায় আমার আর একটা জরুরী কথা রাখতে হবে।"

"বলুন, সাধুবাবা।"

"আমি আমার আসন পাতবো, আর ধুনী জ্বালিয়ে বসবো ঐ গভীর বনের ভেতর। যতদিন ওখানে থাকবো, কাউকে আমার কথা যেন ব'লো না। তোমাদের বাড়ীর কাউকেও না। তাহলে আমার কাজের ব্যাঘাত হবে।"

সম্মতিসূচক মাথা নাড়িয়া বালক তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া চলিয়া গেল। একটু পরেই একরাশ শুকনো কাঠ মাথায় নিয়া সে আসিয়া হাজির।

বনের মধ্যে ঢুকিয়া একটি দুর্গম নিভৃত স্থান গোরখনাথ নির্ব্বাচন

করিলেন। কিছুদিন এখানে থাকিয়া হোমের অনুষ্ঠান করিবেন।

বালকের দিকে ফিরিয়া স্নেহপূর্ণ বচনে কহিলেন, "বেটা, রোজ এই পরিমাণ কাঠ এখানে তুমি আমায় দিয়ে যেয়ো। তোমার যখন খুশী তখনি নীরবে আমার ধুনীর সামনে এসে বসতে পারো। কিন্তু সাবধান, আর কেউ যেন এখানকার খবর না পায়, এখানে এসে আমার কাজে বাধা না জন্মায়।"

দুই তিনদিন কাঠ যোগানোর পর বালক বড় চিন্তায় পড়িয়া যায়। নিজেদের ঘরে এত ভোজনের জিনিষ থাকিতে এমন একজন সাধু এখানে অনাহারে থাকিবেন? সে কেমন কথা? শেষটায় বাপ মায়ের কাছে সব ঘটনা সে খুলিয়া বলে।

সকলের পরামর্শক্রমে স্থির হয়, সাধু সেবার এখন সুযোগ ছাড়া যাইবে না। তাছাড়া, গ্রামের প্রান্তে একজন সাধু উপবাসী থাকিবেন, তাও তো কল্যাণকর নয়। পরদিন ভোরে উঠিয়াই চাষীর পুত্র প্রচুর আটা, ঘি, চিনি নিয়া বনের মধ্যে উপস্থিত।

যুক্তকরে নিবেদন ক'রে, "সাধু বাবা, আমার বাড়ীর সবাই এই ভেট পাঠিয়ে দিয়েছে। আর উপোস ক'রে না থেকে আপনি এ দিয়ে খাবার তৈরী করে নিন্।"

শান্ত দৃঢ় স্বরে গোরখ কহিলেন, "ওরে, যা তোকে নিষেধ করেছিলাম, তাই শেষটায় করলি? আমার কথা বলে ফেলেছিস্। কাল থেকে যে গোটা গ্রামের লোক এসে ভিড় করবে। নাঃ—যে সঙ্কল্প করেছিলাম তা হলো না। এখানকাব আসন আমায় ওঠাতেই হচ্ছে।"

বালকের চোখ দুটি অশ্রুসজল হইয়া উঠে। কাতরস্বরে বলিয়া উঠে, "বাবা, আপনার ভোজনের জন্য এত কিছু নিয়ে এলাম, আর এসব ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে?"

বালকের ছলছল চোখের দিকে চাহিতেই গোরখনাথ কোমল হইয়া পড়িলেন। কহিলেন, "নাঃ। এসব তবে রেখেই দে। শিবজীর ভোগ লাগাই। রসুইর আগুন তো আছে, কিন্তু জল কোথায় রে?"

"তাইতো, আমাদের গাঁ যে মরুভূমির মত। কাছে তো কোথাও জল নেই। বাড়ী ফিরে গেলে কিছুটা ব্যবস্থা হয়তো হতে পারে।"

"ওরে, তুই ছেলে মানুষ, এজন্য আবার কোথায় ছুটাছুটি করবি? তাছাড়া, তোদের দেশে এমনিতেই জলের অভাব—দুচার মাইল দূর থেকে তা টেনে আনতে হয়। বাড়ীতে হয়তো এক আধ ঘড়া জল রয়েছে, তা নিয়ে এসে সবাইকে কষ্ট দিবি কেন?"

"তবে উপায়?"—হতাশ হইয়া বালক উত্তর দেয়।

ইস্পাত নির্ম্মিত 'গজ্' বা যোগীদণ্ডটি অদূরস্থ ভূমিতে বিদ্ধ করিয়া গোরখনাথ কহিলেন, "ওরে, এখান থেকেই জলের ব্যবস্থা হয়ে যাবে, তুই এ নিয়ে আর ভাবিস্‌নে। এখন আয়, তাড়াতাড়ি শিবজীর ভোগ রান্নার যোগাড় করি।"

কথা কয়টি শেষ হইতে না হইতেই প্রোথিত দণ্ডের তলদেশ হইতে সশব্দে নির্গত হয় স্বচ্ছ জলের ঝর্ণাধারা। কলকল-নাদে এই ধারা ছুটিয়া চলে শুষ্ক জনপদ ও শস্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়া।

ভোগ রান্না শেষ হয়। ইষ্টদেবকে উহা নিবেদন করিয়া গোরখনাথ বালককে কহেন, "এসব প্রসাদ এবার তোদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যা। আমায় উপবাসী থাকতে হবে আরো কিছুদিন। কাজেই এ দিয়ে আমার প্রয়োজন নেই।"

বালক আর্ত্তস্বরে কাঁদিয়া উঠে, বলিতে থাকে, "প্রভু, আপনি সাধু নন, দেবতা, স্বয়ং শিবজী! আপনাকে আমি কিছুতেই ছাড়বো না, কোথাও যেতে দেবো না।" দুই হাত বাড়াইয়া গোরখকে স্পর্শ করা মাত্রই তাঁহার দেহে দেখা দেয় অলৌকিক স্তম্ভন। নিশ্চল প্রাণহীন পাথরের মুর্ত্তির মত থাকে সে দণ্ডায়মান। বালকটিকে ঠিক সেইভাবে রাখিয়া গোরখনাথ তাড়াতাড়ি বন ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়েন। পার্ব্বত্য পথে আবার শুরু হয় তাঁহার পথ চলা।

ইণ্ডিয়ান এন্টিকুয়েরি—১৯০৩, পৃঃ ৩৭৮; দি ট্রাইব্‌স্ এণ্ড কাষ্টম্ অব দি সেণ্ট্রাল প্রভিন্‌সেস অব ইণ্ডিয়া', পৃঃ ১৮৩

শুদ্ধাচারী এক ভাট ব্রাহ্মণ সেই গ্রামে বাস ক'রে। রাত্রেই স্বপ্নযোগে সে লাভ ক'রে এক যোগীর নির্দ্দেশ, "ওগো, তোমরা গাঁয়ের সবাই এগিয়ে যাও বনের ভেতর। মহাযোগী গোরখনাথের স্পর্শ পেয়ে কৃষক-বালক হয়েছে সিদ্ধ সাধুরূপে রূপান্তরিত। তার বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলে সেখানে নির্ম্মাণ ক'র এক শ্বেত প্রস্তরের মন্দির, বিগ্রহ স্থাপন ক'রে ভক্তিভরে ক'র তাঁর সেবা পূজা।

ভাট যে সাধক-মূর্ত্তি স্বপ্নে দেখিয়াছিল তারই প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয় নবনির্ম্মিত মন্দিরে। আজো এখানে মেলা অনুষ্ঠিত হয় প্রতি বৎসর। গোরখনাথ ও তাঁহার শিষ্য গুগার মূর্ত্তি এখানে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং বহু সিদ্ধাচার্য্যের পদধূলিতে এই স্থান পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে।

পথ চলিতে চলিতে গোরখনাথ প্রয়াগে পৌঁছিলেন। ত্রিবেণীতে স্নান পূজা সমাপন করিয়া ভাবিলেন, নগরের প্রান্তে একটি কুটির বাঁধিয়া কিছুকাল নিভৃতে সাধন ভজন করিবেন। কিন্তু দুই একদিন থাকিয়াই বুঝিলেন, রাজ্যমধ্যে মহা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে।

এ অঞ্চলটি সে সময়ে ছিল রাজা হরভঙ্গের শাসনাধীন। রাজা বৃদ্ধ হইয়াছেন, উন্মাদ রোগও কথঞ্চিৎ রহিয়াছে। কিছুদিন যাবৎ তাঁহার খেয়াল হইয়াছে—রামরাজ্য হইতে শুদ্ধতর রাজ্য তিনি স্থাপন করিবেন। এক আদেশ জারী করিয়াছেন, তাঁহার রাজ্যে পণ্যমূল্যের কোন তারতম্য বা পার্থক্য থাকিবে না, সকল দ্রব্যেরই হইবে এক দর। এক সের চাল আর এক সের সোনা বা রত্ন প্রবাল একই দামে ব্যবসায়ীদের বিক্রয় করিতে হইবে। নহিলে দেওয়া হইবে গুরুতর দণ্ড। রাজার বিশ্বাস, ইহার ফলে প্রজারা সমদর্শী ও শুদ্ধসত্ত্ব হইতে শিখিবে।

রাত্রেই কুটিরে ঘটিল মৎস্যেন্দ্রের অলৌকিক আবির্ভাব। কহিলেন—"গোরখ, তুমি তো মনের আনন্দে তীর্থ স্নান করার কথা ভাবছো। এদিকে যে ঘোর বিপদ ঘনিয়ে আসছে। তুমি আজই এখান থেকে সরে পড়।"

"প্রভু এখানকার রাজার পাগলামী কতটা গড়ায়, আর কি ঘটে, তা দেখ্‌তে আমার বড় কৌতূহল হয়েছে। সবটা না দেখে আমি এখান থেকে যাচ্ছিনে।"—স্মিতহাস্যে গোরখনাথ উত্তর দেন।

"বেশ, তবে মজাটা ভাল ক'রেই ত্যাখো"—মুচ্‌কি হাসিয়া মৎস্যেন্দ্র অন্তর্দ্ধান হইয়া যান।

এই রাজাদেশের ফল সহজেই অনুমেয়। বণিক মহাজনেরা ভয়ের চোটে চোখে সরিষার ফুল দেখিতে শুরু করিয়াছে। হাটে বাজারে বিকিকিনি সব বন্ধ। জনসাধারণের পক্ষে খাদ্য বস্ত্র ঔষধ প্রভৃতি নিত্যকার বস্তু সংগ্রহ করা একেবারে অসম্ভব।

বাজারে সেদিন বচসা ও হাতাহাতি করিতে গিয়া একটি দুর্দ্দান্ত লোক এক দোকানীকে খুন করিয়া ফেলে। চারিদিকে মহা হৈ চৈ। রক্ষীরা আসিয়া খুনী লোকটাকে বাঁধিয়া নিয়া যায়, বিচারে হয় প্রাণদণ্ড। কিন্তু লোকটি যেমনি শক্তিমান তেমনি দুর্দ্ধর্ষ, তাহাকে আট্‌কাইয়া রাখা সম্ভব হয় না। রাত্রে কারাগার ভাঙ্গিয়া সে পলায়ন করে। পরদিন বহু চেষ্টায়ও আর তাহাকে ধরা গেল না।

পাগল রাজা গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "ঐ খুনেটার মত লম্বা চওড়া ও জোয়ান লোক এ রাজ্যে যত আছে সবাইকে জড় ক'র। আর তাদের মধ্যে যে সব চাইতে বলবান তাকে ধরে সর্ব্বাগ্রে ফাঁসী দাও। তারপর ধীরে সুস্থে আসল অপরাধীটাকে খুঁজে বার ক'র। এ আদেশ না না মানলে নগরপালের গর্দ্দান যাবে।"

ভয়ে নগরপালের মুখ শুকাইয়া যায়, সদলবলে তখনি রাজপথে তিনি বাহির হইয়া পড়েন। রক্ষীরা চারিদিকে জোর খোঁজাখুঁজি শুরু করিয়া দেয়। লম্বা চওড়া মানুষ দেখিলেই আর কথা নাই, গ্রেপ্তার করিয়া আনে। সারা নগরে মহা চাঞ্চল্য।

ধ্যান পূজা সবে শেষ হইয়াছে, ঝুপড়ির ঝাপ বন্ধ করিয়া গোরখনাথ মেঝেতে দেহ এলাইয়া দিয়াছেন, কিছুটা বিশ্রাম করিয়া নিবেন।

হঠাৎ তাকাইয়া দেখেন, গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ কোথা হইতে তাঁহার

সম্মুখে আসিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন করিলেন। যুক্তকরে কহিলেন, "প্রভু কৃপাময়। তাই অধীনের কাছে বারবার ঘটছে আপনার অলৌকিক আবির্ভাব। এবার বলুন, আমার প্রতি কি আদেশ।"

"বৎস, আমার কথা কানে তুল্‌লে না, কৌতূহলের বশে এখনো এখানে রয়েই গেলে। কিন্তু এবার যে ঘোর বিপদ। রাজার অনুচরেরা বহু লোককে নির্বিবচারে গ্রেপ্তার করছে। এদের ভেতর থেকে বাছাই ক'রে নিয়ে একজনকে ওরা বধ ক'রবে।"

"বেশতো প্রভু, দেখি না, ব্যাপারটা কতদূর গড়ায়।"

"দেখার সুযোগ বেশী হচ্ছে কই, গোরখনাথ? আমাদের দিন বুঝি ঘনিয়ে এলো।"

"সে কি কথা, প্রভু?"

"তোমার আর আমার মত দীর্ঘাকার, সবল পুরুষ এরাজ্যে আর নেই। রকম যা দেখ্‌ছি, এবার আমাদের দুজনেরই ফাঁসীকাঠে ঝুলবার পালা।"—মুচকি হাসিয়া মন্তব্য করেন মৎস্যেন্দ্রনাথ।

এতক্ষণে গোরখনাথের হুঁস হইয়াছে। ব্যস্ত সমস্ত হইয়া নিবেদন করেন, "প্রভু, তাহলে আপনি কেন অনর্থক এ বিপদে নিজেকে জড়িয়ে ফেলছেন? যেমনিভাবে শূন্যমার্গ থেকে নেমে এই ঝুপড়িতে ঢুকেছিলেন, তেমনিভাবে এখনি অন্তর্হিত হয়ে যান। দোহাই আপনার, আর এক মুহূর্ত্ত দেরী করবেন না। আমার অবিবেচনার ফলে আপনার বিন্দুমাত্র ক্ষতি হলে আমার দুঃখের কিন্তু সীমা থাকবেনা।"

গোরখনাথের কথা শেষ হইতে না হইতেই ঝুপড়ির দ্বার ভাঙ্গিয়া একদল রাজরক্ষী ঢুকিয়া পড়ে। বিশালকায় যোগীদ্বয়কে বাঁধিয়া নিয়া উপস্থিত করে নগরপালের কাছে।

বাছাই করার পর দেখা গেল, ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরখনাথই সর্ব্বাপেক্ষা বলশালী ও দীর্ঘবপু। দৈর্ঘ্যে দুজনেই সমান, আর দৈহিক শক্তি যে কাহার বেশী তাহা বুঝা যাইতেছেনা। অগত্যা

পরের দিন নগরপাল দুইজনকেই বধ্যভূমিতে অপেক্ষমান রাজার কাছে উপস্থিত করিলেন।

উন্মাদ রাজা কৌতূহলভরে সমুন্নতদেহ, শালপ্রাংশু মহাভুজ, দুই যোগীর দিকে বেশ কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। উভয়েই তুল্য বলশালী, কাজেই সহসা কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইতেছে না। তারপর হঠাৎ এক সময়ে উত্তেজিত স্বরে হুকুম দিলেন, "ছাখো, এদের নিয়ে এত মাথা ঘামাবার দরকার নেই। যে কোন একটাকে এক্ষুনি ফাঁসীকাঠে ঝুলিয়ে দাও।"

"মহারাজ, অবিচার করে যেন পাপের ভাগী হবেন না। চেয়ে দেখুন, দুজনের মধ্যে আমিই বধের যোগ্যতর ব্যক্তি। আমাকেই ফাঁসীর মঞ্চে নেবার হুকুম দিন।"—তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠেন মৎস্যেন্দ্রনাথ।

গোরখনাথও মহা ব্যগ্র। আবেদন জানান, "আমার দাবীই বেশী, মহারাজ। আপনি আমাকেই বধ করুন।"

দুই বন্দী সাধুই প্রাণ দিবার জন্য পরম উৎসাহে বারবার দাবী জানাইতেছে, হৈ-চৈ করিতেছে। বড় অদ্ভুত কথা, উপস্থিত নরনারী এ দৃশ্য দেখিয়া বিস্ময়ে হতবাক্।

রাজা বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "দাঁড়াও, এর ভেতর নিশ্চয় একটা গূঢ় রহস্য রয়েছে, সেটা কি—আগে জানতে হবে।"

মৎস্যেন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করিলেন, "ওহে সাধু, আসল ব্যাপারটা খুলে বল দেখি। প্রাণ দেবার জন্য এমন কাড়াকাড়ি করছো কেন দুজনে? আসল খুনে অপরাধীটা পালিয়েছে তাই চটেমটে আমি হুকুম দিয়েছি—তার একটা বদ্‌লী লোককে তাড়াতাড়ি বধ ক'র। তা তোমরা নির্দ্দোষ হয়েও দুজনেই ফাঁসীতে যাবার জন্য এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছ কেন? সব কথা আমায় ভেঙে বল দেখি।"

মৎস্যেন্দ্রনাথ সবিনয়ে নিবেদন করেন, "মহারাজ, আসল কথাটি কি জানেন, ঠিক এই সময়ে আজ এক পরম পুণ্যলগ্ন উপস্থিত হয়েছে। এই লগ্নে যে ভাগ্যবানের মৃত্যু হবে, তার হবে অক্ষয় স্বর্গবাস। যে জন্য

সারা জীবন এত কষ্ট করে এসেছি, তা আপনারই কৃপায় আজ অনায়াসে লাভ করা যাবে। একি কম সৌভাগ্যের কথা? আপনি আর দেরী করবেননা, মহারাজ। এখনি আদেশ দিন প্রাণবধের জন্য।"

গোরখনাথও গুরুকে হটাইয়া দিয়া বারবার আর্ত্তস্বরে জানাইতে থাকেন তাঁহার আবেদন।

রাজা নীরবে কি যেন খানিকটা ভাবিয়া নিলেন, তারপর মন্ত্রীদের সঙ্গে চলিল গোপন পরামর্শ।

উপস্থিত জনতা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করিয়া আছে, পাগ্‌লা রাজা এবার কি হুকুম জারী করেন কে জানে?

সভাসদ ও জনমণ্ডলীকে উদ্দেশ করিয়া রাজা অতঃপর যে কথা ঘোষণা করিলেন তাহাতে সকলের বিস্ময়ের সীমা রহিলনা। কহিলেন, "আমি বিচার বিবেচনা ক'রে এবার একটা নূতন সিদ্ধান্তে পেঁাচেছি। দুই সাধুই আমাদের সবাইকে ফাঁকি দিয়ে অক্ষয় স্বর্গবাসের ব্যবস্থা করতে চাচ্ছে। কিন্তু আমি তা কিছুতেই হতে দেবোনা। এই পুণ্যলগ্নের সুযোগ আজ আমি নিজেই নেবো। আমি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি, এ যাবৎ সংসারের ভোগসুখও ঢের করা হয়েছে। এবার ওপারের সুখও আমি অর্জ্জন করতে চাই। আর কাল বিলম্ব করা ঠিক নয়। মন্ত্রী, আমায় বধ্যমঞ্চে নিয়ে গিয়ে এখনি দেহান্তের ব্যবস্থা কর।"

রাজার আদেশ তৎক্ষণাৎ পালিত হয় এবং তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সারা রাজ্যে শুরু হয় বিদ্রোহ, হত্যা, লুঠতরাজ ও অগ্নিদাহ। মৎস্যেন্দ্র ও গোরখ তাড়াতাড়ি সেখান হইতে সরিয়া পড়েন।

পথ চলিতে চলিতে গোরখনাথের মনে নানা প্রশ্নই ভিড় করিয়া আসে। গুরু অন্তর্য্যামী, সবই জানিতেছেন। গোরখের দিকে তাকাইয়া স্মিত হাস্যে কহিলেন, "বৎস, তুমি ভেবো না, এই উন্মাদ রাজা তার খেয়াল-খুশীবশে বহু পাপ-কাজ করেছে। এবার অন্তত তাতে ছেদ পড়লো। পরমশিবের ইচ্ছায়, তোমাকে উপলক্ষ ক'রে এই রাজ্যের কিছুটা শোধনক্রিয়াও সম্পন্ন হলো।"

"প্রভু, আপনি এখানে ঠিক সময়ে এসে উপস্থিত না হলে, আমায় মহা বিপদে পড়তে হতো।"—যুক্ত করে নিবেদন করেন গোরখনাথ।

"বৎস, তোমায় তো আমি বলেছি, যখনি আমাদের সাক্ষাতের দরকার হবে, তখনি আমি আপনা থেকে উপস্থিত হবো। বৎস, এবার তোমার পরিব্রাজন বন্ধ ক'র। স্থায়ী আসন স্থাপন ক'র কোন পবিত্র সিদ্ধপীঠে, সেখানে বসে পূর্ণাঙ্গ ক'র তোমার সাধনা।"

বলিতে বলিতে মহাযোগী মৎস্যেন্দ্রনাথ অন্তরীক্ষ পথে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

খ্যাত ও অখ্যাত বহু তীর্থ ও সিদ্ধপীঠ দর্শন করার পর গোরখনাথ সেদিন হিমালয়-তরাইর একশত মাইল দক্ষিণে এক নিবিড় বনে আসিয়া উপস্থিত। লোকালয় হইতে বহু দূরে এই স্থানটি—শান্ত, ছায়াচ্ছন্ন ও নির্জ্জন। সামনেই এক মনোরম সরোবর বিরাজিত। তীরে আসিয়া দাঁড়াইতেই মনে হইল, এটি-সাধনার এক অনুকূল ক্ষেত্র।

ত্রিশূল আশা ঝোলা নামাইবেন কিনা ভাবিতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ কাণে আসিল মৎস্যেন্দ্রনাথের দৈবী কণ্ঠস্বর। অলক্ষ্যে থাকিয়া গুরু কহিলেন, "গোরখ্, এইটিই তোমার নির্দ্দিষ্ট সাধন-স্থল। এই সরোবরের নাম মানস-সরোবর। যুগে যুগে বহু সিদ্ধযোগী এর কূলে বসে তপস্যা করে গেছেন। সামনের ঐ সিদ্ধবকুলের তলে ঝুপড়ি বেঁধে তুমি সাধন শুরু করে দাও। এখানে বসেই লাভ করবে যোগীজীবনের বাঞ্ছিত সিদ্ধদেহ।"

গুরু আরো ভবিষ্যদ্‌বাণী করেন, "বৎস, এখানকার সাধন শেষ হবার পর নূতনতর যোগৈশ্বর্য্য তুমি লাভ করবে, আর সেই সঙ্গে আরম্ভ হবে তোমার আচার্য্য জীবন। বহু নাথযোগী, মুমুক্ষু ও ভক্ত তোমার কাছ থেকে নিতে আসবে সাধন-নির্দ্দেশ। তোমার এই সিদ্ধিস্থলকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠবে, এক পবিত্র শৈবতীর্থ, সৃষ্ট হবে এক সুন্দর নগর। পরিচিত হবে গোরখপুর বলে।"

দৈবী কণ্ঠ নীরব হয়। গোরখনাথ হৃষ্ট মনে এখানেই বিছাইয়া বসেন তপস্যার আসন।

গুরুদত্ত সাধনের পূর্ণ পরিণতি এবার তাঁহার লক্ষ্য এবং এজন্য করেন তিনি সর্ব্বস্বপণ। চরম কৃচ্ছ্র ও কঠোর তপস্যার ভিতর দিয়া অতিবাহিত হয় এ সময়কার জীবন। দিন রাতের হুঁস নাই, শীত গ্রীষ্মের নাই কোন পার্থক্যবোধ। মাঘের নিশীথে, হাড়-কাঁপুনে শীতের মধ্যেও স্বচ্ছন্দে নগ্নদেহে তাঁহাকে ধ্যানাবিষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে দেখা যায়। গ্রীষ্মের দাবদাহ ও মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের করজালে থাকেন তিনি নির্ব্বিকার। কত শ্রাবণের উন্মত্ত জলধারা মাথার উপর দিয়া চলিয়া যায়, ধ্যানতন্ময় সাধকের সেদিকে কোন খেয়ালই নাই। কয়েকটি বৎসর এভাবে অতিবাহিত হয়।

গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথের কৃপায় এবং দেবীর বরে ইতিপূর্ব্বেই গোরখনাথ অষ্টসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছেন। অপরিমেয় যোগৈশ্বর্য্যও হইয়াছে করায়ত্ত। এবারে আসিয়া উপস্থিত হয় প্রকৃতিবশীত্বের দুর্লভ শক্তি।

মাসের পর মাস ধ্যানস্থ ও সমাহিত থাকার পর এক এক দিন গোরখনাথ নয়ন উন্মীলন করেন। প্রকৃতি তাঁহার সেবার জন্য আগাইয়া আসে কিঙ্করীর মত। ক্ষুৎ-পিপাসার উদ্রেক হওয়া মাত্র অরণ্যের বৃক্ষ হইতে পতিত হয় কত সুপক্ক রসাল ফল। গড়াইয়া গড়াইয়া এগুলি উপস্থিত হয় মহাসাধকের পদপ্রান্তে।

একাদিক্রমে কয়েক মাস হয়তো ধ্যানস্থ হইয়া কাটাইয়াছেন। হঠাৎ একদিন দেহবোধ ফিরিয়া আসে, ইচ্ছা জাগে শীতল জলে স্নান সমাপনের জন্য। সরোবরের ক্রীড়ারত হস্তীগুলি অমনি ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসে, মহাযোগীর সারা দেহে বর্ষণ করিতে থাকে শুণ্ড-বাহিত জলধারা।

স্বেচ্ছাময় গোরখনাথ প্রায়ই কঠোর পঞ্চতপার অনুষ্ঠান করেন। ব্রত উদ্‌যাপন শেষ হইলেই আকাশের গায়ে ভাসিয়া উঠে জলভরা শ্যামল মেঘপুঞ্জ। অজস্র বর্ষণের মধ্য দিয়া তাহা হোমকুণ্ডের আগুন

নিভাইয়া দেয়, সিক্ত ও রসস্নিগ্ধ করে মহাযোগীর তপ্ত দেহ। প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত্ত সেবা এমনি করিয়া সতত আগাইয়া আসে শক্তিধর মহাসাধকের উদ্দেশে।

এই সরোবরের তীরে বারো বৎসর কঠোর সাধনা করার পর গোরখনাথের অভীষ্ট কথঞ্চিৎ পূর্ণ হয়। ইষ্টদেব শিবের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া তিনি কৃতার্থ হন।

স্নেহপূর্ণ বচনে দেবাদিদেব কহেন, "বৎস গোরখনাথ, তোমার জন্ম হয়েছিলো আমারই বরে, তাই সাত্ত্বিক সংস্কার নিয়ে তুমি হয়েছিলে আবির্ভূত। এবার তোমার সাধনায় প্রসন্ন হয়ে, তোমায় আমি বর দিলুম। কায়াসিদ্ধি ও নাথত্ব তুমি অর্জ্জন ক'র।"

কৃতার্থ সাধকের দুই নয়নে ঝরে আনন্দের অশ্রুধারা। ইষ্টদেবের চরণে বার বার লুটাইয়া তিনি প্রণাম করিতে থাকেন।

স্বল্পকাল পরেই আবার শোনা যায় স্বর্গীয় কণ্ঠস্বর। দেবাদিদেব কহেন, "বৎস, তোমার তপঃপ্রভাবে এই সাধনপীঠ পবিত্র হয়ে উঠেছে, এখন থেকে বহু মুমুক্ষু সাধকের আগমন ঘটবে তোমার কাছে। তাদের তুমি সাহায্য ক'র।"

"প্রভু, সে তো আচার্য্যের কাজ। এই গুরু দায়িত্বভার নেবার ইচ্ছে আমার কোনদিন হয়নি। ইষ্টরূপে আজীবন ভজনা করে এসেছি আপনাকেই। আপনার সর্ব্বপাশমুক্ত, সদাবৈরাগী, শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বরূপকেই রেখেছি আমার আদর্শ ক'রে। এবার ভক্ত সাধকদের টেনে এনে আমায় আবার জড়ানো কেন ?"

স্মিতহাস্যে শিব কহেন, "বৎস, এ তো তোমার নিজের কাজ নয়, এ যে ঐশ্বরীয় কাজ। সাধনার মর্ম্মকথা হচ্ছে, জীবকে শিবে পরিণত করা। এক একটি জীব দিব্য আলোকবর্ত্তিকা হয়ে জ্বলে উঠ্‌বে—আর তা থেকে প্রজ্জ্বলিত হবে আরো অজস্র আলোর শিখা। এই পরম্পরা তো তাদেরই রক্ষা ক'রে চলতে হবে, যারা ঈশ্বরের চিহ্নিত সেবক। তুমি যে তাদেরই একজন।"

বলিতে বলিতেই স্বর্গীয় আলোকচ্ছটা সংহরণ করিয়া দেবাদিদেব মুহূর্ত্তমধ্যে অন্তরীক্ষে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

যোগীবর গোরখনাথের সাধনৈশ্বর্য্যের বিপুল খ্যাতি ও নানা কাহিনী অনতিকাল মধ্যে এই অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। মানসরোবরের চারিদিকে ধীরে ধীরে জড়ো হইতে থাকে সাধনকামী যোগী সন্ন্যাসীর দল। গোরখনাথের তপস্যাদীপ্ত রূপ, অসামান্য ত্যাগ তিতিক্ষা ও ব্যক্তিত্বে অচিরে তাঁহারা আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। অনেকে আশ্রয় পায় তাঁহার চরণে। অচিরে এই অঞ্চলটি সিদ্ধ সাধক গোরখনাথের নামানুসারে পরিচিত হইয়া উঠে গোরখপুর নামে।

রসেশ্বর-সাধনা কায়াসিদ্ধির একটি প্রাচীন পন্থা। জরা মরণহীন সূক্ষ্ম, দিব্যদেহ বা 'রসময়ী তনু' আশ্রয় করিয়া এই পন্থার সিদ্ধযোগীরা ত্রিলোকের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে পারেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। এই সম্প্রদায়ের নেতা অল্লাম প্রভু ও গোরখনাথের শক্তি সংঘর্ষের এক চাঞ্চল্যকর কাহিনী উত্তর ভারতে প্রচারিত আছে।

সে বার অল্লাম ঘুরিতে ঘুরিতে গোরখপুরে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। গোরখনাথের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার কথা শুনিয়া সদলবলে তখনি তাঁহার সাধনপীঠে গিয়া তিনি উপস্থিত।

কথা প্রসঙ্গে কায়াসিদ্ধির তত্ত্ব নিয়া উভয়ের মধ্যে বিতর্ক শুরু হইয়া যায়। নিজ পন্থার গৌরব বাড়াইতে অল্লাম বড় বেশী উৎসাহী। তাই রসেশ্বর দর্শনের গুণগান করার সঙ্গে নাথ-সাধন প্রণালীর নিন্দাও তিনি শুরু করিয়া দিলেন।

গোরখনাথ একথা শুনিয়া মহা উত্তেজিত। সরোষে কহিয়া উঠিলেন, "আচার্য্যবর, যুক্তিহীন শূন্যগর্ভ কথা বলে তো কোন লাভ নেই। আর অনর্থক এই বিতর্ক ও নিন্দাবাদেই বা কি প্রয়োজন? বরং আসুন, নাথযোগীর কায়াসিদ্ধি কি বস্তু, তার একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমি এখনি আপনাকে দিচ্ছি।"

"এ অতি উত্তম প্রস্তাব," সোৎসাহে অল্লাম-প্রভু উত্তর দেন।

"আমি আপনার সামনে দাঁড়ানো রয়েছি। ঐ তীক্ষ্ণ খড়্গ দিয়ে আপনি আমায় আঘাত করতে থাকুন, আমার এই সিদ্ধ দেহের একটি রোমও যদি আপনি কর্ত্তন করতে পারেন, তবে স্বীকার করবো—সিদ্ধাচার্য্যরূপে গণ্য হবার কোন অধিকার আমার নেই।"

অল্লাম প্রভু বারবার সজোরে আঘাত হানিতে থাকেন, কিন্তু গোরখের সিদ্ধদেহের কোন তারতম্যই ঘটিতে দেখা যায় না। শুধু বারবার শুনা যায় আঘাতজনিত ঘোর শব্দ।

অস্ত্র ত্যাগ করিয়া অল্লাম সহাস্যে বলিয়া উঠেন, "ওহে নবীন নাথযোগী, আমি স্বীকার করছি—তোমার দেহের একটি রোমও স্থানচ্যুত করা যায়নি, ছিন্নও হয়নি। কিন্তু ভায়া, খড়্গাঘাতের ফলে শব্দ উত্থিত হবে কেন? তবে নিশ্চয় কোথাও কোন একটা সংঘর্ষ হচ্ছে। সত্যকার সিদ্ধদেহ বা দিব্যদেহ হবে মহাকাশের মত শব্দহীন, বিকারহীন। তোমার গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস ক'রো, তাঁর শিষ্যের কায়াসিদ্ধি কেন এখনো পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠেনি।"

অতঃপর অল্লাম-প্রভু গোরখকে আহ্বান জানান তাঁহার নিজদেহের সিদ্ধত্ব পরীক্ষার জন্য। শাণিত অস্ত্রদ্বারা গোরখনাথ উপর্য্যুপরি আঘাত করিতে থাকেন, কিন্তু আচার্য্যের দেহের বিন্দুমাত্র বিকার বা বৈলক্ষণ্য ঘটিতে দেখা গেল না। এ সিদ্ধদেহ যেন নীরব নিস্পন্দ একখণ্ড মহাকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়।

এবার গোরখের দিকে তাচ্ছিল্য ভরে তাকাইয়া অল্লাম জয়গর্ব্বে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠেন। তারপর ভক্ত শিষ্যগণসহ ধীরে ধীরে সেস্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যান।

গোরখনাথের মাথায় ভীড় করিয়া আসে চিন্তারাশি। এযাবৎ কঠোর সাধনা তিনি কম করেন নাই। গুরু তাঁহার উপর কৃপা বর্ষণ করিয়াছেন অকৃপণ ক'রে, শিব-বরে কায়সিদ্ধি ও নাথত্ব লাভও সম্প্রতি তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়াছে। কিন্তু কায়াসিদ্ধির মধ্যে, কোথায় কোন্ সূক্ষ্মতম স্তরে

যেন একটা ফাঁক রহিয়া গিয়াছে। তবে কি তাঁহার নিজের কোন ত্রুটির ফলে সাধনা আজো পূর্ণাঙ্গ হইতে পারিতেছে না? গুরু মহারাজ কাছে থাকিলে, সব কথা হয়তো জানা যাইত।

বারবার তাই অন্তরে উঠে আর্ত্তি—কোথায় রহিয়াছেন তাঁহার গুরু শিবস্বরূপ মৎস্যেন্দ্রনাথ? কখন, কিভাবে, পাইবেন তাঁহার দর্শন ও সাধন-নির্দ্দেশ?

সেদিন ধ্যানাসনে বসিয়া সঙ্কল্প করিলেন, গুরু কোথায় আত্মগোপন করিয়া আছেন জানা নাই। কিন্তু এবার তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থিতি নিজ শক্তিবলেই তিনি জ্ঞাত হইবেন।

ধ্যানাবিষ্ট হইতে না হইতেই দৃষ্টি তাঁহার প্রসারিত হইয়া গেল সুদূর পূর্ব্বদেশে, কদলীরাজ্যে—কামরূপে।[১] কিন্তু একি অবিশ্বাস্য কাণ্ড! মহাশক্তিধর গুরু, যিনি অঘটন-ঘটন-পটিয়ান, তাঁহাকে তো সেখানে স্ব-স্বরূপে বিরাজমান দেখিতেছেন না? শত শত রূপসী তরুণী দ্বারা তিনি পরিবেষ্টিত। নাথধর্ম্মের আদর্শ, ঐতিহ্য ও নিজ সাধনার ঐশ্বর্য্য বিস্মৃত হইয়া তিনি ভোগসুখে ডুবিয়া আছেন। মনে হইতেছে, আয়ুষ্কালও তাঁহার আর বেশী নাই।

কামরূপ নারীরাজ্য—ইন্দ্রজালের রাজ্য। এখানকার মায়াবিনী রাণী রূপের ফাঁদে মৎস্যেন্দ্রনাথকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন। একি তাঁহার দুঃসহ অবস্থা! এখনি যে ইহার প্রতিকার চাই।

সঙ্গে সঙ্গেই গোরখনাথ তাঁহার সিদ্ধান্ত ও কর্ম্মপন্থা স্থির করিয়া ফেলিলেন। হয়তো কোন প্রারব্ধবশে গুরু এই দুর্ভোগ ভুগিতেছেন। তাঁহার উদ্ধার সাধন যে কোন উপায়ে করিতে হইবে, আর এজন্য গোরখ্ কাজে লাগাইবেন তাঁহার যোগ-সামর্থ্য।

---

[১] কদলীরাজ্যের অবস্থিতি সম্পর্কে ভট্টশালী, শহিদুল্লাহ্, রাজমোহন নাথ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। তবে মায়াবিনী স্ত্রীরাজ্য হিসাবে আমাদের মনে হয়, ইহা—কামরূপ। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, কাশ্মীরের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক কহ্লন রাজা ললিতাদিত্য কর্ত্তৃক প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের স্ত্রীরাজ্য জয় করার কথা লিখিয়াছেন। কাজেই আমাদের বর্ণিত স্ত্রীরাজ্য একটি ঐতিহাসিক সত্য।

সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইতে দেরী হইলনা। যোগবিভূতির বলে মহাযোগী গোরখ তৎক্ষণাৎ উড্ডীয়মান হইলেন অন্তরীক্ষে। মুহূর্ত্তমধ্যে উপস্থিত হইলেন আসামের সেই নারী-শাসিত দেশে।

রাজ্যে প্রবেশ করার পথেই যোগী জালন্ধরীপাদের সঙ্গে তাঁহার দেখা। মৎস্যেন্দ্রনাথের কথা জিজ্ঞাসা করিতেই জালন্ধরীর ঠোঁটে রহস্যময় বাঁকা হাসি খেলিয়া গেল। কহিলেন, "ওঃ, তুমি দেখছি কোন খোঁজ খবরই রাখো না। তোমার গুরু যে যোগসিদ্ধি-টিদ্ধি সব ছেড়ে দিয়েছেন, বিভোর হয়ে রয়েছেন এখানকার রূপসীদের প্রেমে। এ রাজ্যের রাণী মঙ্গলা আর কমলার মায়ার কুহকে তিনি যে একেবারে আত্মবিস্মৃত।"

গোরখনাথ ত্রস্তপথে কদলীর রাজপুরীতে আসিয়া উপস্থিত। রাণীরা মহাসতর্ক, মৎস্যেন্দ্রকে সব সময়ে আগ্‌লাইয়া রাখেন, বিদেশ হইতে যে সব যোগী সন্ন্যাসীরা আসেন তাঁহাদের সহিত কোনমতেই তাঁহাকে সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হয়না।

ভাবিয়া চিন্তিয়া গোরখনাথ যোগবলের সাহায্য নিলেন। রূপসী রঙ্গিনী নর্ত্তকীর বেশ ধারণ করিলেন মুহূর্ত্তমধ্যে। তারপর এই মোহিনীর সাজে মাদল হস্তে নিয়া রাজ-সভায় মৎস্যেন্দ্রনাথের সম্মুখে গিয়া তিনি উপস্থিত। বাংলার লোকগাথায় যোগীবরের লীলা-অভিনয়ের এ চিত্রটি বড় মনোরম হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে—

দেহ রূপ গুণ গোর্ক্ষ দূরে তেয়াগিয়া
স্ত্রীর রূপ ধরে গোর্ক্ষ মায়া ত পাতিয়া।
কাল ধল ধূপে কেশ আমোদিত করি
বিচিত্র কানড় ছান্দে বান্ধিল কবরী।
তাহে বেঢ়ি সরু তরু কুসুমের মালা
মেঘরাজ মধ্যে যেন পড়িছে বিজলা।
অঙ্গুলে অঙ্গুরি পরে কনক-অম্বিকা
পিঠে পাটথোপ দোলে নামে মধুরিকা।

বিচিত্র পাটের ভুনি মেঘগঙ্গাজল
নানা চিত্র ধৌত তাহে দেখিতে উজ্জ্বল।
কপালেত সাজাইল দিয়া পত্রাবলি
এমন সিন্দুরের ফোটা পরিলা সুন্দরী।

রূপসী নর্ত্তকীর সাজে সজ্জিত গোরখকে দেখিয়া রাজসভায় আলোড়ন উঠিল। এদিকে গোরখ কিন্তু বিপদে পড়িলেন, মনোহারিণী তরুণীর বেশে মৎস্যেন্দ্রের দরবারে প্রবেশের অধিকার তো পাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কাছে বক্তব্য উত্থাপনের সুযোগ কই? কুহকিনী নারীরা চারিদিকে। তাহাদেরই মায়াপাশের বিরুদ্ধে তিনি বলিতে আসিয়াছেন, একটু কিছু বলিতে গেলেই তাহারা অনর্থ বাধাইয়া বসিবে। আত্মবিস্মৃত গুরুর কাণে কাণে গোপনে পূর্ব্বজীবনের কথা তুলিবেন, পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইয়া তুলিয়া তাঁহার উদ্ধার সাধন করিবেন, তাহারও উপায় নাই।

ভাবিয়া চিন্তিয়া গোরখনাথ তাঁহার মাদলের ধ্বনিতে সঞ্চারিত করিলেন যোগশক্তি। সেই ধ্বনি ও সুরলহরীর মধ্য দিয়া গুরু মৎস্যেন্দ্র শুনিলেন শিষ্যের আকুল আবেদন, উপলব্ধি করিলেন তাঁহার নিজের চৈতন্য সম্পাদনের প্রচেষ্টা। নৃত্য ও মাদল বাদনের মাধ্যমে গোরখের এই তত্ত্ব-আলাপনের কাহিনীটি বড় অপূর্ব্ব। আমাদের পল্লীকবিদের প্রতিভার স্পর্শে এ কাহিনী বড় রসমধুর হইয়া—

টিম টিম করিয়া মাদলে দিল সান,
কর্ণপথে যেন কত আবৃত হইল প্রাণ।
তাহার পশ্চাতে বাম মাদলে দিল ঘাত,
সর্ব্বপুরী মোহিত করিল গোর্খনাথ।
লঙ্গ মহালঙ্গ দুই দূতে বাহে তাল,
ঝমকে ঝমকে শব্দ উঠে অতি ভাল।
নাচন্ত যে গোর্খনাথ মাদলে করি ভর,
শূন্যেতে নাচয়ে গোর্খ দেখে সর্ব নর।
নাচন্ত যে গোর্খনাথ ঘাঘরের রোলে,

কায়া সাধ কায়া সাধ মাদলেতে বোলে।
হাতের ঠমকে নাচে গাও নাহি নড়ে,
আপনে ডুবাইলো ভরা, গুরু মোছন্দরে।

মাদলের বোল বারবার ধ্বনিত হইতেছে, আর মৎস্যেন্দ্রের কাণে তাহা পৌঁছিতেছে বিস্মৃত যোগসাধনার নূতন সঙ্কেতরূপে। কায়া-সাধনার সিদ্ধি ও যোগী-জীবনের পরম ঐশ্বর্য্য গুরু আপন ভাগ্যদোষে হারাইয়া বসিয়াছেন। তাই শক্তিধর শিষ্য গোরখনাথ আজ তাহার পুনরুদ্ধারে ব্রতী। অবশেষে তাঁহার এই চেষ্টা ফলপ্রসূ হইয়া উঠে, মানসপটে গুরুর পূর্ব্ব জীবনের বিস্মৃত অধ্যায়টি ধীরে ধীরে উন্মোচিত হইতে থাকে। রূপসী নারীকুলের মোহপাশ ছিন্ন করিয়া, উদ্ধারকর্ত্তা শিষ্যের হাত ধরিয়া রাজপুরী হইতে তিনি নিষ্ক্রান্ত হইয়া পড়েন।

কদলীরাজ্য অতিক্রম করিয়াই কিন্তু মৎস্যেন্দ্রনাথ ধারণ করেন তাঁহার অপরূপ লীলাময় মূর্ত্তি। দেখিতে দেখিতে স্বাভাবিক স্থূল দেহটি পরিণত হয় জ্যোতির্ম্ময় দিব্য দেহে! আকাশপথে তখনি তাহা তীব্রবেগে ধাবিত হয়। যোগযুক্ত হইয়া গোরখনাথও উড়িয়া চলেন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে।

মুহূর্ত্তে উভয়ে পার হইয়া চলেন প্রায় হাজার মাইল পথ, তারপর গোদাবরী তীরে এক বনমধ্যে আসিয়া একযোগে ভূতলে অবতরণ করেন।

সম্মুখে, গহন অরণ্যের মাঝখানে বিরাজিত এক ক্ষুদ্র ভজন কুটির। বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে গোরখনাথ চাহিয়া দেখেন, গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ স্থূলদেহে সেখানে রহিয়াছেন ধ্যানাবিষ্ট। আর তাঁহার সম্মুখে কয়েকটি সেবক ভক্ত যুক্ত ক'রে বসিয়া আছে।

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! গুরুর যে দিব্যদেহ অনুসরণ করিয়া তিনি এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন—ধীরে ধীরে তাহা সম্মুখে উপবিষ্ট গুরুরই দেহে মিশিয়া গেল।

একি অদ্ভুত অলৌকিক কাণ্ড! গুরুদেব মৎস্যেন্দ্রনাথ তবে কি ইতিপূর্ব্বে কদলীরাজ্য ছিলেন না? সেখানে গিয়া গোরখনাথ এতদিন

যাহা কিছু দেখিয়া আসিলেন, যাহা কিছু করিলেন, সবই কি তবে স্বপ্ন ? অথবা তাঁহার মায়াবিভ্রম ?

গুরু সম্প্রতি আসামে গিয়াছিলেন কিনা জিজ্ঞাসা করিতেই সেবকেরা হাসিয়া উঠিল। কহিল, "গত কয়েক বৎসর যাবৎ গোদাবরী তীরে, এই পবিত্র ভূমিতেই যে তিনি রয়েছেন সাধনরত। একদিনের তরেও তো এ স্থান ত্যাগ করতে দেখা যায় নি।"

সেই মুহূর্ত্তে গোরখনাথ উপলব্ধি করিলেন, গুরু তাঁহাকে বিভ্রান্ত করিয়াছেন মায়ার খেলায়। কদলীরাজ্যের সব কিছু ঘটনা তাঁহারই রচিত ইন্দ্রজাল ছাড়া আর কিছু নয়। সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে জাগিয়া উঠে তীব্র অনুতাপ। যে গুরু নাথযোগে মহাসিদ্ধ, মহাজ্ঞানের অধিকারী, দিব্যদেহ ধারণ করিয়া সতত যিনি সিদ্ধ যোগী সন্ন্যাসীদের মুক্তি ও জ্ঞান বিতরণ করিয়া ফিরেন, সেই গুরুকে উদ্ধার করার প্রশ্ন উঠে কি করিয়া ? যাঁহার কৃপায় অপরিমেয় যোগসিদ্ধি গোরখনাথের করায়ত্ত হইয়াছে, সেই মহান আচার্য্যকে তিনি উদ্ধার করিলেন, এমন উদ্ধত চিন্তা কি করিয়া তাঁহার মনে স্থান পাইল ?

ধ্যান-সমাহিত সিদ্ধাচার্য্য মৎস্যেন্দ্রনাথ এবার ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করেন। স্নেহপূর্ণ স্বরে কহেন, "বৎস গোরখনাথ, তুমি যা ভাবছো, তা' যথার্থ। কদলীরাজ্যে আমি মায়াপুরী[১] নির্ম্মাণ করেছিলাম তোমারই কল্যাণ ও শিক্ষার জন্য।"

অনুতাপের সুরে, যুক্ত করে গোরখনাথ কহিলেন, "প্রভু, কদলী ছেড়ে আপনার গোদাবরী তীরের এই আশ্রমে পৌঁছুবার পরই আমার চৈতন্যোদয় হয়েছে। বুঝেছি, আপনার শক্তি ও জ্ঞানের পরিমাপ নেই, আপনার পক্ষে সংসারের মায়াপাশে বদ্ধ হবার প্রশ্ন ওঠে না।"

"বৎস, নাথযোগীর পরমকাম্য সম্পদ মহাজ্ঞান লাভের যোগ্যতা তুমি লাভ করেছো, সিদ্ধদেহ থেকে দিব্যদেহে উত্তরণের সময়ও তোমার হয়ে এসেছে। তোমার সপ্তধাতুময় দেহ যোগাগ্নিতে দগ্ধ হয়েছে, সত্য,

---

১। কল্যাণ, সন্ত অঙ্ক—পৃঃ ৪৮০-৯১—নাথ সম্প্রদায় কি মহাসিদ্ধ।

কিন্তু গোরখনাথ, তোমার এই অধ্যাত্ম-রূপান্তরের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তোমার অতিরিক্ত নৈষ্ঠিকতা আর শুদ্ধতাজনিত সূক্ষ্ম অহংবোধ। আমাদের নাথধর্ম্ম যোগ ও তন্ত্র এই যুগ্ম ভিত্তির ওপরই প্রতিষ্ঠিত। অথচ তন্ত্রসিদ্ধি ও তন্ত্রসাধনার আচার আচরণকে তুমি মনে মনে তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করেছিলে, বৎস।"

"আপনি ঠিকই বলেছেন, প্রভু। সহজাত সংস্কারবশেই আমি হয়তো এটা করেছি।"

"হ্যাঁ, আর এই কারণেই আমার প্রচারিত কৌলযোগিনী তত্ত্ব তোমার তেমন মনঃপুত হয়নি। বৎস, জন্মান্তরের সংস্কার ভস্মীভূত না হলে, আত্মাভিমানের প্রচ্ছন্ন কাঁটাটি দূর না করলে, নাথযোগ-সিদ্ধির চরম স্তরে তো তোমায় নিয়ে যাওয়া যায় না। তাইতো আমায় এত কাণ্ড করতে হলো।[১] এবার হয়তো বুঝেছো, আমাদের নাথমার্গে ত্যাগ ও ভোগের সামরস্য সাধনই হচ্ছে প্রধান লক্ষ্য।"

যুক্ত করে, নত শিরে গোরখনাথ গুরুর তত্ত্ব-উপদেশ স্বীকার করিয়া নিলেন। সবিনয়ে কহিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার কৃপায় আজ বুঝতে পারছি—

একহস্তে ধৃতস্ত্যাগো ভোগাশ্চৈককরে স্বয়ম্
অলিপ্তস্ত্যাগভোগাভ্যাম্.........।"

এবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িলেন গোরখনাথ। শুদ্ধ সংস্কার নিয়াই তিনি জন্মিয়াছেন, তারপর সাধনজীবনকে গড়িয়া তুলিয়াছেন পবিত্রতা ও ব্রহ্মচর্য্যের ভিত্তির উপর। কৃচ্ছ্র ও তপশ্চর্য্যার কঠোরতা ও এ জীবনে কম করেন নাই। এসবের ফলে অবচেতন মনে সূক্ষ্ম আত্মাভিমান

১। নাসিক ও বোম্বাই অঞ্চলে পুরাতন জনশ্রুতি আছে যে, গোরখগুরু মৎস্যেন্দ্র শিষ্যের অহংবোধ নষ্ট করার জন্য মায়াজালের সৃষ্টি করেন এবং রমণীর মোহে আবদ্ধ হওয়ার এক মিথ্যা লীলা-অভিনয় করেন। বোম্বাই অঞ্চলের জনপ্রিয় নাটক মায়ামচ্ছীন্দর-এ মৎস্যেন্দ্রনাথের এই লীলামাহাত্ম্যের বর্ণনা আছে।

অবশ্যই কিছুটা জাগিয়াছিল এবার গুরু তাহা নিশ্চিহ্ন করিলেন, পরিশুদ্ধ আধারে জ্বালাইয়া দিলেন পরম চৈতন্যের জ্যোতি।

শিষ্যকে মৎস্যেন্দ্র স্নেহভরে নিকটে ডাকিলেন। কহিলেন, "বৎস, গোরখ, তুমি নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছো, কায়াসাধনা তোমার হয়েছে পূর্ণাঙ্গ, তদুপরি রাজযোগের নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্ভাসিত হয়েছে তোমার সত্তায়। এবার তুমি দেশের দিক দিগন্তে গিয়ে নাথ-সাধনপন্থার প্রচারে ব্রতী হও। পরমতত্ত্ব বিতরণ ক'র প্রকৃত অধিকারী সাধকদের।"

দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর যদিইবা গুরুর সাক্ষাৎ পাইয়াছেন, আবার কি তাঁহাকে হারাইতে হইবে? গোরখনাথের দুই চোখ ছল ছল করিয়া আসে। কিন্তু গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য না করিয়াই বা উপায় কি?

পরদিন স্থান ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। ভক্তিভরে মৎস্যেন্দ্রের পাদবন্দনা করিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "বৎস, তোমায় আমায় বিচ্ছেদ কি ক'রে হতে পারে? তোমায় যে আমি পূর্ণরূপে অঙ্গীকার করে নিয়েছি। যখনই যেখানে থাকবে, সেখানেই আমায় তোমার পাশে পাবে—কি প্রচ্ছন্নে কি প্রকাশ্যে।"

অতঃপর ভারতের বহু পবিত্র তীর্থ গোরখনাথ পরিক্রমণ করেন এবং এই সুযোগে অজস্র শৈব সাধককে দান করেন দীক্ষা ও সাধন। তাঁহার কৃপালীলা ও যোগ বিভূতির বিস্ময়কর ঐশ্বর্য্য এই সময়ে নানা স্থানে প্রকটিত হয়। ভক্ত জনসাধারণ ও যোগী সাধকদের কাছে গোরখনাথের এই কাহিনীগুলি আজো প্রিয় হইয়া রহিয়াছে।

গোরখনাথের গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ ছিলেন মহাসমর্থ সাধক। সমকালীন ভারতের তিনি শ্রেষ্ঠ কৌলাবধূত। তাঁহার রচিত 'কৌলজ্ঞান-নির্ণয়' এক অবিস্মরণীয় গ্রন্থ। এ দেশের শৈব, শাক্ত ও বৌদ্ধ সাধকদের মধ্যে এই গ্রন্থের মর্য্যাদা অপরিসীম।

নেপালের রক্ষক ও অভিভাবকরূপে মৎস্যেন্দ্র দীর্ঘকাল পূজা পাইয়া আসিতেছেন। নেপাল ও তিব্বতের বৌদ্ধদের মতে, তিনিই হইতেছেন

প্রভু অবলোকিতেশ্বর—যাঁহার উপর এ যুগের ভার বহনের দায়িত্ব ন্যস্ত রহিয়াছে। কিন্তু নেপাল ও তিব্বতের বৌদ্ধেরা মৎস্যেন্দ্রকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বলিয়া যত গৌরবই করুক না কেন, আসলে তিনি বৌদ্ধ মোটেই ছিলেন না। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, মৎস্যেন্দ্রের সুবিখ্যাত কৌলগ্রন্থ আলোচনা করিলে তাঁহাকে কখনই বৌদ্ধ বলিয়া মনে করা যায় না। বাস্তবিক পক্ষে দেখা যায়, নাথ-সাধকদের পরম শ্রদ্ধেয় গুরুরূপে পরিচিত হইয়াও মৎস্যেন্দ্র বৌদ্ধদের উপাস্য দেবতারূপে গণ্য হইয়াছেন, অসামান্য মর্য্যাদা পাইয়াছেন। ইহাই তাঁহার বড় বৈশিষ্ট্য[১]। তাছাড়া, গোরখের কায়াবোধ গ্রন্থে তাঁহার উল্লেখ আছে পশুরন্তক বা পশু-হত্যাকারীরূপে[২]। পশুহত্যার সহিত যিনি জড়িত তিনি নিশ্চয়ই বৌদ্ধ হইতে পারেন না।

মৎস্যেন্দ্র সম্বন্ধে অবশ্যই আরো বলা যায়—"তিনি গোরক্ষের গুরু ও কানফাটা সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। নেপালেই তিনি শৈব ধর্ম্মের প্রচার করেন। তিনি পাশুপত শৈব সন্ন্যাসীরূপে নেপালে গমন করেন বলিয়া তাঁহার শৈব বিগ্রহ নেপালে রহিয়াছে[৩]।"

কৌলসাধনার অন্যতম শাখা যোগিনী-কৌলমার্গের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া মৎস্যেন্দ্র কীর্ত্তিত। তাঁহার রচিত কৌলশাস্ত্র এক সময়ে পূর্ব্ব ও উত্তর-ভারতে খুবই প্রচারিত ছিল। কৌলজ্ঞান-নির্ণয়ের শ্লোকঃ "কামরূপে ইদং শাস্ত্রং যোগিনীনাং গৃহে গৃহে"—এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

শুধু কামরূপ, পূর্ব্বভারত, নেপাল ও তিব্বত কেন, সারা ভারতের উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলে বিস্তারিত হইয়াছিল এই মহাকৌল সাধকের আদর্শ ও সাধন প্রণালী। ভারত সীমান্তে, সুদূর কাশ্মীরের সাধক সমাজেও সে সময়ে প্রচারিত ছিল মৎস্যেন্দ্রনাথের সাধনৈশ্বর্য্যের খ্যাতি। তাই দেখি, একাদশ শতকের বহুলশ্রুত সাধক ও দার্শনিক, শৈবাগমের

১ শাস্ত্রী: বৌদ্ধগান ও দোঁহা—পৃঃ ১৬। ২ ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজঃ এস, বি, এস—ভল্যু ৬—১৯ ff ৩ কল্যাণী মল্লিক: নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন প্রণালী—পৃঃ ৩৩

শক্তিধর আচার্য্য, অভিনবগুপ্তের রচনায় রহিয়াছে মৎস্যেন্দ্র বা মচ্ছন্দ-বিভুর স্তুতিগান—

রাগারুণং গ্রন্থিবিলাবকীর্ণং
যো জালমাতানবিতানবৃত্তিঃ।
কলোম্ভিতং বাহ্যপথে চকারস্তাম্মে
স মচ্ছন্দবিভুঃ প্রসন্নঃ॥

(তন্ত্রালোক ১।৭)

—জাল-বুননকারী সুদক্ষ ধীবর তার তানা-পোড়েন দিয়ে, গ্রন্থি আর ছিদ্রসহ বহুবিচিত্র জাল ক'রে নির্ম্মাণ। এমনিভাবে বাহ্য জগতের সৃষ্টি-জাল যিনি সদা করছেন বয়ন—সেই মৎস্যেন্দ্র-বিভু প্রসন্ন হোন্ আমার প্রতি।

মৎস্যেন্দ্রের মতই মহাসমর্থ ও বহুকীর্ত্তিত সাধক ছিলেন গোরখনাথ। গুরুর নিকট হইতে নাথধর্ম্মের দীক্ষা নিয়া, গুরুর নির্দ্দেশিত পথে সাধন-ভজন সমাপ্ত করিয়া যোগী গোরখনাথ উদ্ভাবন করেন এক নূতনতর সাধনপথ। সে পথ তাঁহার স্বকীয় প্রতিভায় উজ্জ্বল, তাঁহার অসামান্য পবিত্রতা ও সাধন-প্রজ্ঞায় কল্যাণময়।

গোরখের ইষ্ট হইতেছেন উর্দ্ধরেতা মহাযোগী শিব—শিরে যাঁহার রুক্ষ জটার ভার, কণ্ঠে বিভূষিত হাড়ের মালা, পরিধানে বাঘছাল। ত্যাগ বৈরাগ্যের মূর্ত্ত বিগ্রহ এই ইষ্টদেবকে পাইতে হইলে অনুসরণ করিতে হইবে কঠিনতম বৈরাগ্যের পথ, জয় করিতে হইবে দেহস্থিত মহাবায়ু, লাভ করিতে হইবে নাদসিদ্ধি। ভোগের পথে না গিয়া দেহের মহারসকে করিতে হইবে উর্দ্ধায়িত। সহস্রার ক্ষরিত অমৃত পান করিয়া গুরুর কৃপাপ্রাপ্ত শৈবযোগীকে হইতে হইবে সাক্ষাৎ শিব।

শিব-সিদ্ধ গোরখনাথ তাঁহার অনুগামীদের মধ্যে শিবেরই বেশভূষা, ত্যাগ বৈরাগ্য ও শুদ্ধতার আদর্শ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। উত্তরকালে অবশ্য নাথ সম্প্রদায়ে বামাচার ও পশ্বাচার-এর মতবাদ প্রবল হইয়া

উঠিয়াছে, কিন্তু গোরখ তাঁহার নিজ জীবনে এ সবের প্রাধান্য কোনদিনই দিতে চাহেন নাই।

গোর্খ বিজয়, ময়নামতীর গান এবং অন্যান্য গ্রন্থ হইতে দেখা যায়, গোরখ কামিনী সংস্পর্শ হইতে মুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন নিষ্কামতা ও পবিত্রতার মূর্ত্ত বিগ্রহ। মৎস্যেন্দ্রনাথের নিকট দীক্ষা গ্রহণের পর গুরুর কৌলাচার ও তান্ত্রিকতার পথ তিনি অনুসরণ করেন নাই—অনুসরণ করিয়াছিলেন তাঁহার উপদিষ্ট যোগমার্গের পথ। ত্যাগ ও বৈরাগ্যের পথে, শুদ্ধাচার ও বীর্য্য ধারণের পথে নাথসিদ্ধির এক নিজস্ব মার্গই তিনি আপন সাধনশক্তি এবং অলৌকিক প্রতিভার বলে রচনা করিয়া গিয়াছেন।

গোরক্ষবিজয়-এ উল্লেখিত গোরখনাথের জন্ম কাহিনীর মধ্যে এই মহাযোগীর পরিশুদ্ধ সাধনজীবনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সেখানে আছে, আদি পুরুষের—

জটা ভেদি নিকলিল যতি গোর্খনাথ,
সিদ্ধির ঝুলি সিদ্ধির কাথা তাহার গলাত।

এই গ্রন্থের কাহিনী ও তথ্যাদিতে মহাযোগীর এক অপরূপ শুচিশুভ্র মহিমময় মূর্ত্তি আমরা ফুটিয়া উঠিতে দেখি। গোরখ-চরিত্রের মূল্যায়ণ করিতে গিয়া সাহিত্য-গবেষক ডক্টর দীনেশ সেন লিখিয়াছেন,--"গোরক্ষযোগীর চরিত্র শরৎ শেফালিকা বা যূথিকার ন্যায় শুভ্র, তাঁহার চরিত্র-মাহাত্ম্য বঙ্গ সাহিত্যের আদি যুগের একটি প্রধান দিক্-নির্দ্দেশক স্তম্ভ। ইহা বৌদ্ধযুগের চরিত্রবল, উচ্চনীতি, গুরুভক্তি প্রভৃতি মহৎ গুণরাশিকে উজ্জ্বল করিয়া দেখাইতেছে। বিশাল অদ্রিশ্রেণী যেরূপ বঙ্গদেশের সীমাচিহ্ন, গোরক্ষবিজয় এদেশের সাহিত্যের সেইরূপ যুগ নির্দ্দেশক চিহ্ন। এই চিহ্নের পর—ভিন্ন যুগ ও ভিন্ন রাজ্যের এলাকা, তখন ব্রাহ্মণ আসিয়া সংস্কৃত সাহিত্য মন্থন করিতেছেন, গ্রাম্য ভাষাকে অবজ্ঞা করিয়া সংস্কৃত শব্দ দ্বারা বঙ্গভাষাকে সাজাইতেছেন

এবং কঠোর জ্ঞানমার্গ ও চরিত্রবলের পথ ছাড়িয়া কোমল ভক্তি ও প্রেম কুসুমাকীর্ণ পথে লোক-রুচিকে সবলে টানিয়া লইতেছেন।..... গোরক্ষ ভগবতীর সমস্ত প্রলোভন এক একটি করিয়া জয় করিয়া ইয়ুদিশ্রেষ্ঠ জভের মত অকুণ্ঠিতভাবে স্থৈর্য্যপরায়ণ। নারীর ললাম সৌন্দর্য্য প্রেম নিবেদনের নব নব কষ্টিপাথরে তাঁহার চরিত্র কতবার কর্ষিত হইল,—কিন্তু প্রত্যেক বারই প্রমাণিত হইল, তাহা খাঁটি সোনা। পার্ব্বতী শিবের নিকট স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছিলেন, তাঁহার মায়ার নিকট যোগীর সাধনা কোন্ ছার! অন্যান্য যোগীরা রূপের জালে পড়িয়া ধৃত হইলেন, মীননাথ স্বয়ং মীনের মতই জালে আবদ্ধ হইলেন, কিন্তু গোরক্ষনাথের নিকট পার্ব্বতীর উচ্চ শির হেঁট হইল!"

দশম শতক হইতেই গোরখনাথ সারা ভারতে খ্যাত হইয়া আছেন অলৌকিক শক্তিধর সাধক ও শ্রেষ্ঠ যোগীরূপে। উত্তর ও পশ্চিম ভারতে তাঁহার প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল অসাধারণ। ঐসব অঞ্চলের অসংখ্য গ্রামে তাঁহার এবং তাঁহার উত্তর সাধকদের মহিমা ও যোগসিদ্ধি নিয়া অজস্র গল্প গাথা রচিত হইয়াছে, আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। বাংলা হইতে পাঞ্জাব, নেপাল হইতে রাজপুতনা, সিন্ধু ও বেলুচিস্থান হইতে দাক্ষিণাত্য অবধি সর্ব্বত্র তাঁহার সাধনা ও সিদ্ধির চমকপ্রদ আখ্যায়িকা বিস্তারিত।

গোরখ নিজে যোগসিদ্ধির শীর্ষে বিরাজমান, এক বিরাট শৈব-যোগী সম্প্রদায়ের তিনি প্রতিষ্ঠাতা—সাধারণ্যে যাঁহারা পরিচিত কানফাটা-যোগী নামে। হঠযোগ ও রাজযোগের পুনরুজ্জীবনকারী মহাসাধক-রূপেও এদেশের ধর্ম্ম-সংস্কৃতির ইতিহাসে তাঁহার কীর্ত্তি চিরকাল অক্ষয় হইয়া থাকিবে।

নেপালের গোর্খা জাতি ও গোর্খা রাজ্যের রক্ষক এবং অভিভাবক মহাপুরুষরূপে গোরখনাথ অতুলনীয় মর্য্যাদার অধিকারী। গৃহস্থদের

কৃপালু আশ্রয়দাতা এবং দেব-বিগ্রহরূপেও সেখানে তিনি এযাবৎ পূজা পাইয়া আসিতেছেন।[১]

গোরখনাথের নামাঙ্কিত বহু সরকারী মুদ্রা নেপালের বিভিন্ন রাজ-আমলে দীর্ঘদিন চলিয়া আসিয়াছে[২], সেখানকার জন জীবনের মূলে গোরখের মাহাত্ম্য ও প্রভাব গভীরভাবে প্রবেশ করিয়াছে। নেপালে জনশ্রুতি আছে—গোরখ একবার নেপালবাসীর উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হওয়ায় সেখানে একাদিক্রমে বার বৎসরকাল অনাবৃষ্টি চলিতে থাকে, রাজ্যময় হাহাকার উঠে। এই সঙ্কট সময়ে গোরখ-গুরু মৎস্যেন্দ্রকে ছুটিয়া আসিতে হয় এবং তাঁহার কৃপায় বারিবর্ষণ ঘটে।

গোরখনাথ শুধু ভারতের অন্যতম সিদ্ধাচার্য্য ও শৈবযোগী বলিয়াই পরিচিত নহেন, এদেশের সাধক ও সাধারণ ভক্ত নরনারীর দৃষ্টিতে তিনি অধিষ্ঠিত এক আরাধ্য দেবতারূপে। শিবের অবতাররূপে তিনি বহুস্থানে পূজিত হইতেছেন, এবং বহু শৈব মন্দিরে তাঁহার পূজা অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়। তবে কান্‌ফাটা নাথযোগীদের মঠ মন্দিরেই তাঁহার বিগ্রহ বিশেষ ভক্তি-সহকারে অর্চ্চিত হয়।

গোরখপুরে যোগীবরের গদি রহিয়াছে, সেখানকার মন্দিরে তাঁহার 'চরণ' দেববিগ্রহের চরণের মতই আরাধিত হয়। কাথিওয়াড়ে ও শকলদ্বীপে ভক্তেরা তাঁহার 'চরণ' নিয়মিতভাবে পূজা করিয়া থাকেন[৩]।

গোরখনাথের বিগ্রহ নানা স্থানে যোগী শিষ্যেরা স্থাপন করিয়াছেন। গোরখমণ্ডী পাটনের নয় মাইল পুবে, সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত। পশ্চিমাঞ্চলের ইহা একটি বড় নাথপীঠ। এখানকার গুহায় গোরখের বিগ্রহ পূজিত হয়। হিমালয়ের গাড়োয়াল ও কুমায়ুনের সিদ্ধস্থানে ও ত্রিম্বকে গোরখনাথের মূর্ত্তি শ্রদ্ধাভরে রক্ষিত আছে। দমদমের গোরখ-বাঁশুরীর মূর্ত্তিটি কয়েকশত বৎসর যাবৎ পূজা পাইয়া আসিতেছে।

---

[১] সিল্‌ভ্যাঁ লেভিঃ ল' নেপাল্—ভল্যু ১, পৃঃ ৩৫২। [২] ক্যাটালগ্ অব্ দি কয়েন্‌স্ ইন্ দ্য ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামঃ ভি, স্মিথ—ভল্যু ১, পৃঃ ২৮৯-৯৩।
[৩] ডক্টর মোহন সিং-এর মতে শকলদ্বীপ মানে শকদ্বীপ, আধুনিক শিয়ালকোটের নিকটস্থ একটি স্থান : গোরখনাথ—পৃঃ ৭৩

ভারতের নানা অঞ্চলের কালভৈরব মন্দিরে এবং সাধক গুগার মন্দিরগুলিতে গোরখনাথের বিগ্রহ বিরাজিত দেখা যায়। প্রতি বৎসর দাং চাংড়া হইতে দেবী পাটনে একটি প্রস্তর-লিঙ্গ শোভাযাত্রা করিয়া নেওয়া হয় এবং তাঁহার পূজা করা হয়। ভক্তেরা মনে ক'রে, এ লিঙ্গটিতে গোরখনাথের অধ্যাত্মসত্তা নিহিত রহিয়াছে। বেলগাঁও-এর কান্‌ফাটা যোগীরা তাঁহাকে পূজা করেন মন্দিরের অধিষ্ঠাতা দেবতাজ্ঞানে। পাহাড়ী গুর্খারা গোরখনাথের মূর্ত্তি গৃহের একটি বিশেষ স্থানে স্থাপিত করিয়া ফুল বেলপাতা দিয়া নিত্য প্রণাম ক'রে আর মন্দিরে পুরোহিতের দ্বারা তাঁহার বিগ্রহ পূজা ক'রে নৈষ্ঠিকভাবে। সাড়ম্বরে শঙ্খঘণ্টা বাজাইয়া ঐসব মন্দিরে ভোগান্ন নিবেদন করা হয় এবং পুরোহিত ও ভক্তেরা সবাই মিলিয়া গোরখনাথের বিগ্রহ প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে।

প্রসিদ্ধ ইতালিয়ান পণ্ডিত তেসিতোরির মতে, গোরখপন্থী কান্‌ফাটা যোগীরা প্রধানত উত্তর ভারত হইতেই সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রসারকালে যোগীগোষ্ঠীর অস্তিত্ব অবশ্যই ছিল, কিন্তু ইহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি গড়িয়া উঠে তখনই যখন বৌদ্ধবাদ জনজীবন হইতে অপসৃত হইতে থাকে—আর ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের মধ্যে ধীরে ধীরে দেখা দেয় নব উজ্জীবন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার ও প্রসারের দিনে তৎকালীন সমাজের বহু যোগীসাধক ইহার প্রভাব-গণ্ডীর ভিতরে অনিবার্য্যরূপে আকর্ষিত হইয়াছিলেন। আর গোরখনাথই সেই ধর্ম্মনেতা যিনি পড়ন্ত বৌদ্ধসমাজে মিশিয়া-যাওয়া যোগীদের বাহিরে টানিয়া আনেন, নূতনতর ও সমৃদ্ধতর আধ্যাত্মিক ছত্রছায়া তলে তাঁহাদের করেন সমবেত।[১]

চলতি নাথধর্ম্ম ও নাথ-যোগপন্থাকে উপনিষদের দর্শন ও সাধনার সহিত অন্বিত করাও ছিল এই মহান শৈবযোগীর এক বড় অবদান। গোরখনাথ আচার্য্য শঙ্করের খুব বেশী পরবর্ত্তী ছিলেননা এবং ব্রাহ্মণ্য জাগৃতি হইতে প্রেরণা পাইয়াই যে তিনি নাথপন্থের পুর্নগঠনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন তাহাও নিশ্চিতরূপেই বলা যায়।

---

[১] এল, পি, তেসিতোরি—যোগী (কান্‌ফাট্টা)—ই-আর-ই: পৃঃ ৮৩৪

গোরখনাথের নূতন ধর্ম্মান্দোলনের আর এক বড় বৈশিষ্ট্য—ইহাতে জাতি বা বর্ণের বিচার নাই। ইষ্টদেব শিবের উপাসনা সবাই অবাধে করিতে পারে। অবধূত ও নাথ হওয়ার যোগ্যতা এবং জীবন্মুক্ত হওয়ার অধিকার যে কোন সাধকেরই রহিয়াছে। প্রয়োজন শুধু সমর্থ গুরুর নির্দ্দেশে একনিষ্ঠভাবে সাধন করিয়া যাওয়া।

জাতিগোত্রের বাধাবন্ধনহীন সর্ব্বজনীন মুক্তির আহ্বান মধ্যযুগে স্পষ্টতর ও সোচ্চার হইয়া উঠে রামানন্দ, কবীর, নানক, চৈতন্য প্রভৃতির আন্দোলনে। পূর্ব্বসূরী গোরখনাথ ও গোরখপন্থী যোগীসাধকদের উদার ভাবধারা অবশ্যই মধ্যযুগের এই ধর্ম্মাচার্য্যদের অনেকাংশে অনুপ্রাণিত করিয়াছে, ব্যাপকতর অধ্যাত্মজীবনের ভিত্তি নির্ম্মাণে সাহায্য করিয়াছে।

ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বলতা, সংগঠনশক্তি ও সাধনসিদ্ধির ঐশ্বর্য্যে গোরখনাথ ছিলেন দশম ও একাদশ শতকের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মনেতা। তাঁহার প্রতিষ্ঠা ও মাহাত্ম্য তাঁহার গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথকেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল। পণ্ডিতপ্রবর জি, এ, গ্রীয়ারসনের মতে,—এ দেশের সমস্ত লোকগাথা ও আখ্যায়িকা হইতে স্পষ্টতই বুঝা যায়, শিষ্য গোরখনাথ তাঁহার গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ অপেক্ষা অনেক বেশী কীর্ত্তিমান ছিলেন এবং তিনিই ছিলেন কর্ণবেধযুক্ত কান্‌ফাটা যোগী সম্প্রদায়ের প্রকৃত প্রবর্ত্তক এবং ধারক বাহক।[১]

কাণফাটারা যে মূলত শৈব তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাহাদের ইষ্ট হইতেছেন শিব, ঋক্‌বেদে যিনি রুদ্ররূপে স্তুত। এই রুদ্র ধ্বংসের প্রতীক—মহা ভয়ঙ্কর। যজুর্ব্বেদেই প্রথমে আমরা তাঁহাকে ঈশ্বর এবং মহাদেব নামে অভিহিত হইতে দেখি। অথর্ব্ববেদ ও ব্রাহ্মণসমূহে রুদ্র হইতেছেন পশুপতি—পশুজগতের অধিপতি। উপনিষদে লক্ষ্য করি, এই দেবতা রুদ্রই হইয়া উঠিয়াছেন জগৎস্রষ্টা, দেবাদিদেব—পরম পুরুষ।

গোরখনাথী যোগীরা শিবের রুদ্ররূপের, ভয়াল সর্ব্বধ্বংসী রূপের উপাসনাই প্রধানত করিয়া থাকেন। মহৎ ভয়ং বজ্রং সমুদ্যতং—এই রূপেরই মনন চিন্তন তাঁহাদের কাছে বেশী কাম্য। কাল ভৈরবের

১ এন্‌সাইক্লোপিডিয়া অব্‌ রিলিজিয়ান্‌ অ্যাণ্ড্‌ এথিক্‌স্‌—পৃঃ ৩২৯

বিগ্রহ তাঁহাদের অতি প্রিয়। যোনীলিঙ্গ ও শক্তি-উপাসনায়ও দেখি তাঁহাদের প্রচুর উৎসাহ।[১] তবে এই শিবকে আবার জগতের স্রষ্টা, জীবের চৈতন্যদাতা এবং মঙ্গলদাতা পরম পুরুষরূপেও তাঁহারা আরাধনা করেন।

শিবের সর্ব্বত্যাগী মহাবৈরাগী রূপটিই এই যোগীদের প্রিয়। এই রূপের তাঁহারা শুধু ধ্যান মননই করেননা, নিজেদের চেহারায় এবং সাজ সজ্জায়ও করেন ইহার অনুকরণ।

নাথধর্ম্মের তত্ত্ব ও সাধনের সঙ্গে বৌদ্ধতন্ত্রের সাদৃশ্য দেখিয়া অনেকে ধারণা পোষণ করেন, বৌদ্ধতন্ত্র হইতে কালক্রমে ইহা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে এবং পরিগ্রহ করিয়াছে শৈবধর্ম্মের রূপ। কিন্তু এই ধারণার মূলে কোন সত্য নাই। আসলে নাথধর্ম্ম ভারতের সুপ্রাচীন সিদ্ধমত হইতেই উদ্ভূত এবং ইহা তাহারই এক বিবর্ত্তিত রূপ। এই সম্প্রদায়ের সিদ্ধ যোগীরা রসায়ন ও হঠযোগের উপর অত্যন্ত বেশী গুরুত্ব দিতেন এবং এই সাধনাকে বলা হইত—কায়াসাধন। এই সাধনার বলে সাধকের দেহ হইত পক্ক ও পরিণামবিহীন, লাভ করিতেন তিনি জরামরণহীন অমর জীবন।

ভেষজ ও রসায়ন প্রয়োগে যে যোগসিদ্ধি অর্জ্জন করা যায়, যোগশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা ও সঙ্কলক ঋষি পতঞ্জলি তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। যোগসূত্রের কৈবল্যপদে পাই—জান্মৌষধি-মন্ত্র-তপঃ সমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ। এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া মহামুনি ব্যাস ও বাচস্পতি বলিয়াছেন, ঔষধি দ্বারা সিদ্ধি বলিতে ভগবান পতঞ্জলি সেই যোগীদের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন—রসায়নের প্রয়োগ দ্বারা যাঁহারা হইতেন আপ্তকাম। ঔষধি

[১] গোরখনাথী কান্‌ফাটাদের মধ্যে কয়েকটি দল তৃতীয় ও চতুর্থ শতক হইতে বামাচারের সাধনা গ্রহণ করিয়াছে। বাংলা ও হিমালয় অঞ্চলেই ইহাদের প্রভাব পূর্ব্বে বেশী ছিল। ইহাদের পঞ্চ-মকার সাধনে আছে—মদ্য, মাংস, মৎস, মুদ্রা, মৈথুন—মদ্যং মাংসঞ্চ মুদ্রামৈথুনমেব মকার পঞ্চকঞ্চৈবচ মহাপাতকনাশনম্—যোগ, তন্ত্র ও বৌদ্ধবাদের মিশ্রণ ঘটিয়াছিল পরবর্ত্তীকালে—ব্রীগস্‌ঃ পৃঃ ১৭২

সম্পর্কে এই উল্লেখ হইতে বুঝা যায়—সিদ্ধমার্গ ও তাহার শাখা নাথমার্গ পতঞ্জলির আগেও প্রচলিত ছিল।

কায়াসাধন ও রসায়ন প্রয়োগের পথ অবলম্বন করিলেও নাথযোগীরা, বিশেষত গোরখনাথী কান্‌ফাটারা, প্রধানত শৈববাদ ও রাজযোগের ধারা ধরিয়াই অগ্রসর হইয়াছিলেন। নাথধর্মের মূল প্রবক্তা হইতেছেন শিব, এবং এই সম্প্রদায়ের সর্ব্বাপেক্ষা খ্যাতনামা ও শক্তিধর যোগী গোরখনাথকে সাধকেরা বহু সময়ে শিবাবতার বলিয়াই স্তব স্তুতি করিয়াছেন, আরাধনা করিয়াছেন। এই ধর্ম্মের অনুগামীদের ইষ্টবিগ্রহ শিব। কান্‌ফাটা সাধক, সন্ন্যাসী ও যোগীরা যে সব পবিত্র স্থানে তীর্থধর্ম্ম করিতে যায়, সেগুলিতে শৈবদেরই প্রাধান্য এবং মন্দিরগুলিতেও বিরাজমান রহিয়াছে শিবমূর্ত্তি বা লিঙ্গ। বেশভূষার দিক দিয়াও নাথযোগীরা যোগীশ্বর শিবকেই সদা অনুকরণ করেন। শিবের প্রিয় সিদ্ধি ও গঞ্জিকা সেবনে এবং শিবের গালবাদ্য বম্‌-বম্‌ শব্দ উচ্চারণেও দেখা যায় তাঁহাদের পরম উল্লাস।

শুধু নাথপন্থী সাধকদের মধ্যেই নয়, ভারতের নানা শ্রেণীর শৈব উপাসকদের মধ্যেও যোগীবর গোরখনাথের প্রভাব ছিল অপরিসীম। বুদ্ধের পরবর্ত্তী যুগে একমাত্র আচার্য্য শঙ্কর ছাড়া আর কোন ধর্ম্মনেতা তাঁহার মত এদেশের ধর্ম্ম ও সমাজ জীবনে এমন দূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই।

শঙ্করের চমকপ্রদ ব্যক্তিত্বে, প্রজ্ঞা ও দার্শনিক তত্ত্বের আলোকে সারা ভারতের সারস্বত জীবন উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। উপনিষদ, বেদান্ত ও গীতার যে জ্ঞানমার্গী ভাষ্য তিনি প্রচার করেন এদেশের ধর্ম্মজীবনকে তাহা নূতন প্রাণশক্তিতে উজ্জীবিত করিয়া তোলে।

সে তুলনায় গোরখনাথের অবদানও কম নয়। আমাদের দেশের ধর্ম্মজীবনে প্রবল প্রাণ-স্পন্দন তিনি আনয়ন করেন, আর এই মহান ঐশ কর্ম্ম সম্পন্ন করেন সিদ্ধ শৈবযোগীদের নিগূঢ় সাধনতত্ত্ব প্রচারের মধ্য দিয়া। উপনিষদ, গীতা ও বেদান্তের প্রামাণিকতা তিনি খুবই মানিতেন,

যথাযোগ্য শ্রদ্ধাও দিতেন, কিন্তু অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিতেন যোগক্রিয়া ও যোগ সিদ্ধির উপর।

শঙ্কর ছিলেন ঈশ্বরদত্ত অতুলনীয় দার্শনিক প্রতিভার অধিকারী, তাঁহার প্রভাব প্রধানত বিস্তারিত হইত আচার্য্য ও চিন্তানায়কদের মাধ্যমে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত চারি মঠের সন্ন্যাসীবর্গ ও তাঁহাদের শিষ্য প্রশিষ্যেরা জনজীবনকে নবপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন। আর গোরখ-নাথের কর্ম্ম-প্রণালী ছিল অন্যরূপ। তিনি এবং তাঁহার উত্তর সাধকেরা চলিয়াছিলেন যোগ ও তন্ত্রের নিগূঢ় সাধনার পথ বাহিয়া—অত্যাশ্চর্য্য ও অলৌকিক সিদ্ধির পথ ধরিয়া।

গোরখনাথের কালনির্ণয় সম্পর্কে বিশিষ্ট গবেষকদের মধ্যে নানা মত রহিয়াছে। পাঞ্জাব তাঁহার পুণ্যময় লীলার এক প্রধান স্থান। সেখানকার জনশ্রুতি ও গল্পগাথায়ও তাঁহার কৃপাধন্য শিষ্য গূগা, পূরণভগৎ, রনঝা, রসালুর নানা মনোহর কাহিনী ছড়ানো রহিয়াছে। এই সব শিষ্যদের ঐতিহাসিক কাল অষ্টম হইতে একাদশ শতক। তাই গোরখনাথকে কোন মতেই তাহাদের পরবর্ত্তী কালের লোক বলিয়া ধরা যায় না।

গোপীচাঁদ, ভর্ত্তৃহরি, ভোজ, রাণী-পিঙ্গলা প্রভৃতি সম্পর্কিত কাহিনীর কাল বিচার করিলে যোগীবর গোরখনাথের আবির্ভাব সময় ধরিতে হয় একাদশ শতকের আগে।

কবীর ও শিখ ধর্ম্মগুরু নানকের লেখায় তাঁহার নানা উল্লেখ মিলে। "গোরখনাথ কী গোষ্ঠী"তে গোরখনাথের সহিত কবীর ও নানকের সংলাপ দেওয়া আছে। উইলসন প্রভৃতি পণ্ডিত এই সংলাপের উপর ভিত্তি করিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন,—গোরখনাথ, কবীর ও নানক প্রায় সমসাময়িক। কিন্তু "গোরখ্‌নাথ্‌ কি গোষ্ঠী"-র ঐ সংলাপগুলি যে সত্য নয় এবং পরবর্ত্তীকালের ভক্তদের কল্পনাপ্রসূত তাহা কবীর ও নানকের দোঁহা এবং সমকালীন সাহিত্যের তথ্য হইতে সুপ্রমাণিত হইয়াছে।

বাস্তবিক পক্ষে গোরখনাথ আবির্ভূত হন কবীর ও নানকের কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে।

রাজপুতনার লোকগাথায় গোরখনাথ ও বাপ্পারাও-এর কাহিনী প্রচলিত আছে। মহাযোগীর কৃপায় বাপ্পা একটি দুধারী তলোয়ার প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার আশীর্ব্বাদে তিনি মেবারের সিংহাসন অধিকার করেন। বাপ্পারাও-এর রাজত্ব শুরু হয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে। রাজস্থানের এই ঐতিহাসিক তথ্য মানিয়া নিলে গোরখনাথের কাল আসিয়া দাঁড়ায় অষ্টম শতাব্দীতে।

বাংলার সাহিত্য, লোকগাথা ও কিম্বদন্তী হইতে গোরখনাথ ও তাঁহার সম্প্রদায় সম্পর্কে বহু মূল্যবান মালমশলার সন্ধান মিলে। প্রধানত পাল রাজাদের আমলেই যোগী সাধকদের প্রভাব বৃদ্ধি পায় এবং এই পাল রাজত্বের অবসান ঘটে ১০৯৫ সালে। উত্তরবঙ্গের কান্‌ফাটা যোগীরা মানিকচাঁদের গান গাহিয়া বেড়াইত এবং ইহারা সবাই শৈব। শিবকল্প যোগী গোরখনাথকেই তাহারা গুরুস্থানে পূজা করিত।

ধর্ম্মমঙ্গল-এ মীননাথ, গোরখনাথ, হাড়িপা, কানুপা প্রভৃতি সিদ্ধ সাধকদের বহুতর উল্লেখ দেখিয়া মনে হয়, নাথযোগীদের সাধনতত্ত্ব ও অলৌকিক সিদ্ধাইর নানা বিচিত্র কাহিনী সমকালীন বাংলার জনজীবনের সর্ব্বস্তরে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।[১]

নেপালের ঐতিহ্যবাহী গল্প গাথা প্রভৃতি হইতে দেখা যায়, গোরখগুরু মৎস্যেন্দ্রনাথের আবির্ভাব ও যোগসাধনার বিস্তারের কাহিনী সে দেশে অষ্টম শতকের শেষপাদ হইতে প্রচলিত। এই তথ্য মানিয়া নিলে গোরখনাথের কালকে ইহা হইতে বেশী পিছাইয়া দেওয়া যায় না।

'বংশাবলী পার্বতীয়া'তে উল্লেখ আছে, মৎস্যেন্দ্র নেপালে গোরখ-নাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন রাজা বরদেবের সময়ে। বরদেব জীবিত ছিলেন অষ্টম শতকের মধ্যভাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এবং তাঁহার

---

[১] ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন: হিষ্টোরী অব্‌ বেংগলি ল্যাংগুয়েজ এণ্ড লিটারেচার—পৃঃ ২৮-২৯।

রাজবংশের যেসব মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে সেগুলির কাল নির্ণিত হইয়াছে ৬৩৫ হইতে ৭৫১ সালের মধ্যে।[১] অনেকের ধারণা, বরদেবের বৃদ্ধ পিতা নরেন্দ্রদেবের সময়েই গোরখনাথ নেপালে আগমন করেন। ইহা অষ্টম শতাব্দীর মধ্যকাল।[২]

ভাস্কর্য্য ও শিলামূর্ত্তির কতকগুলি প্রমাণ আছে যাহা গোরখনাথী যোগী সম্প্রদায়ের কাল নির্ণয় করিতে যথেষ্ট সাহায্য ক'রে। সাধারণভাবে একথা স্বীকৃত যে, যোগীদের কর্ণবেধ-এর প্রথা মৎস্যেন্দ্র এবং গোরখ-নাথের দ্বারাই প্রবর্ত্তিত হয়। এলোরার গুহা মন্দিরে কৈলাসে শিবের একটি যোগসমাহিত মহিমময় মূর্ত্তি আছে এবং এই মূর্ত্তির কাণে রহিয়াছে ছুইটি বৃহৎ কুণ্ডল। অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগে এই মন্দিরটি স্থাপিত হয়। সালসেট দ্বীপেও অনুরূপ কর্ণকুণ্ডলযুক্ত একটি যোগেশ্বর শিবমূর্ত্তি বিরাজিত রহিয়াছে। সেখানকার মন্দির ও এলোরার মন্দির সমসাময়িক। উত্তর আর্কটের পরশুরামেশ্বর মন্দির খুব প্রসিদ্ধ, এখানকার লিঙ্গগাত্রে খোদাইকরা একটি যোগীমূর্ত্তি বর্ত্তমান। ইহার কাণেও কুণ্ডল পরানো রহিয়াছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এই পবিত্র লিঙ্গ দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতকের পরবর্ত্তী নয়। এই সব পাথুরে প্রমাণের পর কানফাটা যোগী সম্প্রদায়ের প্রাচীনত্ব অস্বীকার করা যায় না।

সুপণ্ডিত ব্রিগস্ স্থির করিয়াছেন, যোগী গোরখনাথের জন্মকাল দ্বাদশ শতকের পরবর্ত্তী কোনমতেই নয় বরং একাদশ শতকের প্রথমভাগেই তিনি আবির্ভূত হন।[৩] হিন্দি এবং পাঞ্জাবী সাহিত্য ও জনশ্রুতির নানা তথ্য আলোচনা করিয়া ডক্টর মোহন সিং নির্ণয় করিয়াছেন, গোরখনাথ

---

[১] রাইট : হিষ্টোরী অব্ নেপাল—পৃঃ ৩১৩। [২] লেভি : ল্য নেপাল্ ভল্যু ১, পৃঃ ৩৪৭।

[৩] Until further dates are discovered, conclusion must be that Gorakhnath lived not later than A. D. 1200, prabably early in the eleventh century, and that he came originally from Eastern Bengal—Briggs : Gorakhnath and Kanfatta Yogis—p 250

নবম অথবা দশক শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট গবেষক ডক্টর দীনেশ সেন এ সম্পর্কে যে তথ্যাদি উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাও প্রমাণিত ক'রে—গোরখনাথ দশম শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। উত্তর ও পূর্ব্ব ভারতের পল্লী সাহিত্য, ঐতিহ্য, ইতিহাস ও ধর্ম্মান্দোলনের তথ্যের বিচার করিলে এই মতই আমাদের সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

শিবকল্প মহাযোগী গোরখনাথের কৃপালীলা বিস্তারিত হইয়াছে সারা উত্তর ও পশ্চিম ভারতের দিকে দিকে। আর এই কৃপার ধারা বর্ষিত হইয়াছে রাজা প্রজা, ব্রাহ্মণ অন্ত্যজ সকলের উপর সমভাবে।

পূর্ব্ব বাংলা বা বঙ্গালের রাণী সিদ্ধযোগিনী ময়নামতী ছিলেন তাঁহার অন্যতম প্রিয় শিষ্যা। এই ময়নামতী ও তাঁহার সাধক পুত্র গোপীচাঁদের কাহিনী বাংলা তথা ভারতের অধ্যাত্ম-সাহিত্যের এক অক্ষয় সম্পদ হইয়া রহিয়াছে।

বিক্রমপুর হইতে ত্রিপুরা অবধি বিস্তারিত ছিল গোপীচাঁদের রাজ্য-সীমা, আর সমগ্র উত্তরবঙ্গের বিশাল ভূখণ্ডের উপর ছিল তাঁহার কর্ত্তৃত্ব। রূপসী নবযৌবনা দুই পত্নী ও রাজ-ঐশ্বর্য্য নিয়া তরুণ গোপীচাঁদ যখন চরম ভোগবিলাসের জীবন যাপন করিতেছেন, সেই সময়ে যোগসিদ্ধা মাতা তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করেন সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য। রাজা গোপীচাঁদের সিংহাসন ত্যাগ ও সন্ন্যাসের করুণ কাহিনী বাংলাদেশের পল্লীকবিদের কাব্যগাথায় উজ্জ্বল ও প্রাণস্পর্শী হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, আর এই কাহিনী সারা ভারতের দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে নানা ভাষার বিচিত্র লোকগাথা, কাব্য ও নাটকের মধ্য দিয়া।[১] বিশেষ করিয়া উত্তর ভারতের যোগী-গায়ক বা সারঙ্গীহারদের গানের করুণ সংবেদন আজো জনচিত্তকে আকুল করিয়া তোলে। গল্পরসের গাঢ়তায় ও মর্ম্মস্পর্শী আবেদনে এই কাহিনী অতুলনীয়। শত শত বৎসর ধরিয়া বঙ্গাল

১ এ প্রসঙ্গে হিন্দি গোপীচাঁদকা পুঁথি, মারাঠী কবি মহিপতির সন্ত-লীলামৃত ও আপ্পাজী গোবিন্দের গোপীচাঁদ নাটক, উড়িয়া ভাষার গোবিন্দচন্দ্র গীতি প্রভৃতি উল্লেখনীয়।

রাজের এই সন্ন্যাস-কথা লক্ষ লক্ষ গ্রামীন নরনারীর চোখে ঝরাইতেছে অশ্রুধারা।

ময়নামতীর গান-এর ভূমিকায় ডক্টর ভট্টশালী লিখিয়াছেন, "গোবিন্দ-চন্দ্রের (গোপীচাঁদ) মত একটি ভাগ্যবান যুবকের নবীন যৌবনে অষ্টাদশ বৎসর বয়সে সমস্ত রাজ্য-ধন-সুখসম্পদ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া যাওয়ায় যত করুণ ঘটনা জগতে বড় বেশী ঘটে নাই--ভারতবর্ষে গোপী-চাঁদের পূর্ব্বে এবং পরে মাত্র একবার ঘটিয়াছিল।" বলা বাহুল্য, লেখক এখানে ত্যাগব্রতী মহাসাধকদ্বয়—বুদ্ধ ও চৈতন্যের—কথাই বলিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু ময়না-গোপীচাঁদ কাহিনীর বড় বৈশিষ্ট্য—এখানে পুত্রকে সিংহাসন ত্যাগ ও সন্ন্যাসের দিকে ঠেলিয়া দিয়াছেন তাহার জননী স্বয়ং।

ময়নামতী ছিলেন ত্রিপুরার রাজা তিলকচন্দ্রের কন্যা। একবার পূর্ব্বভারতে পরিব্রাজন করার সময় গোরখনাথ ত্রিপুরায় আসিয়া উপস্থিত হন। রাজা আগে হইতেই তাঁহার যোগবিভূতির খ্যাতি শুনিয়াছেন ; ভক্তিভরে ও পরম সমাদরে তাঁহাকে প্রাসাদে আনয়ন করিলেন।

কিশোরী রাজকন্যা শিশুমতী আসিয়া প্রণাম করিতেই মহাযোগী চমকিয়া উঠিলেন। এ মেয়ে তো সামান্যা মানবী নয়! অধ্যাত্মসাধনার এ যে এক অতি শুদ্ধ আধার। সিদ্ধা যোগিনীর লক্ষণ রহিয়াছে তাহার সারা দেহে। গোরখনাথের কৃপাঘন দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হইল—কহিলেন, কিশোরী শিশুমতীকে দিবেন তিনি দীক্ষা ও যোগসাধন।

রাজা তিলকচাঁদ ও তাঁহার পরিজনেরা তো অবাক। রাজা সবিনয়ে নিবেদন, করেন, "প্রভু, আমার শিশুমতী যে নিতান্তই শিশু। এ বয়সে সাধনার কৃচ্ছ্র সে কি করে সহ্য করবে? যোগক্রিয়ার নিগূঢ় রহস্যই বা সে কি করে বুঝবে?"

গোরখনাথ দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন, "মহারাজ, আপনি শিশুমতীর পিতা হতে পারেন। কিন্তু তার সম্বন্ধে আপনার তো কিছু জানা নেই—

জানবার মত দৃষ্টিও আপনার নেই। পূর্ব্ব জন্মে সে কি ছিল, কোন্ উচ্চতর সাধন-অবস্থা পেয়েছিলো, তা কি আপনি বলতে পারেন ?"

"আজ্ঞে না, আমরা সংসারী জীব, আমাদের দৃষ্টি ততদূর পৌঁছুবে কি করে ?"

"শিশুমতীর অন্তর্জ্জীবনের খবর,—এখনকার এবং দূর ভবিষ্যতের, জান্‌বার শক্তিই কি আপনার আছে ?"

"না প্রভু"

"মহারাজ, আমি তার সবটা জানি। পূর্ব্বজন্মের অসামান্য সাধন-সংস্কার নিয়ে সে জন্মেছে। অপেক্ষা শুধু চিহ্নিত সদ্‌গুরুর স্পর্শ—দীক্ষা ও যোগক্রিয়ার অনুশীলন।"—স্মিতহাস্যে কহেন মহাযোগী গোরখনাথ।

শুভলগ্নে কিশোরী শিশুমতীর দীক্ষা সুসম্পন্ন হয়। গোরখনাথ তাহার নূতন নামকরণ করেন—ময়নামতী। অল্পকালের মধ্যে, অবিশ্বাস্য দ্রুততার সহিত, ময়নামতী গুরুর প্রদর্শিত যোগসাধনায় পারদর্শিনী হইয়া উঠেন। ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট ঐ কর্ম্ম সমাপনের পর যোগীবর গোরখনাথ তিলকচন্দ্রের প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া যান।

গোরখের কৃপায় অল্পকালের ব্যবধানেই ময়নামতীর যোগসিদ্ধ জীবনের অধ্যায়গুলি একের পর এক উন্মোচিত হইতে থাকে, নাথযোগীদের পরম আকাঙ্ক্ষিত মহাজ্ঞান লাভ করিয়া তিনি ধন্যা হন।

কয়েক বৎসর পরে সাধিকা ময়নামতীকে আমরা দেখি বঙ্গাল-রাজ মানিকচন্দ্রের মহিষীরূপে। এই মানিকচন্দ্রেরই পুত্র—রাজ-সন্ন্যাসী গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচাঁদ।

গোরখের কৃপাধন্য এই রাজবংশের পরিচয় দিতে গিয়া ডক্টর দীনেশ সেন লিখিয়াছেন, "ইঁহার (গোপীচাঁদের) পিতামহের নাম সুবর্ণচন্দ্র। আমরা বঙ্গীয় রাজা সুবর্ণচন্দ্রের নাম তাম্রশাসনে পাইয়াছি। তাম্রশাসনে আবার ত্রৈলোক্যচন্দ্রের নামও পাওয়া যায়। এই দুই নামই আমরা গোপীচন্দ্রের গানের কোন কোনটিতে পাইতেছি। আর শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসনে উল্লেখিত অল্পসংখ্যক নামের মধ্যে যখন দুইটির নামে

গোপীচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষদের নামের সঙ্গে ঐক্য হইতেছে, তখন মাণিকচন্দ্র তথা গোপীচন্দ্রকে[১] আমরা শ্রীচন্দ্রদেবের বংশীয় বলিয়া অনুমান করি। নবদ্বীপের সুবর্ণবিহার সম্ভবতঃ ইঁহারই প্রতিষ্ঠিত। ঐ বিহারের নিকট সুবর্ণচন্দ্রের রাজপ্রাসাদের কিঞ্চিৎ অবশেষ এখনও বিদ্যমান; এবং তথাকার শিলালিপিতে যে তারিখ পাওয়া গিয়াছে, তাহা তাম্রশাসনের তারিখ সমর্থন করিতেছে।"

ইঁহাদের রাজ্যের বিস্তার সম্পর্কে তিনি বলিতেছেন, "মাণিকচন্দ্র বিবাহসূত্রে মেহেরকুলের (ত্রিপুরা রাজ্যের) উত্তরাধিকার লাভ করেন এবং পিতৃরাজ্যে বিক্রমপুর প্রাপ্ত হইয়া উভয় রাজ্যের উপর আধিপত্য স্থাপন করেন। তাঁহার রাজধানী পটিকা এখনও বিদ্যমান। ত্রিপুরার পার্শ্বে যে বিস্তৃত শৈলমালা দৃষ্ট হয়, তাহা ময়নামতী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সুতরাং তিলকচন্দ্রের কন্যার নামের ইহা চিরস্থায়ী নিদর্শন স্বরূপ হইয়া আছে। গোবিন্দচন্দ্র এই বিশাল ভূখণ্ড ব্যতীত গৌড়ের সমীপবর্ত্তী উত্তরবঙ্গের অনেকাংশ ইজারা লইয়াছিলেন, এজন্য রঙ্গপুর প্রভৃতি অঞ্চলেও তাঁহার কীর্ত্তিকথা জাগরূক।"

বিবাহিত জীবনে ময়নামতী চাহিয়াছিলেন—স্বামী তাঁহারই মত মহাযোগী গোরখনাথের প্রদত্ত সাধন গ্রহণ করুক, আর তাঁহারই মত যোগসিদ্ধি লাভ করুক। কিন্তু গোরখনাথ উত্তর ভারতে অবস্থান করেন, অনেকদিন তাঁহার দেখা নাই। তাই ময়নামতী একদিন প্রস্তাব দিলেন, "ওগো, ভাগ্যগুণে গুরুর কৃপা আমি যথেষ্টই পেয়েছি। যোগক্রিয়ার প্রণালী আমি নিজেই তোমায় দেখিয়ে দিতে পারি। এই সাধন নিয়ে সিদ্ধ হলে তুমি রোগ ও জরা বার্দ্ধক্যকে এড়াতে পারবে। তাছাড়া, ইচ্ছেমত মৃত্যুকে দূরে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে। যোগবলে আমি জানতে

[১] গোপীচন্দ্রের রাজত্বকাল সম্পর্কে ঐতিহাসিক প্রমাণ বর্ত্তমান—"মাণিকচন্দ্রের পুত্র গোবিন্দচন্দ্রকে দাক্ষিণাত্যের রাজা রাজেন্দ্র চোল পরাভূত করেন, তাঁহার জয়গাথা তিরুমালয়ের শিলালিপিতে উৎকীর্ণ আছে। রাজেন্দ্র চোল ১০৬৩ খৃঃ হইতে ১১১২ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন"—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য: ডাঃ দীনেশ সেন।

পেরেছি, তোমার আয়ু খুবই কম। প্রভু গোরখনাথের সাধন নিলে, তাঁর কৃপায় তোমার ভাল হতো। আমার কাছ থেকে বরং দু-একটা প্রক্রিয়া শিখে নাও।"

"কি বললে? এমনি দুর্ভাগ্য আমার, শেষটায় স্ত্রীর কাছ থেকে নিতে হবে যোগ সাধনার নির্দ্দেশ? সে-ই হবে আমার গুরু? এ ধরণের কথা কখনো তুমি মুখেও এনো না।"—এমনিভাবে ময়নামতীর কথা উড়াইয়া দেন মাণিকচন্দ্র।

গোরখনাথের প্রচারিত যোগসাধনার পথ কোনদিনই তিনি আর গ্রহণ করেন নাই। অবশেষে ময়নামতী যে ভয় করিতেছিলেন, তাহাই সত্য হইয়া দাঁড়ায়। রাজা মাণিকচন্দ্র অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। স্বামীর মৃত্যুর সময় ময়নামতীর গর্ভে এক পুত্র সন্তান ছিল, এই পুত্রই ভারতবিশ্রুত রাজ-সন্ন্যাসী গোপীচাঁদ বা গোবিন্দচন্দ্র।

ময়নামতীর জীবনে এ সময়ে নামিয়া আসিয়াছে মহা সঙ্কট। স্বামীর লোকান্তরের পর নিজে তিনি শোকাতুরা। একদিকে এই বিস্তীর্ণ রাজ্য অরক্ষিত, নেতৃত্বহীন—অপরদিকে রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে, তাঁহার সপত্নীরা ছড়াইয়া বসিয়াছে কুটিল ষড়যন্ত্রজাল। এই দুঃসময়ে সেদিন রাজধানী পটিকায় যোগীগুরু গোরখনাথের আবির্ভাব ঘটে।

শিষ্যাকে অভয় দিয়া গুরু বলেন, "ময়না, এই সঙ্কটকালে শক্ত হাতে তোমায় আঁকড়ে ধরতে হবে রাজ্যতরীর হাল। তোমার কোলে যে সন্তান আসছে তাকে মানুষ করার দায়িত্ব নিতে হবে তোমাকেই। সিদ্ধযোগীর পুর্ব্ব সংস্কার নিয়ে তোমার এ সন্তান জন্ম নিচ্ছে, তাকে তোমায় এগিয়ে দিতে হবে পূর্ণ পরিণতির পথে। স্বামীকে সাধন পথে আনতে পারোনি, এই পুত্রের ভেতর দিয়ে তোমার সে আশা পূর্ণ হবে। উত্তরকালে সে কীর্ত্তিত হবে এক বিশিষ্ট নাথসিদ্ধ রূপে।"

ময়নার নয়ন দুইটি প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। বলেন, "প্রভু আপনার কথা শুনে, এত বিপদের ভেতরও যেন আশার আলো দেখতে পেলাম।

কিন্তু এই বৃহৎ রাজ্যের পরিচালনার ভার কে নেবে? আমার পক্ষে তো এ গুরু দায়িত্ব বহন করা সম্ভব নয়।"

"বৎসে, তোমাকেই একাজে এগিয়ে আসতে হবে। পুত্র সাবালক না হওয়া অবধি তুমিই চালাবে সমস্ত রাজকার্য্য। আর জেনে রেখো, যে কোন সঙ্কটে তুমি সাহায্য ও পরামর্শ পাবে আমার প্রিয় শিষ্য জালন্ধরীপাদের কাছ থেকে। নীচজাতি হয়েও যোগসিদ্ধির জন্য এ রাজ্যের সাধারণ মানুষের বিপুল শ্রদ্ধা সে অর্জ্জন করেছে। প্রভাব প্রতিপত্তিও এখানে তার যথেষ্ট। তার পরামর্শ নিয়ে কাজ ক'রলে তোমার গুরুভার বরং লঘুই হবে।"

"আর, পুত্র মানুষ করার দায়িত্ব?"

"হ্যাঁ, তাও তোমারই। ময়না, এ সম্পর্কে আরো একটা কথা তোমায় আমি বলে রাখি। তোমার এই পুত্র আঠারো বৎসর পর্য্যন্ত লালিত হবে ভোগসুখের মধ্য দিয়ে। কিন্তু তারপর আর তার আয়ু আমি দেখছিনে। তবে দেবাদিদেবের কৃপায় দীর্ঘদিন সে বাঁচতে পারবে যদি আঠারো বৎসর বয়সেই নাথযোগের দীক্ষা ও সাধন নিয়ে সে গ্রহণ ক'রে সন্ন্যাস।"

"প্রভু, এ কথা অবশ্যই আমার স্মরণ থাকবে।"

"হ্যাঁ, আরো একটা কথা স্মরণ রেখো, তোমার গুরুভ্রাতা জালন্ধরীপাদই সে সময়ে তোমার পুত্রকে দেবে দীক্ষা ও সন্ন্যাস।"—এ কথা বলার পরই গোরখনাথ সে স্থান ত্যাগ করেন ও পশ্চিম ভারতে পরিব্রাজন করিতে চলিয়া যান।

গুরুর এ নির্দ্দেশ ময়নামতী নিষ্ঠাভরে পালন করেন। পতির রাজ্য পরিচালনা করার সঙ্গে সঙ্গে আপ্রাণ চেষ্টায় শিশু পুত্রটিকেও তিনি মানুষ করিয়া তোলেন।

গোপীচাঁদ যৌবনে পদার্পণ করার পর রাজ্যভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়। সাভারের রাজা হরিশচন্দ্রের দুই রূপসী গুণবতী কন্যা—অদুনা ও পদুনাকে বিবাহ করিয়া তিনি গৃহে আনয়ন করেন। রাজবৈভব, বিলাস

ব্যসন ও নব পরিণীতা পত্নীদের মধ্যে পরমানন্দে তাঁহার দিন কাটিয়া যাইতে থাকে।

সেদিন গোপীচাঁদের আঠারো বৎসর পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। জননী ময়নামতী আগে হইতেই সতর্ক হইয়া আছেন। পুত্রকে নিভৃতে তিনি কাছে ডাকাইলেন। প্রশান্তকণ্ঠে কহিলেন, "বৎস, এতদিন সাধ্যমত তোমায় মানুষ করতে চেষ্টা করেছি, এবং সে চেষ্টা অনেকটা ফলবতীও হয়েছে আমার গুরু গোরখনাথজীর কৃপায়। এবার তোমার সম্বন্ধে গোরখ-প্রভুর একটা ভবিষ্যদ্‌বাণীর কথা আমি বলবো।"

"মা, আমায় খুলে ব'ল, যোগীবর কি বলেছেন আমার সম্পর্কে"— কৌতুহলভরা কণ্ঠে প্রশ্ন করেন গোপীচাঁদ।

"গোরখনাথজী বলেছেন, আঠারো বৎসর পূর্ণ হবার পরই তোমায় সংসার ধর্ম্ম ছাড়তে হবে, নিতে হবে সন্ন্যাস। দীক্ষা ও সাধন নিতে হবে যোগী জালন্ধরীপাদের কাছ থেকে, হতে হবে যোগসিদ্ধ। প্রভু আরো বলেছেন, এই নির্দেশ পালিত না হলে অতি অল্প সময়ের ভেতর হবে তোমার জীবনান্ত। বৎস, আমার একান্ত অনুরোধ, তুমি সন্ন্যাস নাও, দীর্ঘায়ু্ লাভ ক'র, আর সেইসঙ্গে প্রাপ্ত হও যোগসিদ্ধি।"

বড় আকস্মিক, বড় মর্ম্মান্তিক মায়ের এই কথা কয়টি। নিতান্ত নবীন বয়স গোপীচাঁদের। দাম্পত্য-জীবনের ভোগসুখ সবেমাত্র শুরু হইয়াছে। এখনই তাহাতে মর্ম্মান্তিক ছেদ টানিয়া দিতে হইবে?

গোপীচাঁদ যতই এড়াইতে চান, জননী ততই তাঁহাকে চাপিয়া ধরেন বারবার প্ররোচিত করিতে থাকেন সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য। সকাতরে বলেন, "বাবা, নাথযোগ অবলম্বন ক'রে কায়াসাধন ক'র, মৃত্যুকে তুমি দূরে রাখতে পারবে। ছ্যাখো, প্রভু গোরখনাথের বরে সেই দুর্লভ সিদ্ধি আমি লাভ করেছি, পেয়েছি স্বেচ্ছামৃত্যুর অধিকার।"[১]

ভয় ও বিষাদে আচ্ছন্ন হয় গোপীচাঁদের হৃদয়। মহাশক্তিধর যোগী

[১] গোবিন্দচন্দ্র গীত : শীল সম্পাদনা—পৃঃ ১০-১১

গোরখনাথের অলৌকিক শক্তি বিভূতির কথা ছোটবেলা হইতেই তিনি শুনিয়া আসিতেছেন। তাঁহার ভবিষ্যদ্‌বাণী তো মিথ্যা হইবার নয়। এদিকে গোপীচাঁদ নিজে এই তরুণ বয়সে আকণ্ঠ ডুবিয়া আছেন ভোগসুখে। কি করিয়া এ সব দিবেন বিসর্জ্জন? অবশেষে পত্নীদের কাছে গিয়া ছলছল নেত্রে এই সঙ্কটের কথা খুলিয়া বলিলেন।

শুনিয়া অদুনা ও পদুনার তো চক্ষুস্থির! এই কচি বয়সে স্বামীকে স্বজন সংসার ছাড়িয়া বনে যাইতে হইবে? কোন্ প্রাণে ইহা তাঁহারা সহ্য করিবেন। দুইজনেই রুষিয়া উঠিলেন শ্বাশুরীর উপর। কবে কোন্ সাধু কি কথা বলিয়া গিয়াছে, তাহা সত্য না মিথ্যা—যাচাই করার উপায় নাই। ময়নামতী তাহা নিয়া অনর্থক এক গোল বাধাইয়া বসিয়াছেন। গোপীচাঁদ কেন অনর্থক রাজ্য ছাড়িবেন? কেনই বা সংসারের সমস্ত কিছু ভোগসুখে দিবেন জলাঞ্জলি? তরুণী পত্নীদের জীবন কেন হইবে চিরতরে ব্যর্থ? এসব কথা কে ভাবিয়া দেখিয়াছে?

পাটরাণী অদুনা গোপীচাঁদকে কহিলেন, "ছ্যাখো, তোমার মা তো পুত্রের সন্ন্যাসের আদেশ অনায়াসে দিয়ে দিলেন। এদিকে আমাদের অসহায় অবস্থার কথাটা একবার ভেবেছেন কি? তাঁর আর কি, স্বামী বেঁচে থাকবার সময় ছিলেন রাণী, তারপর রাজমাতা হয়েও অবাধে বহুদিন করে গেছেন রাজ্যশাসন।"

"তা এখন আমার আমলে তো তিনি আর রাজত্ব করছেন না।"

"বলিহারি তোমার বুদ্ধি। সোজা কথাটা বুঝছো না? তুমি সন্ন্যাস নেবার পর তাঁর সে রাজত্ব যে আরো পাকা হবে। আর সব চাইতে বড় লাভ হবে হাড়ি-সিদ্ধা জালন্ধরীপাদের। তার কাণকথা শুনেই তো রাজমাতা ওঠেন বসেন। দুজনে এক গুরুর শিষ্য হলেনই বা, তা এতো ঘনিষ্ঠতা কেনরে বাপু। রাজ্যের লোকেরা কাণা-ঘুষা করছে—ডোম বংশের এ হাড়ি-সিদ্ধাকে নিয়ে ময়নামতী বড় বেশী ঢলাঢলি করছেন। আর তুমিই বল না, সেই অন্ত্যজ হাড়ি-সিদ্ধা দেবে তোমায় দীক্ষা—তোমার মায়ের এ বিধানটা একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না?"

এমনিতেই গোপীচাঁদ ক্ষুব্ধ ও চঞ্চল হইয়া আছেন। মহিষীর কথা শুনিয়া এবার উত্তেজিত হইয়া ওঠেন, এইসব কথাই তিনি উদ্‌গীরণ করেন গিয়া মায়ের কাছে।

সক্রোধে বলিয়া ওঠেন, "জালন্ধরীপাদের কাছ থেকে আমায় তুমি দীক্ষা ও সাধন নিতে বলছো। জালন্ধরী হচ্ছে হাড়ি জাতীয়—তাঁর থেকে দীক্ষা ও সিদ্ধি না পেলে আমার প্রাণ বাঁচবে না—এ কথা আমি মোটেই বিশ্বাস করিনে।"

"ওরে, এ সব ছাইপাশ তুই কি বলছিস্, বাবা?" ক্ষুব্ধ স্বরে বলেন ময়নামতী।

মায়ের কথায় কান না দিয়া গোপীচাঁদ এক নিঃশ্বাসে বলিয়া চলেন, "হ্যাঁ মা, আরো শোন আমি যা বলছি। এই হাড়ি-সিদ্ধার সাথে তোমার কি যেন এক রহস্যময় সম্পর্ক রয়েছে, তা আমি পছন্দ করিনে। রাজ্যের জনসাধারণ এ নিয়ে তোমায় সন্দেহ করে। এ সব আমি আর সহ্য করতে রাজী নই।"

পুত্রের একথা শুনিয়া ময়নামতীর দুই চোখ রোষে জ্বলিয়া উঠিল। বুঝিলেন, বিবেকবুদ্ধি সে একেবারে হারাইয়া ফেলিয়াছে। তাছাড়া, তরুণী পত্নীদের প্ররোচনায় সে আজ মহা উত্তেজিত। তাই এমন ন্যক্কারজনক উক্তি করার দুঃসাহস তাহার!

সেই মুহূর্ত্তে কিন্তু সেখানে ঘটিতে দেখা যায় এক অলৌকিক কাণ্ড। সারা কক্ষে ছড়াইয়া পড়ে স্নিগ্ধশুভ্র স্বর্গীয় আলোকধারা, আর তাহারই মধ্য হইতে আকারিত হইয়া উঠে মহাযোগী গোরখনাথের সিদ্ধ দেহ।

জটাজুটসমন্বিত এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তির দিকে তাকাইয়া ময়নামতী পুত্রকে কহেন, "বৎস, প্রভু-গোরখনাথ কৃপা ক'রে আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত। তাঁকে প্রণাম কর।"

মাতা পুত্র উভয়েই ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম নিবেদন করিলেন। গোপীচাঁদের দিকে নীরবে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া গোরখনাথ কহিলেন, "বৎস, যে কল্যাণময়ী জননী একদিন তোমায় গর্ভে ধরেছেন,

লালন করে বড় হয়েছেন, আজ তিনিই তোমার পুনর্জ্জন্মের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছেন। এতে তোমার মিথ্যা সন্দেহ আসবে কেন? আঠারো বৎসর আগে আমি তোমার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলাম।. তোমার পরমায়ু এবার প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এর একমাত্র প্রতিকার— তোমার সন্ন্যাস গ্রহণ ও যোগসিদ্ধি লাভ। আর কোন উপায় নেই।"

উদাস উদ্‌ভ্রান্তের মত গোপীচাঁদ চাহিয়া আছেন। মস্তিষ্কের সব কিছু যেন গুলাইয়া গিয়াছে। করজোড়ে শুধু কহিলেন, "প্রভু, আপনি এখন আমায় কি করতে বলছেন?"

"বৎস, তোমার জননী তোমায় এই পুনর্জ্জন্ম লাভের পথে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন। কিন্তু তুমি তোমার বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছো। মায়া-বিভ্রমের জন্য নয়ন অন্ধ, বাঁচবার পথ তুমি দেখতে পাচ্ছো না। আমি এবং তোমার জননী দুজনেই তোমায় বাঁচাতে চাই। তাই জালন্ধরীপাদের কাছ থেকে দীক্ষা নেবার নির্দ্দেশ দিচ্ছি। জালন্ধরী আমার প্রিয় শিষ্য এবং তোমার জননীর শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা। সে বহুশ্রুত সিদ্ধপুরুষ। তার সম্বন্ধে অবাঞ্ছিত উক্তি করা তোমার উচিত হয়নি। আরো গর্হিতকাজ করেছো জননী সম্বন্ধে অযথা কটূক্তি ক'রে।"

গোপীচাঁদের দুই চোখ এবার অনুতাপে ছলছল। নতজানু হইয়া গোরখনাথকে নিবেদন করেন, "প্রভু, আর আমায় কিছু বলতে হবে না। আজই আমি দীক্ষা ও সন্ন্যাস নেবার পর রাজপুরী ত্যাগ ক'রবো।"

"তোমার শুভবুদ্ধি জেগেছে, বৎস, এ অতি উত্তম কথা। বার বৎসর সন্ন্যাস জীবনের শেষে তুমি দীর্ঘ আয়ু লাভ করবে। তারপর আবার ফিরে আসবে স্বস্থানে। কিন্তু, বৎস, মাতার সম্বন্ধে যে সব অবাঞ্ছিত উক্তি তুমি করেছো, সে জন্য বিধির বিধান অনুযায়ী দণ্ড তোমায় পেতেই হবে—সন্ন্যাস জীবনে সহ্য করতে হবে নির্য্যাতন ও লাঞ্ছনা। তারপর শোধন ও সিদ্ধির শেষে ফিরে এলে আবার তোমার সঙ্গে ঘটবে আমার সাক্ষাৎ। গোপীচাঁদ, তুমি আমার প্রিয় শিষ্যা ময়নামতীর পুত্র। তাছাড়া, আমার বিশিষ্ট শিষ্য সিদ্ধযোগী জালন্ধরীপাদের শিষ্যত্ব

তুমি আজ গ্রহণ করতে চলেছো। কিন্তু আমার কাছে তোমার এর চেয়েও এক বড় পরিচয় আছে। তুমি যে প্রভু শিবজীর চিহ্নিত সেবক। ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট বহু কাজ এ সংসারে তোমায় যে করতে হবে।”

যেমনিভাবে সবার অলক্ষ্যে গোরখনাথ পটিকার রাজপ্রাসাদে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তেমনি অলৌকিকভাবে হইলেন অন্তর্হিত।

অতঃপর দীক্ষাগুরু জালন্ধরীপাদ ও মাতার চরণে প্রণাম জানাইয়া গোপীচাঁদ কাঁধে তুলিয়া নেন ছিন্নকন্থা ও ভিক্ষার ঝুলি। পত্নী ও পরিজনেরা কাঁদিয়া আকুল হন। নবীন বয়স্ক রাজার এই ভিখারী বেশ দর্শনে সারা রাজ্যে উঠে হাহাকার।

গোরখনাথের কথা গোপীচাঁদের সন্ন্যাস জীবনে ফলিতে দেখা যায়। ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তনে এই ত্যাগতিতিক্ষাময় জীবনেও তাঁহাকে সহ্য করিতে হয় বহুতর অপমান, লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতন।

বার বৎসর অতিক্রান্ত হইলে আবার তিনি নিজ রাজ্যে ফিরিয়া আসেন, হর্ষভরে জননী ও পত্নীদের সহিত মিলিত হন। সারা রাজ্যে আনন্দের বান ডাকিয়া উঠে।

গোপীচাঁদ সেদিন আনুষ্ঠানিকভাবে সিংহাসনে উপবেশন করিবেন। রাজমাতা ময়নাদেবীর আদেশে রাজধানীতে তাই শুরু হইয়াছে বিরাট উৎসব। এই উৎসবের ভীড়ের মধ্যে হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হন যোগীবর গোরখনাথ।

শ্রদ্ধাভরে মহাত্মাকে প্রণাম জানাইয়া গোপীচাঁদ নিবেদন করেন, “প্রভু, আমাদের পরম সৌভাগ্য, এই শুভদিনে আপনার পদধূলি এখানে পড়েছে। আমার একান্ত অনুরোধ, আপনি স্থায়ীভাবে এ রাজ্যে আপনার আসন স্থাপন করুন। আর আপনার সেবার সুযোগ লাভ ক’রে এই জীবন সার্থক করি।”

আশীষ জানাইয়া, স্নেহমধুর কণ্ঠে মহাযোগী গোরখনাথ কহিলেন, “বৎস গোপীচাঁদ, রাজ্য ছেড়ে যেদিন তুমি সন্ন্যাস নিয়েছিলে, সেদিন এখানে

দাঁড়িয়ে থেকে তোমায় আশীর্ব্বাদ করেছিলাম। আজ তোমার সিংহাসনে আরোহণের দিনেও আবার না এসে থাকতে পারলুম না। এখানে স্থায়ীভাবে থাকবার জন্যে তুমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছো, কিন্তু বৎস, তার উপায় কই? বহু লোকের প্রাণের আহ্বানে যে আমায় সাড়া দিতে হয়, নানা স্থানে ঘুরে বেড়াতে হয়।"

"আমার জননী ধন্যা, আপনার পরিপূর্ণ কৃপা তাঁর উপর পড়েছে। সে কৃপার ধারা সেখানে এসেই থেমে না যায়। এই অধীনের ওপরও কিছুটা যেন বর্ষিত হয়।"—যুক্তকরে নিবেদন করেন গোপীচাঁদ।

"বৎস, তোমার ওপর দৃষ্টি রয়েছে বলেই তো এমনি করে মাঝে মাঝে এসে উপস্থিত হই। আশীর্ব্বাদ করি, যে সাধনপথ তুমি পেয়েছো অবিচল নিষ্ঠা নিয়ে তা তুমি অনুসরণ ক'র। আবার তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে—সুদূর পাঞ্জাবে। তখন তোমার অভীষ্ট পূরণে তোমায় আমি সাহায্য ক'রবো।"—একথা বলিয়া শিষ্যগণসহ সেইদিনই গোরখনাথ সেস্থান ত্যাগ করিয়া যান।

গোপীচাঁদ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, রাজ্যের পরিচালনা ভার নিয়াছেন নিজের হস্তে। পত্নী ও প্রিয়জনদের সঙ্গে দিন কাটিতেছে আনন্দ-রঙ্গে। কিন্তু এই রাজকর্ত্তৃত্ব ও রাজপুরীর ভোগসুখে আজকাল তাঁহার যেন আর স্পৃহা নাই। জীবনের শ্রেষ্ঠ বারোটি বৎসর কাটাইয়া আসিয়াছেন সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীরূপে। গুরুকৃপায় যোগসাধনা ও সিদ্ধির আস্বাদও কিছুটা লাভ করিয়াছেন। কোনমতেই সেই যোগীজীবনের আনন্দময় স্মৃতি ভুলিতে পারিতেছেন না।

অবশেষে, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি মন স্থির করিয়া ফেলেন, সংসার ছাড়িয়া আবার বাহির হইয়া পড়েন নাথযোগীর বহু-ইপ্সিত পরম প্রাপ্তির পথে।

এই সময়কার সাধনজীবনে প্রভু গোরখনাথের আশ্রয় তিনি লাভ করেন, তাঁহার সাহায্যে এক শক্তিধর সিদ্ধযোগীরূপে হন রূপান্তরিত।

উত্তরকালে তাঁহার জীবনে এই মহাত্মার কৃপালীলা কিভাবে স্ফুরিত হইয়া উঠে, তাহার কিছুটা পরে বর্ণিত হইবে।

সারা উত্তর ভারতে গোরখ-শিষ্য সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী ভর্ত্তৃহরির[১] মর্য্যাদা ছিল অপরিসীম। পূর্ব্বাশ্রমে তিনি ছিলেন পরমার বংশীয় রাজপুত—চন্দাবৎ রাজ্যের এক নৃপতি।

এই ভর্ত্তৃহরির জীবনে যোগীবর গোরখনাথের কৃপালীলা নানাভাবে বিস্তারিত হইয়াছিল। এ সম্পর্কিত বহু বিস্ময়কর কাহিনী উত্তর-ভারতে শত শত বৎসর ধরিয়া প্রচলিত রহিয়াছে। গোরখনাথ ও ভর্ত্তৃহরির প্রথম সাক্ষাৎকারের একটি রম্য কাহিনী প্রচলিত রহিয়াছে।

ভর্ত্তৃ তখনো রাজত্ব ও সংসারধর্ম্ম ত্যাগ করেন নাই, রাজাদের স্বাভাবিক বৃত্তি ও কর্ম্মধারাই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন।

সেদিন বহু লোকলস্কর ও বয়স্যদের তিনি নিয়া মৃগয়া করিতে গিয়াছেন। ঘুরিতে ঘুরিতে সবাই এক বৃহৎ সরোবরের কাছে আসিয়া উপস্থিত। একদল সুদৃশ্য হরিণ মনের আনন্দে উহার তীরে চড়িয়া বেড়াইতেছে। ভর্ত্তৃহরি তো মহা উৎফুল্ল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, এক একটি বাণ ইহাদের উপর নিক্ষেপ করেন, আর কি করিয়া তাহা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ক্রমে তিনি বড় হতাশ হইয়া পড়িলেন।

এ সময়ে একটি হরিণী সম্মুখে আগাইয়া আসে। সবিনয়ে নিবেদন ক'রে, "মহারাজ, এই বনের হরিণেরা কারুর অনিষ্ট করে না, আপনি কেন তবে এদের হত্যা করতে চান? আর যদি হত্যার আনন্দ নেহাৎ পেতেই চান, আমার ওপরই আপনি অস্ত্র নিক্ষেপ করুন। কিন্তু একটা সর্ত্তে। আমায় বধ করার পরই আপনাকে এই মৃগয়া সমাপ্ত করতে হবে। এই যূথের ভেতর আমিই একটিমাত্র হরিণী, আর আমি ইচ্ছে ক'রেই

[১] পাঞ্জাব ও সিন্ধুর লোকগাথা ও জনশ্রুতি অনুসারে, ভর্ত্তৃহরি ছিলেন জালন্ধরী-পাদের শিষ্য। কিন্তু হরিদ্বারের আই-পন্থী যোগী এবং অন্যান্য কয়েকটি নাথপন্থী দল মনে করেন, গোরখনাথই ভর্ত্তৃহরির গুরু।—গেজেটিয়ার্ অব্ দ্য প্রভিন্স অব্ সিন্ড্—ভল্যু ২, পৃঃ ৫৬।

আত্মদান ক'রতে এসেছি, যেন দলের সবাই বাঁচে। শরাঘাতে আমায় হত্যা করুন, আপনার মৃগয়া সফল হোক।"

"ওগো, তা কি করে হয়? ক্ষত্রিয় হয়েতো জেনে শুনে আমি স্ত্রী-অঙ্গে শরাঘাত করতে পারিনে।"—ভর্তৃ দৃঢ়স্বরে মন্তব্য করেন।

হরিণীটি ক্ষণতরে বনান্তরালে ছুটিয়া যায়, সঙ্গে করিয়া আনে একটি তরুণ হরিণকে। এবার সে নিবেদন করে, "মহারাজ, এ হচ্ছে আমার স্বামী। আপনার শরাঘাতের জন্য এ প্রস্তুত হয়েই এসেছে। সর্ত্ত কিন্তু আগেরই মত। একে বধ ক'রার পর আর কারুর অঙ্গে আপনি অস্ত্র নিক্ষেপ করতে পারবেন না।"

ভর্ত্তৃহরির শরাঘাতে হরিণটি ভূতলে লুটাইয়া পড়ে। মৃত্যু যন্ত্রণার ভিতরেও সে কহিতে থাকে—"মহারাজ, আমি মরলোক ছেড়ে চল্লুম। এ সময়ে আপনি আমার একটা অনুরোধ দয়া ক'রে রাখবেন। আমার ক্ষুর দুটি দান ক'রবেন নগরের কোন তস্করকে। এর ছোঁয়া লেগে যেন তাঁর পলায়ন-তৎপরতা বাড়ে, পদদ্বয় হয় দ্রুত ধাবনপটু। আমার শৃঙ্গ অর্পণ করবেন কোন যোগীসাধককে, তিনি যেন তাঁর শিঙারূপে (নাদ) এ দুটো ব্যবহার করতে পারেন। আর আমার চর্ম্ম দেবেন তপস্বীকে, এর উপর বসে তিনি করবেন ধ্যান জপ। আমার চোখ দুটি যদি কোন রূপসী লাভ ক'রে, সে হতে পারবে মৃগনয়না। আর আমার মাংসটুকু আপনি রাখবেন আপনার নিজের জন্য। ভাল সূপকার দিয়ে রান্না ক'রিয়ে ভোজন ক'রবেন তৃপ্তিসহকারে।"

ভর্ত্তৃহরি ততক্ষণে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছেন। একি অদ্ভুত কাণ্ড! মৃগ ও মৃগীর একি অভাবনীয় আত্মদান। দেহান্তের মুহূর্ত্তেও অপরের কল্যাণের জন্য কে এভাবে নিজেকে বিলাইয়া দিতে পারে? নিশ্চয় এই হরিণ ও হরিণীর আচার আচরণের পশ্চাতে কোন দিব্যপুরুষের প্রেরণা রহিয়াছে।

রাজা ভর্ত্তৃর সমগ্র চেতনার মূলে সেদিন পড়িল এক প্রচণ্ড নাড়া ঃ

নিহত মৃগ-দেহ বনমধ্যেই পড়িয়া রহিল। বিষণ্ণ অন্তরে পাত্র-মিত্রসহ তিনি প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন।

এই ঘটনার পরেই রাজা ভর্তৃহরির জীবনে উপস্থিত হয় পরম লগ্ন। জন্ম জন্মান্তরের সুকৃতির ফলে দর্শন পান মহাযোগী গোরখনাথের, চরণ বন্দনার পর মাগেন তাঁহার কৃপা-প্রসাদ।

আশীর্ব্বাদ দানের পর কথাপ্রসঙ্গে গোরখনাথ কহিলেন, "বৎস, আজ মৃগয়ায় গিয়ে তুমি যাকে হত্যা করে এসেছ, সে সামান্য হরিণ নয়, সে আমারই আশ্রিত। পূর্ব্বজন্মে আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল—শাপভ্রষ্ট হয়ে, স্বজনবর্গ নিয়ে এবার হরিণজীবন যাপন করছে।"

ভর্তৃ যুক্তকরে আবেদন জানান, "প্রভু, যদি তাই হয়, তবে আপনার আশ্রিতকে কেন এমন নিষ্ঠুরভাবে উপেক্ষা করছেন? যোগশক্তিবলে তার প্রাণদান করুন, আর আমিও অনুতাপের বৃশ্চিক দংশন থেকে রেহাই পেয়ে বাঁচি।"

কথিত আছে, রাজা ভর্তৃর অশ্রুজল ও কাতর অনুনয়ে দয়ার্দ্র হইয়া শক্তিধর মহাযোগী তখনি মৃগয়া-বনে গিয়া উপস্থিত হন। তারপর মৃত হরিণের উপর মন্ত্রঃপূত বারি সিঞ্চন করিয়া উহাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তোলেন।

হতবাক্ ভর্তৃর দিকে তাকাইয়া গোরখনাথ প্রশান্তকণ্ঠে কহেন, "এই হরিণের প্রারব্ধভোগ কিন্তু শেষ হয়ে গিয়েছে। তাই, বাঁচানো হলেও আর একে ধরে রাখবার উপায় নেই।"

কথা কয়টি বলার সঙ্গে সঙ্গেই হরিণের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল, দেহটি লুটাইয়া পড়িল ভূমিতলে।

গোরখনাথ কহিলেন, "মহারাজ, অতীন্দ্রিয় লোকের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ থাক্‌লে, দিব্যচক্ষু থাক্‌লে, দেখতে পেতেন—এই হরিণের আত্মা আজ পরমানন্দে শিবলোকে গমন করছে।"

অতঃপর শিষ্যগণসহ গোরখনাথ স্থান ত্যাগ করিয়া চলিলেন। রাজা বারবার তাঁহাকে সেখানে থাকার জন্য অনুরোধ করিলে, আশ্বাস দিয়া

কহিলেন, "মহারাজ, আবার আমাদের সাক্ষাৎ হবে—এবং আপনার খুব প্রয়োজনের দিনেই আমি এসে উপস্থিত হবো।"

ইতিমধ্যে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। রাজা ভর্তৃহরি সেদিন মৃগয়ার উদ্দেশ্যে অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। পথ চলিতে চলিতে চোখে পড়িল এক চিতাশয্যা। নিম্ন শ্রেণীর একদল লোক সম্মুখে ভীড় করিয়া সেখানে দাঁড়াইয়া আছে। ঘোড়া হইতে নামিয়া রাজা ব্যাপার কি জানিতে চাহিলেন। শোনা গেল, পারৃধি জাতীয় একটি লোক বনে শিকার করিতে আসিয়াছিল, সর্পাঘাতে সে মারা গিয়াছে। তাহার স্ত্রী এবার পতির সহমরণে যাইবে, তাই এই চিতাটি সজ্জিত করা হইতেছে। অগ্নিসংযোগ করার সঙ্গে সঙ্গে সকলের সম্মুখে পতি পত্নীর দেহ ভস্মীভূত হইয়া গেল।

ভর্তৃহরির হৃদয়ে এই করুণ দৃশ্যটি এক গভীর ছাপ রাখিয়া যায়। প্রাসাদে ফিরিয়াই রাণী পিঙ্গলার কাছে ঘটনাটি বিবৃত করিয়া কহিলেন, "প্রিয়ে, দেখেছো, নীচ জাতীয়া গরীব ঘরের নারী—অথচ স্বামীর প্রতি তার কি অপূর্ব্ব ভালবাসা। নির্ব্বিকার চিত্তে স্বামীর চিতায় উঠে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলে!"

পিঙ্গলা বলিয়া উঠিলেন, "তবে তুমিও একথা শুনে রাখো, তোমার দেহান্ত হলে আমিও এমনি ক'রে আত্মবিসর্জ্জন দেবো, প্রমাণ ক'রবো স্বামীর প্রতি আমার ভালবাসার গভীরতা। আরো বলে রাখছি, তোমার মৃতদেহ চোখে দেখা তো দূরের কথা, মৃত্যু সংবাদ পাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি এ দেহ আহুতি দেবো চিতার আগুনে।

রাজা হাসিয়া বলিলেন, "যাক্, এ নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন দরকার নেই। আমি শিগ্‌গীর মরছিনে, তাই তোমারও সে সুযোগ তাড়াতাড়ি আর আস্‌ছেনা।"

কিছুদিন পরে ভর্তৃহরি আবার একদিন মৃগয়ায় গিয়াছেন। হঠাৎ রাণী পিঙ্গলার সেদিনকার কথাটি তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। ভাবিলেন, 'প্রেয়সীর সঙ্গে একটা রসিকতা করাই যাক্ না। খবর পাঠিয়ে দিই,

শিকারের সময় হিংস্র বাঘের হাতে মহারাজ নিহত হয়েছেন। দেখি এতে পিঙ্গলার কি প্রতিক্রিয়া হয়। তারপর প্রাসাদে ফিরে গিয়ে, এ নিয়ে খুব হাসি-ঠাট্টা আর মজা করা যাবে।'

মিথ্যা সংবাদ দানের ফল কিন্তু হইল বড় গুরুতর। রাজার মৃত্যু সংবাদ পাইয়াই শোকাকুলা রাণী পিঙ্গলা চিতাশয্যা প্রস্তুত করাইলেন, পতির নাম স্মরণ করিয়া জ্বলন্ত আগুনে দিলেন আত্মবিসর্জ্জন।

ফিরিয়া আসিয়াই ভর্ত্তৃহরি এই মর্ম্মভেদী সংবাদ শুনিতে পান। চিতার কাছে ছুটিয়া গিয়া দেখেন—সব শেষ। পিঙ্গলার দেহ ততক্ষণে পুড়িয়া অঙ্গারে পরিণত হইয়াছে।

পতি পত্নী উভয়ে উভয়কে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন, তাই পিঙ্গলার বিরহে ভর্ত্তৃহরি বড় অধীর হইয়া পড়িলেন। শোক আরো উথলিয়া উঠিল নিজের ভুলের কথা স্মরণ করিয়া। ঐ ধরণের নির্ব্বোধ রসিকতা কেন তিনি করিতে গিয়াছিলেন? তাইতো পিঙ্গলা এমনভাবে আজ নিজের মৃত্যু ডাকিয়া আনিল। চিতার পার্শ্বে বসিয়া রাজা কান্নায় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। খানিক বাদে শোক কিছুটা প্রশমিত হইলে অন্তরে জাগিয়া উঠিল প্রবল নির্ব্বেদ।

পত্নীর চিতা স্পর্শ করিয়া তখনি ভর্ত্তৃহরি অস্ফুটস্বরে এক শপথ বাণী উচ্চারণ করিলেন। কহিলেন, "প্রিয়ে পিঙ্গলা, তোমার এই মৃত্যু ঘটলো আমারই নির্ব্বুদ্ধিতায়। তাই এবার এই রাজসুখ ও রাজপদ থেকে নিজেকে আমি সরিয়ে নেবো, গ্রহণ করবো সন্ন্যাস।"

খানিক বাদেই সদ্য নির্ব্বাপিত চিতার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন মহাযোগী গোরখনাথ। স্নেহমাখা কণ্ঠে কহিলেন, "মহারাজ ভর্ত্তৃহরি, আপনি বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি, শোকের ভারে এমন ক'রে ভেঙ্গে পড়লে চলবে কেন? আত্মসম্বরণ করুন।"

কিছুটা প্রকৃতিস্থ হওয়ার পর ভর্ত্তৃহরি উঠিয়া দাঁড়ান, শ্রদ্ধাভরে মহাযোগীর চরণ বন্দনা করেন।

গোরখনাথের হস্তে রহিয়াছে একটি ক্ষুদ্রাকার মৃৎ-ভাণ্ড। সেটি

উত্তোলন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ, এতে সংগ্রহ করা রয়েছে নর্ম্মদার পবিত্র বারি। আসুন, গ্রহণ ক'রে শান্ত হোন।"—বলিতে বলিতেই হস্তচ্যুত হইয়া ভাণ্ডটি চুরমার হইয়া গেল।

মাটির একটি ঘড়া ভাঙ্গিয়াছে, অথচ এ যেন এক অতি প্রিয়জন বিয়োগের মতই দুঃসহ ঘটনা। মহা শোকার্ত্ত হইয়া গোরখনাথ তখনি ক্রন্দন শুরু করিয়া দিলেন। তাঁহাকে শান্ত করিবে এমন সাধ্য কার?

ভর্ত্তৃহরি তো বিস্ময়ে হতবাক্। মহাশক্তিধর যোগী বলিয়া যিনি সারা ভারতে খ্যাত, তাঁহার কেন এই মায়ার বন্ধন? তুচ্ছ একটি মাটির জলপাত্র হারাইয়া এমন দুর্দ্দশা!

কহিলেন, "যোগীবর, আপনি স্থির হোন, এক্ষুনি এ রকমের পাত্র আরো দশ বিশটা আনিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু প্রভু, সবিনয়ে জিজ্ঞেস করছি—এই সামান্য ভঙ্গুর জিনিষটির জন্য আপনি এতো উতলা হয়ে পড়লেন কেন?"

"রাণী পিঙ্গলার জন্যই বা এতো শোক আপনার উথ্‌লে উঠেছিল কেন, মহারাজ?"

"সে কি! সে যে আমার পত্নী, এ রাজ্যের রাণী।"

"আপনার পত্নীই হোন, আর রাণীই হোন, আমার এই মৃৎভাণ্ডের মত একটা আধার বইতো নয়। তা যেমন ভেঙ্গে যায়, তেমনি আবার নূতন ক'রে গড়াও তো যায়। আপনি তো আমায় দশ বিশটা মাটির ভাণ্ড যোগাড় ক'রে দেবেন বলে আশ্বাস দিচ্ছিলেন। আমিও তেমনি আপনাকে দিচ্ছি পঁচিশটি রাণী। আর হ্যাঁ, এদের প্রত্যেকটিই আপনার রাণী—পিঙ্গলা।

মন্ত্রঃপূত কিছুটা জল গোরখনাথ চিতার উপর ছিটাইয়া দেন। সঙ্গে সঙ্গে যোগশক্তির বলে উদ্‌ঘাটিত হয় এক ঐন্দ্রজালিক দৃশ্য। পঁচিশটি পরমাসুন্দরী নারী—হুবহু রাণী পিঙ্গলারই মত দেখিতে—ভর্ত্তৃহরির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ান।[১] বিস্ময়বিহ্বল রাজা এক একজনের দিকে দৃষ্টি

১ ডবল্যু ওয়াটসন: দ্য ষ্টোরি অব্ রাণী পিঙ্গলা—ইণ্ডিয়ান অ্যান্টিকুয়েরিজ্, ১৮৭৩, পৃঃ ২১৫, এফ্.

নিবদ্ধ করিতেছেন আর ভাবিতেছেন, এইটিই তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী পিঙ্গলা। কিন্তু একের সঙ্গে অপরের বিন্দুমাত্র পার্থক্য নাই, তারতম্য নাই। কোন্‌টি আসল কোন্‌টি নকল বুঝা যাইতেছে না।

মহাযোগীর বিভূতিবলে সৃষ্ট এই মায়া বিভ্রমের মধ্যে রাজা ভর্ত্তৃহরি একেবারে দিশাহারা হইয়া পড়িলেন।

এবার সকাতরে গোরখনাথের চরণে নিবেদন করিলেন, "প্রভু, আমি বিষয়কীট—অন্ধ। আপনার দিব্যদৃষ্টি কোথায় পাবো? আর এভাবে আমায় হাস্যাস্পদ করবেন না। আজ আমি বুঝতে পেরেছি, আপনার যোগসামর্থ্যের পরিসীমা নেই। এবার দয়া ক'রে সত্যকার পিঙ্গলাকে আমায় চিনিয়ে দিন, এই আমার প্রার্থনা।"

মন্ত্রঃপূত জল আর একবার গোরখনাথ চারিদিকে ছিটাইয়া দিলেন, তৎক্ষণাৎ একটি বাদে আর সবগুলি নারীমূর্ত্তি সেখান হইতে কোথায় মিলাইয়া গেল।

হাস্যভরে যোগীবর কহিলেন, "মহারাজ ভর্ত্তৃহরি, একবার তাকিয়ে দেখুন, এই হচ্ছে আপনার সত্যকার রাণী।"

উপস্থিত জনতা এই অলৌকিক কাণ্ড দেখিয়া ভয়ে বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া গিয়াছে। পুনর্জ্জীবনপ্রাপ্তা পিঙ্গলা অতঃপর ধীরপদে আগাইয়া আসিয়া গোরখনাথ ও ভর্ত্তৃহরিকে প্রণাম করিলেন, করজোড়ে সম্মুখে রহিলেন দণ্ডায়মান।

প্রসন্নকণ্ঠে যোগীবর কহিলেন, "ভর্ত্তৃহরি, এবার আপনি আপনার রাণীকে গ্রহণ করুন, ফিরে চলুন রাজপ্রাসাদে।"

গোরখনাথের এই অত্যাশ্চর্য্য বিভূতিলীলা রাজা ভর্ত্তৃহরির জীবনে আনিয়াছে প্রচণ্ড আলোড়ন, দৃষ্টিভঙ্গীরও ঘটাইয়াছে আমূল পরিবর্ত্তন। এইসঙ্গে পূর্ব্বজন্মের শুদ্ধ সংস্কারও এক মুহূর্ত্তে জাগিয়া উঠিয়াছে। উপলব্ধিতে আসিয়া গিয়াছে এক পরমবোধ—বিত্ত বিভব, রাজ্যপাট ও প্রেমময়ী পত্নী পিঙ্গলা, এ সমস্তই মায়ার খেলা ছাড়া কিছু নয়। যোগী গোরখনাথের কৃপায় আজ তিনি বুঝিয়াছেন, জীবন ও মৃত্যু একই

পরম সত্তায় বিধৃত। আরো বুঝিয়াছেন, এই জগৎপ্রপঞ্চ একেবারেই মিথ্যা—অলীক। রাণী পিঙ্গলার লাবণ্যময়ী তনু আর যোগীবরের ভঙ্গুর মৃৎভাণ্ডের মধ্যে সত্যকার কোন পার্থক্যই নাই।

ভর্ত্তৃহরি করযোড়ে নিবেদন করেন, "প্রভু, আপনার কৃপায় এ অন্ধ আজ প্রকৃত আলো দেখতে পেয়েছে। এই আলোর পথেই এবার থেকে শুরু হোক্ তার যাত্রা। আপনি আমায় কৃপা ক'রে দীক্ষা দিন, নাথযোগের শ্রেষ্ঠ সিদ্ধির পথে নিয়ে চলুন।"

"কিন্তু রাজসিংহাসনের ভোগসুখ, পত্নীর প্রেম, এ সব ছেড়ে যাওয়া কি আপনার পক্ষে সম্ভব হবে?"—প্রশ্ন করেন মহাযোগী।

"হ্যাঁ, প্রভু, আমায় যেতেই হবে। সংসারের মোহ একেবারেই চলে গিয়েছে। তাছাড়া, প্রাণপ্রিয়া পিঙ্গলার চিতার পাশে বসে আমি শপথ গ্রহণ করেছি সংসার ত্যাগের।[১] আপনি আমায় আশ্রয় দিন, মুক্তির পথ দেখিয়ে দিন।"

"মহারাজ, বেশ, আপনাকে আমি দীক্ষা দেবো—কিন্তু এক সর্ত্তে। চরম ভোগঐশ্বর্য্যে কাটিয়েছেন এতদিন, এবার বারো বৎসর আপনাকে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য সাধন করতে হবে। ভিক্ষান্নে করতে হবে উদর-পূর্ত্তি।"

"উত্তম কথা, প্রভু। সানন্দে আমি তা করবো।"

"অপেক্ষা করুন, মহারাজ। আরো কথা আছে। প্রতি একাদশী তিথির পরদিন আপনি ভিক্ষা মাগ্‌তে আসবেন আপনার রাজপ্রাসাদে। সেখানে প্রিয়তমা রাণী পিঙ্গলার সম্মুখে গিয়ে এই ব'লে দাঁড়াবেন—মা পিঙ্গলা, আমায় ভিক্ষা দাও। পত্নীর মোহ ও প্রলোভন একেবারে গিয়েছে কিনা, নূতন করে সঞ্চারিত হচ্ছে কিনা—তা এর ভেতর দিয়ে আমি লক্ষ্য করবো। তারপর বার বৎসর অতীত হ'লে দেবো আপনাকে নিগূঢ় যোগসাধন। হাতে পাবেন মোক্ষের চাবিকাঠি!"

মহাযোগীর চরণে প্রণত হইয়া রাজা ভর্ত্তৃহরি করজোড়ে কহিলেন,

---

[১]। জার্ণাল্ অব এশিয়াটিক্ ওরিয়েণ্টাল্ সোসাইটি : ভল্যু ২৫, পৃঃ ১৯৮-২৩৩ ; এল, ডি, গ্রে : দ্য ভর্তৃহরি নির্বেদ্ অব্ হরিহর্।

"প্রভু, আমার সম্বন্ধে আমি অকিঞ্চন। আর আজ থেকে আপনার নির্দ্দেশ হয়ে রইলো আমার শিরোধার্য্য।"

নয়ন জলে বক্ষ ভাসাইয়া রাণী পিঙ্গলা রাজপুরীতে ফিরিয়া গেলেন, পরিজন ও প্রজাবৃন্দের উপর পতিত হইল গভীর শোকের ছায়া। চীর বসন পরিয়া নির্বিবণ্ণ সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী, ভর্ত্তৃহরি, আশ্রয় নিলেন নগরের উপান্তে এক পর্ণকুটিরে। ব্রত উদ্‌যাপনের শেষে লাভ করিলেন গোরখনাথের কৃপা-প্রসাদ।

উত্তর ভারতের যোগী-গায়ক ও সারেঙ্গীহারেরা আজো করুণ সুরে রাজবৈরাগী ভর্ত্তৃহরির এই অদ্ভুত ধরণের ভিক্ষার কাহিনী গাহিয়া বেড়ায়। একতারার মূর্চ্ছনার সাথে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে তাহাদের পরম প্রিয় সঙ্গীতের কলি—'ভিক্‌ষা দে মাঈয়া পিঙ্গলে'—

গোরখনাথের কৃপায় ভর্ত্তৃহবি কায়াসিদ্ধি লাভ করেন, প্রতিষ্ঠিত হন নাথত্বে। উত্তর প্রদেশ, পূর্ব্ব পাঞ্জাব, সিন্ধু ও গুজরাটে আজো বহু সংখ্যক ভর্ত্তৃহরি-যোগীর সন্ধান পাওয়া যায়।

ভর্ত্তৃহরির অন্যতম প্রধান শিষ্য, মহাত্মা রতননাথ ছিলেন অসামান্য যোগবিভূতির অধিকারী। পেশোয়ার অঞ্চলে তাঁহার বহুসংখ্যক যোগীশিষ্য বর্ত্তমান ছিল। আর কোহাট, জেলালাবাদ ও কাবুলের যোগী-মঠগুলি পরিচালিত হইত তাঁহারই তত্ত্বাবধানে।

রতননাথ সুপ্রসিদ্ধ নাথ-গুরু হইয়াও কাণে কোন কুণ্ডল পরিতেন না। এজন্য যোগীটিলার কয়েকটি প্রবীণ নিষ্ঠাবান যোগী একবার তাঁহাকে খুব তিরস্কার করেন, বলেন, "কিগো, তুমি শত শত যোগশিক্ষার্থী ও ভক্তের আশ্রয়দাতা, নাথধর্ম্মের একজন দিক্‌পাল—আর সেই তুমিই কিনা কাণে কুণ্ডল পরছো না।"

"কেন, তাতে কি দোষটা হয়েছে?"—উপেক্ষার সুরে উত্তর দেন সিদ্ধযোগী রতননাথ।

"নবীনদের মধ্যে তোমার এই আচরণের মধ্য দিয়ে কি কুদৃষ্টান্ত দেখানো হচ্ছে না ?

একথার উত্তর না দিয়া তিনি তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। কিন্তু সমালোচকেরাও ছাড়িবার পাত্র নন, বার বার তীক্ষ্ণ বাক্যে তাঁহাকে গঞ্জনা দিতে থাকেন।

অবশেষে রতননাথ সেদিন বড় উত্তেজিত হইয়া উঠেন, সর্ব্বসমক্ষে প্রদর্শন করেন এক অতি অদ্ভুত যোগ সিদ্ধাই। দুই হাত দিয়া সজোরে হঠাৎ তিনি নিজের বক্ষপঞ্জর বিদারণ করিয়া ফেলিলেন, তারপর দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "তা'হলে এবার ভাল ক'রে তাকিয়ে ছাখো, তোমাদের সাধের কুণ্ডল এখানে রয়েছে কিনা।"

সকলে সবিস্ময়ে তাকাইয়া দেখেন, সত্য সত্যই তাঁহার রক্তাক্ত বক্ষের অভ্যন্তরে সংগোপিত রহিয়াছে গণ্ডারশৃঙ্গে নির্ম্মিত, ধূসর রং-এর একজোড়া কর্ণকুণ্ডল।[১]

একবার অন্তরঙ্গ ভক্তেরা আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিতেছিলেন—রতননাথের পরে এ অঞ্চলে এমন আর কেহ থাকিবেন না যিনি তাঁহার মত বিপুল যোগৈশ্বর্য্য লাভ করিবেন। জনশ্রুতি আছে, এ কথা শুনিয়া গোরখনাথের নাতি-শিষ্য এই শক্তিধর যোগী তাঁহার নিজ দেহ হইতে তখনি একটি সৌম্যদর্শন সমাধিবান বালক সাধকের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কায়া হইতে সৃষ্ট, তাই তাঁহার নাম হয়—কায়ানাথ। উত্তরকালে পেশোয়ার অঞ্চলের শুধু হিন্দু ও বৌদ্ধরাই নয়, বহু মুসলমানও তাঁহার নিকট ধর্ম্মোপদেশ লাভ করিয়া উপকৃত হন। যোগী কায়ানাথকে তাঁহার মুসলমান ভক্তেরা আদর করিয়া নাম দেয়—কোয়াইম্ উদ্‌দীন।

কাবুল ও জালালাবাদে যোগী রতননাথের স্মৃতিজড়িত জীর্ণ মন্দির এখনো রহিয়াছে। শক্তিধর যোগীর তিরোধানের কয়েক শত বৎসর পরও স্থানীয় মুসলমানেরা রতননাথী যোগীদের অলৌকিক বিভূতির কথা সশ্রদ্ধভাবে বলাবলি করিত।

---

১ ব্রীগ্‌স : গোরখনাথ্ এণ্ড কাণফাট্টা যোগীজ্—পৃঃ ৬৫-৬৬

যোগীবর গোরখনাথের অন্যতম কৃপাপ্রাপ্ত শিষ্য হইতেছেন পাঞ্জাবের রাজা শালিবাহনের পুত্র পূরণভগৎ। বাল্যকাল হইতেই তিনি সৎ, উদার ও ঈশ্বরপ্রেমিক। চরিত্রের পবিত্রতার সঙ্গে দৃঢ়তাও ছিল তাঁহার যথেষ্ট। যৌবনে পদার্পণ করার পর পূরণের জীবনে ঘনাইয়া আসে এক মহা সঙ্কট। বিমাতা রাণী লুনান্ ছিলেন তরুণী, পরমা সুন্দরী এবং নিঃসন্তান। এই রাণী সুদর্শন যুবক পূরণের প্রতি অতিশয় আকৃষ্টা হন এবং তাঁহাকে স্ববশে আনয়নের প্রবল চেষ্টা করিতে থাকেন।

পূরণ কিন্তু ঘৃণাভরে রাণী লুনানের সব প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করেন। ইহার ফলে রাণী ক্রোধে হইয়া উঠেন একেবারে জ্ঞানহীন। অবশেষে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য পূরণের বিরুদ্ধে রাজার নিকট তিনি আনয়ন করেন এক মিথ্যা অভিযোগ। তিনি বলেন, কামাসক্ত হইয়া পুরণ তাঁহাকে আয়ত্তে আনিতে চাহিতেছেন।

রাজা একে বৃদ্ধ, তদুপরি রূপসী কনিষ্ঠা রাণীর প্রতি মোহে আচ্ছন্ন, বিচার বুদ্ধি কিছুই আর তাঁহাতে অবশিষ্ট নাই। তাই পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া পুত্রের উপর দিলেন চরম দণ্ডের আদেশ। হস্তপদ কর্ত্তন করিয়া পূরণকে নিক্ষেপ করা হইল এক শুষ্ক কূপের ভিতর।

একাদিক্রমে প্রায় বারদিন, মৃতকল্প অবস্থায় তাঁহাকে এই কূপে পড়িয়া থাকিতে হয়। তারপর দৈবযোগে সেখানে এই সঙ্কটকালে আবির্ভাব ঘটে গোরখনাথের। কথিত আছে, যোগীবরের অত্যাশ্চর্য্য বিভূতির বলে পূরণের কর্ত্তিত হস্তপদ আবার নূতন করিয়া জোড়া লাগিয়া যায়, কূপ হইতে তিনি উদ্ধার লাভ করেন।

পুরণ কিন্তু আর রাজপুরীতে ফিরিয়া যান নাই, গুরু গোরখনাথের আশ্রয়েই সানন্দে অবস্থান করিতে থাকেন। কয়েক বৎসরের কৃচ্ছ্র ও কঠোর তপস্যার ফলে তিনি লাভ করেন যোগসিদ্ধি এবং সর্ব্ব সাধারণের কাছে পূরণ ভগৎ নামে পরিচিত হইয়া উঠেন।

গুরুর আদেশে সেবার কিছুদিনের জন্য তিনি রাজপুরীতে ফিরিয়া যান। রাজপুত্র পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছেন, গোরখনাথের দীক্ষাশিক্ষায়

হইয়া উঠিয়াছেন এক শক্তিধর যোগী, তাই তাঁহার দর্শনে রাজপুরীতে সেদিন আনন্দের উচ্ছ্বাস বহিয়া যায়।

এদিকে বিমাতা লুনান অতিশয় ভীতা ও অনুতপ্তা হইয়া পড়েন। নবীন যোগী পূরণের কাছে আসিয়া কাতরস্বরে বারবার তিনি মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতে থাকেন।

সর্ব্বসমক্ষে এ সময়ে ফুটিয়া উঠিতে দেখা যায় গোরখশিষ্য, সিদ্ধ সাধক পূরণের ক্ষমাসুন্দর মহিমাময় রূপ। রাণী লুনান্‌এর সমস্ত কিছু দোষ তিনি মার্জ্জনা করেন। শুধু তাহাই নয়, তাঁহার বরে এই রাণী উত্তরকালে এক পুত্ররত্নও লাভ করেন। এই পুত্রের নাম রাখা হয় রসালু। পূরণের এই বৈমাত্রেয় ভ্রাতা উত্তরকালে গোরখনাথের এক বিশিষ্ট শিষ্য এবং সার্থকনামা যোগীরূপে খ্যাত হইয়া উঠেন।

রন্‌ঝা ও হীরের প্রেমোপাখ্যানের সহিতও কৃপালু গোরখনাথের পবিত্র স্মৃতি জড়িত রহিয়াছে। পাঞ্জাবের জনজীবন ও লোকগাথায় ইহার প্রচুর নিদর্শন মিলে।

রাজপুত ভক্ত গুগা ছিলেন গোরখনাথের শক্তিধর যোগী-শিষ্যদের অন্যতম। গুগার বৈশিষ্ট্য—তিনি সমাজের নিম্নস্তরের সকল মানুষের উপর অকৃপণ করে কৃপা ছড়াইয়া গিয়াছেন। উত্তরপশ্চিম ভারতের অন্ত্যজ অস্পৃশ্য এবং নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে এই সাধকের প্রভাব ছিল অসামান্য। গ্রামাঞ্চলের বহু ক্ষুদ্র মন্দিরে গোরখশিষ্য গুগা ও তাঁহার যোগ সাধনার প্রতীক সর্পের প্রতিমূর্ত্তি দেখা যায়।

পাঞ্জাব ও বাংলার লোকগাথা আলোচনা করিলে প্রতীয়মান হয়, বাংলার রাজপুত্র গোপীচাঁদ শেষবারের মত সিংহাসন ত্যাগ করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে সিন্ধু ও পাঞ্জাবস্থিত নাথযোগীদের প্রধান তপস্যাস্থল-গুলিতে আসিয়া উপস্থিত হন এবং এসব স্থানে কঠোর সাধনার পর সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁহার সাধন-ঐশ্বর্য্যের খ্যাতি শতশত বৎসর পরেও জনমনে জাগরূক ছিল।

সিন্ধুর পীর অড়্ অঞ্চলের লোকদের কাছে সাধকপ্রবর গোপীচাঁদ পরিচিত ছিলেন 'পীরপথাও' নামে। উত্তরকালে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই তাঁহার পবিত্র স্মৃতিকে সমভাবে শ্রদ্ধা করিত। করাচী হইতে কিছুটা দূরে আজো একটি প্রাচীন প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়—মুসলমানেরা এটিকে বলে 'পীর পুত্ত' আর হিন্দুরা বলে 'গোপীচাঁদ রাজ'। এই ভগ্ন আশ্রমসৌধ যে বাংলার রাজসন্ন্যাসী গোপীচাঁদকে কেন্দ্র করিয়াই নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

পরিব্রাজন করিতে করিতে গোরখনাথ সে-বার সিন্ধুদেশে আসিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার অন্যতম ভক্ত ও শিষ্য গোপীচাঁদ তখন এখানে থাকিয়াই সাধন ভজন করেন। গোপীচাঁদ যৌবনে জালন্ধরীপাদের কাছে দীক্ষা নিয়াছেন, কিন্তু যোগসাধনার পথ-প্রদর্শকরূপে বরণ করিয়াছেন গোরখনাথকে। বহুদিন পরে এই শিবস্বরূপ মহাযোগীর দর্শন পাইয়া তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না।

কয়েকদিন সেখানে অবস্থান করার পর গোরখনাথ গোপীচাঁদকে কহিলেন, "বৎস, কৃচ্ছ্র এবং ত্যাগ বৈরাগ্য তোমার এই নবীন জীবনে যথেষ্ট হয়েছে। তাছাড়া, পরিব্রাজন ও সাধন ভজনও এযাবৎ তুমি কম ক'রনি। এবার একটি তপস্যাকেন্দ্র বেছে নিয়ে স্থির হয়ে বসে পড়ো। অদূরেই রয়েছে পবিত্র অড়্ পর্ব্বত। পুরাকালে বহু যোগী ঋষি ওখানে কঠোর সাধনা ক'রে গেছেন, সিদ্ধ হয়েছেন। ঐ পর্ব্বতের গুহায় বসে তুমি তোমার যোগসাধনা সমাপ্ত ক'র। আশীর্ব্বাদ করি, অচিরেই হও সিদ্ধকাম।"

গোপীচাঁদকে যোগসাধনার নিগূঢ়তম প্রক্রিয়াগুলি গোরখনাথ এবার শিক্ষা দিলেন। তারপর স্বয়ং সযত্নে সঙ্গে করিয়া নিয়া গেলেন পর্ব্বতের পাদদেশে। নীচে হইতে নির্দ্দিষ্ট সাধনগুহাটি গোপীচাঁদকে দেখাইয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন গিরণার পাহাড়ে।

পাহাড়ে উঠিয়া গোপীচাঁদ এক বিপদে পড়িলেন। দয়ানাথ নামে এক মহাশক্তিধর তান্ত্রিক দীর্ঘকাল সেখানে অবস্থান করিতেছেন। বিপুল

অলৌকিক শক্তির তিনি অধিকারী। বহু সংখ্যক শিষ্য তাঁহার, আর স্থানীয় সাধুসন্ত মহলেও প্রতিপত্তি অসাধারণ।

ইনি তন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষ। নানা চাঞ্চল্যকর কাহিনী শুনিয়া গোপীচাঁদ ইঁহার সম্বন্ধে কৌতুহলী হইলেন। এখানকার বনে জঙ্গলে ও পাহাড়ের গুহায় বহু সাধু তপস্যা করেন, তাই ধুনির কাঠ ও আগুন তাঁহাদের সর্ব্বদাই দরকার। আর দয়ানাথই নাকি তাঁহার অলৌকিক শক্তিবলে সবাইকে এসব করেন সরবরাহ। সবাই বলে, তাঁহার একটি সিদ্ধাইর পেটিকা রহিয়াছে। অফুরন্ত কাঠ ও আগুনের সরবরাহ আসে এটি হইতে। শীতে গ্রীষ্মে, দিনে রাতে যখন যাহার এবস্তু দুইটির দরকার, দয়ানাথের পেটিকা স্বয়ংচালিত হইয়া তাহার যোগান দেয়।

উঁচু পাহাড়ের উপর জল সংগ্রহ করা এক দুরূহ সমস্যা। দয়ানাথ তাহারও চমৎকার সমাধান করিয়া রাখিয়াছেন, একটি জলবাহী বলদ তিনি প্রতিপালন করেন। পৃষ্ঠদেশে দুইটি মশক ঝুলাইয়া উহা বারবার নিম্নে অবতরণ ক'রে, আর নদীতে পা দিবার সঙ্গে সঙ্গে আপনা হইতেই পৃষ্ঠস্থিত মশকটি জলে পূর্ণ হইয়া উঠে। তারপর এই বলদটি পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া সাধুদের ক'রে জল বিতরণ।

স্থানীয় সাধুদের ভোজনের ব্যবস্থাও হয় দয়ানাথের সিদ্ধাইর বলে। অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন, বৃহদাকার একটি ভিক্ষাপাত্র তাঁহার রহিয়াছে। প্রয়োজন হইলেই আপনা হইতে এটি সুস্বাদু পুরী-কচুরী-মালপোয়ায় ভর্‌তি হইয়া উঠে। আশেপাশের পাহাড়স্থিত সাধুরা সবাই এসব দিয়া করেন তাঁদের ক্ষুন্নিবৃত্তি।

কিন্তু পরোপকার ও সাধুসেবার উৎসাহ থাকিলে কি হয়, দয়ানাথ বড় উগ্র স্বভাবের। সাধুদের উপর নিজ আধিপত্য বিস্তারের জন্যও তিনি সতত চেষ্টিত—একবার তাঁহার কুদৃষ্টিতে পড়িলে কাহারো নিস্তার নাই। তাঁহার মন্ত্রঃপূত রজ্জুর বন্ধন-ভয়ে ও দীর্ঘ যষ্ঠির প্রহারে নির্য্যাতিত সাধুরা ত্রাহি ত্রাহি রব ছাড়িতে থাকে।

তান্ত্রিক দয়ানাথজী সম্পর্কে এইসব বিস্ময়কর নানা কাহিনী শুনিয়া

গোপীচাঁদ ভাবিলেন, 'এ অঞ্চলে এ সাধু নেতৃস্থানীয় ও প্রতিষ্ঠাবান। একবার তাঁহাকে দর্শন করা ও কিছুটা আলাপ পরিচয় করা মন্দ কি?

দয়ানাথজীকে প্রণাম নিবেদন করিতেই ঘটিল বিপরীত কাণ্ড। ক্রোধে তিনি একেবারে ফাটিয়া পড়িলেন। দুই চোখ রোষে কষায়িত, গর্জ্জিয়া কহিতে লাগিলেন, "ওরে পাপী, ওরে দুরাচার! এক্ষুনি আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যা। তোদের কুঅভিসন্ধি আর ষড়যন্ত্র আমার কিছু বুঝতে বাকী নেই। যা-যা, সরে যা এখান থেকে।"

"মহারাজ, আপনার এমনতর ক্রোধের কারণ তো কিছুই বুঝতে পারছিনে। গুরুর আজ্ঞায় এই নির্জ্জন পাহাড়ে কিছুদিনের জন্য এসেছি তপস্যা করতে। কিন্তু আপনি কেন শুধু শুধু এত বিরূপ হলেন আমার ওপর? আমি আপনার বালক। বুঝিয়ে দিন, কি আমার অপরাধ?" —যুক্তকরে নিবেদন ক'রেন গোপীচাঁদ।

"অপরাধ? তোর যোগীগুরু গোরখনাথ কি আজ এই পাহাড়ের পাদদেশে এসে দাঁড়ায়নি? আমার এই সাধনগুহার দিকে সে কি তীক্ষ্ণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে নি? সত্য ক'রে বল্‌তো।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার কথা যথার্থ।"

"তবে শোন্ হতভাগা। তোর গুরু গোরখনাথ আজ আমার বিরুদ্ধে গোপনে তার যোগবল প্রয়োগ করেছে। এখান দিয়ে সে চলে যাবার পর থেকেই—সাধুসেবার জন্য যে সিদ্ধাইগুলি আমি এতকাল প্রয়োগ করে আসছি, তা আর কাজ করছে না। আমি বুঝেছি, তোকে এখানে পাঠানোর ভেতরও এক গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে। তুই এখানকার সিদ্ধগুহায় তপস্যা ক'রতে বসলে গোরখনাথ নিশ্চয় দু'চারবার আসবে। সেই সুযোগে সে নষ্ট করবে আমার সমস্ত কিছু প্রতিষ্ঠা ও তন্ত্রসিদ্ধি। আর বল্‌তে পারিস্, কেন সে এমন করে পিছু লেগেছে? কেনই বা শুধু শুধু সে আমার বিনষ্টি ডেকে আনতে চায়?"

গোপীচাঁদ সবিনয়ে করজোড়ে নিবেদন করেন, "মহারাজ, আপনি আমার প্রভু গোরখনাথজীকে খুব ভুল বুঝেছেন। তিনি যে শিবকল্প

মহাপুরুষ! সর্ব্বলোকের, সর্ব্বশ্রেণীর সাধকের কল্যাণই সদা তিনি কামনা করেন। তিনি কেন আপনার মত মহাত্মার অনিষ্ট করবেন?

"তবে, কেন এধরণের আচরণ? আমার সিদ্ধাইর প্রতি তার এমনতর ঈর্ষাই বা কেন?"

"ঈর্ষা নয়, বলুন কল্যাণ কামনা।"

"তার মানে?"—তন্ত্রসিদ্ধ সাধক দয়ানাথজীর নয়ন দুটি ক্রোধে জ্বল্ জ্বল্ করিয়া উঠে।

"হয়তো, আপনার এ বিপুল সিদ্ধাই আপনার সাধন জীবনের চরম প্রাপ্তির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর প্রভু গোরখনাথ সেই বাধাটিই দূর করে দিতে চাচ্ছেন কৃপাপরবশ হয়ে।"

"তবে রে মূর্খ! অর্ব্বাচীন! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। তোর গুরু গোরখনাথ কি তবে এমনি আত্মম্ভরী হয়ে উঠেছে? বেশ, তবে ছাখ্ আমার তান্ত্রিক সিদ্ধাইর শক্তি। তারপর ডাক্ তোর গুরুকে, দেখি—সে এর সামনে কতটা এগুতে পারে।"

দৃঢ় হস্তে গোপীচাঁদের হাত দুটি চাপিয়া ধরিয়া তীব্র রোষে কাঁপিতে কাঁপিতে দয়ানাথজী পাহাড় হইতে সমতল ভূমিতে নামিয়া আসেন। শুরু করেন মারাত্মক তান্ত্রিক অভিচার।

ক্ষণপরেই সেখানে ঘটিতে দেখা যায় এক ভয়ঙ্কর অলৌকিক কাণ্ড। সারা পাহাড় ব্যাপিয়া দাউদাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে অগ্নিশিখা, আর জ্বলন্ত গোলকসদৃশ ঐ পাহাড়টি নিক্ষিপ্ত হয় ঊর্দ্ধাকাশে।[১]

ভয়ে বিস্ময়ে নবীন সাধক গোপীচাঁদের বাক্শক্তি ততক্ষণে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। অদূরস্থিত এই ভয়াল অবিশ্বাস্য দৃশ্যের দিকে তিনি চাহিয়া আছেন নিষ্পলক দৃষ্টিতে।

দয়ানাথজীর তীক্ষ্ণস্বরে তাঁহার চমক ভাঙ্গিল—"ওরে, মূর্খ! নিজ চোখে তো দেখ্‌লি আমার সিদ্ধাইর প্রতাপ। এখন যোগী গোরখনাথকে গিয়ে বল্, তোর তপস্যার স্থান সে নূতন ক'রে কোথাও নির্ব্বাচন করুক।

[১] ব্রিগ্‌স্: গোরখনাথ এণ্ড কানফাট্টা যোগীজ পৃঃ ১৯২-৯৩

আমি এবার এ অঞ্চল ছেড়ে চললাম—ধিনোধর পাহাড়ে গিয়ে পাত্‌বো আমার নূতন সাধন-আসন। তারপর আর একবার দেখে নেবো তোর যোগীগুরুকে।"

দয়ানাথজী দৃষ্টির অন্তরালে যাওয়া মাত্র গোপীচাঁদ ছুটিয়া চলিলেন গির্‌ণার পর্ব্বতে, মহাযোগী গোরখনাথ যেখানে অবস্থান করিতেছেন। সাক্ষাৎ হইতেই তীব্র অনুযোগভরা কণ্ঠে কহিলেন, "প্রভু, আপনি তো এখানে নিশ্চিন্তে বসে আছেন, আর ওদিকে দয়ানাথজী আপনার সব ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন বান্‌চাল। তাঁর অদ্ভুত সিদ্ধাইর যে দৃশ্য আজ স্বচক্ষে দেখে এলাম, জীবনে তা কোনদিন ভুলতে পারবো না। সারা অড়্ পাহাড়টি তিনি নিক্ষেপ করেছেন আকাশমার্গে, আর আগুনে পুড়ে তা একেবারে খাক্ হয়ে যাচ্ছে। এমনি ক'রে চুপ চাপ ব'সে না থেকে আপনি শিগ্‌গীর এর একটা প্রতিবিধান করুন।"

গোরখনাথের দৃষ্টি তৎক্ষণাৎ নিবদ্ধ হইল সেই পাহাড়টির দিকে। দেখিলেন, ভূপৃষ্ঠ হইতে দূর আকাশসীমা অবধি জ্বলিয়া উঠিয়াছে এক সর্ব্ব-ধ্বংসী অগ্নিবলয়, লেলিহান শিখা আর ধূম্ররাশিতে চারিদিক হইয়া উঠিয়াছে একাকার।

অমার্জ্জনীয় ঔদ্ধত্য দয়ানাথের! এখনই, এই মুহূর্ত্তে, ইহা দমন না করিলে তো চলিবে না। সঙ্কল্প গ্রহণ করার পরই গোরখনাথ ধ্যানাসনে গিয়া উপবিষ্ট হন। সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূমধ্য হইতে এক অলৌকিক জ্যোতির ধারা নির্গত হইয়া তীব্রবেগে আগাইয়া যায় সম্মুখের দিকে। মুহূর্ত্তে দয়ানাথের প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা নির্ব্বাপিত হইতে দেখা যায়, আর ঊর্দ্ধে উত্থিত অড়্ পর্ব্বত ভূতলে পড়িয়া হয় দ্বিখণ্ডিত।

এবার মহাযোগী গোরখনাথ ফিরিয়া তাকান ধিনোধর পর্ব্বতের দিকে, যেখানে বসিয়া ক্রুদ্ধ দয়ানাথ তাঁহার তান্ত্রিক অভিচার ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছেন। তখনি মানসপটে তাঁহার ভাসিয়া উঠে অদ্ভুত এক দৃশ্য। দেখেন, মন্ত্রঃপূত একটি গোটা সুপারীর উপর নিজ মস্তক স্থাপন করিয়া দয়ানাথ হেঁটমুণ্ডে শুরু করিয়াছেন এক নূতন তপশ্চর্য্যা।

গোপীচাঁদের দিকে চাহিয়া যোগীবর শান্তস্বরে কহিলেন, "বৎস, বিপদ কিন্তু এখনো কাটেনি। দয়ানাথের সঙ্কল্পিত এই বিশেষ ক্রিয়া যদি পূর্ণাঙ্গ হয় তবে সারা সিন্ধুদেশ আজ আগুনে পুড়ে একেবারে খাঁক্ হয়ে যাবে। ওকে এক্ষুনি নিবৃত্ত করতে হচ্ছে।"

কথা কয়টি শেষ হইতে না হইতেই আকাশমার্গ হইতে গোরখনাথের পদপ্রান্তে ঝুপ্ করিয়া পতিত হন বিশালবপু এক সন্ন্যাসী। গোরখনাথের চরণ ধরিয়া বারবার তিনি ক্ষমা ভিক্ষা করিতে থাকেন।

ধীর প্রশান্ত কণ্ঠে মহাযোগী কহিলেন, "দয়ানাথ, শুধু শুধু এত কাণ্ড কেন করালে বলতো? সুদূর কচ্ছ অবধি আমায় হস্ত প্রসারণ করতে হল, আর তোমায়ও টেনে নিয়ে আসতে হল এই স্থানে। সাধন-দেহ পূর্ণরূপে শুদ্ধ না ক'রে তোমার গুরু তোমায় সিদ্ধাই দিয়ে বসেছিলেন, তা তুমি ধারণ করতে পারোনি। শুধু তাই নয়, অপক্ক আধারে শক্তি আরোপিত হওয়ার ফলে তীব্র আত্মম্ভরিতা পেয়ে বসেছিল তোমায়। আজ তার মূল উৎপাটিত হয়েছে এবং তোমার সবটা বিভূতি আমি আকর্ষণ করে নিয়েছি। ভালই হয়েছে দয়ানাথ। তোমার সাধনপথের বড় একটি কাঁটা খসে পড়লো। এবার থেকে শুদ্ধতর মন নিয়ে শুরু ক'র তোমার নূতন তপস্যা।"

অতঃপর দয়ানাথ একান্তভাবে গোরখনাথের শরণ নেন, সোৎসাহে নাথযোগের সাধন প্রণালী গ্রহণ করেন। কর্ণবেধসহ নাদ-সিঙ্গা-সেলী ধারণ করাইয়া গোরখনাথ তাঁহাকে উচ্চতর যোগতত্ত্ব শিক্ষা দেন, তপস্যার জন্য আবার প্রেরণ করেন ধিনোধরের পর্ব্বত গুহায়।

সাধক গোপীচাঁদের পথ এবার নিষ্কণ্টক। শান্তিময় পরিবেশে অড় পর্ব্বতের নিভৃত গুহায় শুরু করেন তিনি শেষ পর্য্যায়ের যোগসাধনা, শক্তিধর গুরু গোরখনাথের আশীর্ব্বাদে হন আপ্তকাম।

শিবস্বরূপ গোরখনাথের আচার্য্যজীবনের এক মহত্তর অধ্যায় উন্মুক্ত হয় এই সময় হইতে। স্থূল ও সিদ্ধদেহে সারা উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে তিনি বিচরণ করিতে থাকেন, উচ্চকোটির সাধকেরা ধন্য হয় তাঁহার কৃপায়।

মুমুক্ষু জাঠ্ রণ্ঝা এক সময়ে প্রভু গোরখনাথের শরণ নেন, মিনতি জানান্ যোগসাধনা ও সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য। এ সময়ে তাঁহাকে সতর্ক ক'রার জন্য যোগীবর যে কথাগুলি বলেন,[১] সাধনেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেরই তাহা চিরস্মরণীয়। তিনি বলেন, "বৎস, জেনে রেখো, আমাদের নাথযোগসাধনায় যোগ্যতা লাভ করা বড় কঠিন। শুধু অর্দ্ধনগ্ন হয়ে, জটার ভার মাথায় নিয়ে. ভিক্ষে ক'রে বেড়ালেই কি যোগ হয়? বুকের মাঝে আগে জ্বালিয়ে নিতে হবে বিশ্বাসের জ্বলন্ত আগুন—আর এই আগুনই সাধককে সতত এগিয়ে নিয়ে যাবে তার কৃচ্ছ্র সাধনের পথে, শিব-সাযুজ্য ও পরম প্রাপ্তিব পথে। দেহ মনের চরম নির্য্যাতন ও লাঞ্ছনা হাসিমুখে তাকে সইতে হবে, মৃত্যুকে ভালবাসতে হবে—তবেই তো মিল্‌বে সত্যকার যোগ। আসলে এই যোগ হচ্ছে—বেঁচে থেকেও মরে যাওয়া। সাধকের মনের সূক্ষ্মতম ইচ্ছার বিলয় ঘটবে, আর মনের হবে বিয়োগ। তবেই না হবে মহামনের সঙ্গে, পরমশিবের সঙ্গে, যোগ স্থাপন। বৎস, এই ভঙ্গুর স্বল্পজীবী দেহটিকে বাজাতে হবে একতারার মত, আর তাতে ফুটিয়ে তুলতে হবে—নেতি নেতি'র এক অনাদ্যন্ত সুর। সাধকের সমগ্র জীবন ও সমগ্র সত্তাকে মিশিয়ে দিতে হবে একটি বিন্দুর ভেতর। তা'হলে তুমি বুঝতে পারছো—এই যোগসাধন নিয়ে কখনো ছেলে-খেলা করা চলে না। আরো একটা কথা জেনে রাখবে—আমাদের এই তুচ্ছ, রক্তমাংসময় দেহের মধ্যে নিহিত রয়েছে ভগবানের মহাধাম। তাই এই দেহের সাধনার ভেতর দিয়েই সম্ভাবিত ক'রতে হবে তাঁর জ্যোতির্ম্ময় মহাপ্রকাশ!"

গোরখনাথ মূলত শৈবমার্গী মহাযোগী। নাথযোগীদের সাধনার প্রধান লক্ষ্য হইতেছে শিবত্বলাভ করা, মহেশ্বর পর্য্যায়ে উন্নীত হওয়া। আর এই দেবাদিদেব মহেশ্বরের স্বরূপ হইতেছে অবিনাশীত্ব—অমরত্ব। গোরখনাথ তাই চাহিয়াছিলেন, নাথসাধকের লক্ষ্য হোক্ ইষ্টের স্বরূপ

[১] ইণ্ডিয়ান অ্যান্টিকুয়েরিজ্, ১৯২১, হির্ রন্ঝা—পৃঃ ৩২

অর্জ্জন—জীবন্মুক্তি ও পরামুক্তির মধ্য দিয়া মহেশ্বরের চিরন্তন সত্তায় সে স্থিতিলাভ করুক, পরমশিবে হোক প্রতিষ্ঠিত।[১]

লক্ষ্য তো স্থির হইল, কিন্তু এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর পন্থাটি কি? কোন্ সাধনসোপান বাহিয়া নাথযোগী তাঁহার চরম লক্ষ্য, পরম শিবত্বে, গিয়া পৌঁছিবে? চিত্তবৃত্তির নিরোধ দ্বারা রাজযোগের সাধন সাধারণ মানুষের পক্ষে সহজসাধ্য নয়। মন্ত্রযোগের দুরূহতাও সুবিদিত। তাই নাথধর্ম্মের নেতারা জোর দিলেন বিন্দুজয় ও বায়ুজয় পদ্ধতির উপর এবং হঠযোগকেই স্থাপন করিলেন সাধনার অতি প্রয়োজনীয় প্রাথমিক সোপানরূপে।

কিন্তু গোরখনাথের যোগপন্থা যে ভারতীয় ঐতিহ্যের ও পরম্পরাগত যোগপন্থার অনুসারী তাহাতে সন্দেহ নাই। বিন্দুধারণ, বায়ুনিরোধ ও মনের বিলয়—এই ছিল তাঁহার যোগসাধনের মূল কথা। 'হঠযোগ প্রদীপিকা'য় গোরখবাক্যের উদ্ধৃতিতে রহিয়াছে—

মন থির তো পবন থির
পবন থির তো বিন্দু থির।
বিন্দু থির তো কন্ধ থির
বলে গোরখদেব সকল থির।

এই স্থির অবস্থায় ভাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের কোন প্রকার পার্থক্যবোধ থাকে না, যোগী সাধক প্রাপ্ত হয় সহজ সমাধির দুর্লভ অধ্যাত্মসম্পদ। গোরখনাথের এই যোগাদর্শ গোড়ার দিকে হঠযোগের উপর নির্ভরশীল হইলেও ইহার পরিণতিতে কিন্তু আসিয়াছে রাজযোগেরই নিগূঢ়সাধন। 'হঠযোগ প্রদীপিকা'র ভণিতায় আগে হইতেই সাধনকামী নাগযোগীদের সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে—কেবলম্ রাজযোগায় হঠবিদ্যা উপদিস্যতে, অর্থাৎ, হঠযোগবিদ্যা তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে রাজযোগেরই অনুশীলনের জন্য।

নাথসিদ্ধেরা জীবন্মুক্তিকে পরম কাম্য বলিয়া মনে করেন, আর এই

১ অবস্কিওর্ রিলিজিয়াস্ কাল্টস্ : ডঃ দাসগুপ্ত—পৃঃ ২২১

মুক্তি তাঁহারা উপভোগ করেন রূপান্তরিত ও অবিনশ্বর দিব্যদেহে। সে দেহ 'অশুদ্ধ মায়া'-দ্বারা অপবিত্রীকৃত নয়, বিশুদ্ধ ক্রিয়াশক্তিতে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া সে দেহ সূক্ষ্মতর স্তরসমূহ অতিক্রম করিতে করিতে অবশেষে উপনীত হয় পরামুক্তিতে। এই অবস্থায় সিদ্ধদেহ যোগী মুক্তিকামী সাধকমাত্রকেই অশেষভাবে সাহায্য করেন, গুরুরূপে বিতরণ করেন অধ্যাত্ম-কল্যাণ।

গোরখনাথের সিদ্ধসিদ্ধান্ত পদ্ধতি ও গোরখ সংহিতায় আমরা নাথযোগীদের পূর্ণ পরিণতির বিশদ তথ্যাদি পাই। এই পরিণতির প্রধান কথা,—জীব শিবে পরিণত হইবে, আর তাহা সম্ভব হইবে কায়াসিদ্ধি ও অমরত্ব অর্জনের মধ্য দিয়া।[১]

"সিদ্ধদেহ যোগী 'জীবন্মুক্ত', তিনি ইহজগতে বাস করিয়াও নির্লিপ্ত। তিনি মৃত্যু ব্যতীতই 'পরামুক্ত' হইতে পারেন অর্থাৎ তাঁহার শুদ্ধদেহ লইয়াই জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইতে পারেন। ইহা কায়িক মৃত্যু নহে, ইহা গুরুর উপদেশে স্থূলদেহেরই পরিবর্ত্তন এবং সেই দেহেই ইহজগৎ ত্যাগ। যে মৃত হয় সে মুক্ত নহে, ইহাই সিদ্ধমত। পরামুক্তের 'দেহপাত' হয় না, ইহাই বৈশিষ্ট্য।......মৃত্যুঞ্জয়কামী যোগী গুরুর উপদেশে অশুদ্ধমায়ার দেহকেই শুদ্ধমায়ার দেহে পরিণত করেন, তৎফলে যে দেহ হয় তাহা 'প্রণবতনু' (ওঁকারদেহ), ইহা অমৃতপানে চিরসঞ্জীবিত থাকে। 'প্রণবতনু'ধারী যোগীই 'জীবন্মুক্ত', অশুদ্ধ মায়িক জগতে বাস করিলেও তাঁহার সম্পর্ক শুদ্ধস্তরের সহিত।"[২]

এই অবস্থার অপূর্ব্ব বর্ণনা পাই নাথযোগীর এক প্রসিদ্ধ বাণীতে—

জীবিতা মরিবা মরি জীয়বা
অমী মহারস ভরি ভরি পিয়বা

[১] জীব থই শিব হৈবা প্রাণী—গোরখ বাণী : ডঃ বড়থোয়াল।
[২] ডঃ কল্যাণী প্রামাণিক : নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস—পৃঃ ৩০৩

নিজের সাধন জীবনে অত্যধিক কৃচ্ছ্র ও কঠোর তপস্যা অনুষ্ঠান করিলেও গোরখনাথ তাঁহার ভক্ত-সাধকদের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন সাধনার মধ্যপথ। তাঁহার মতে, মানবদেহ মুক্তির সহায়ক, মানবের ইহা শত্রু নয়—পরম বন্ধু। তাই এই দেহকে অত্যধিক সুখ বা দুঃখ দিবার দরকার নাই। এই প্রসঙ্গে এক বাণীতে তিনি বলিয়াছেন—

কন্দর্প রূপ কায়াকা মণ্ডণ
অবির্থাকাই উলীচৌ।
গোরখ কহৈ সুনৌ রে ভৌদূ
অরণ্ড অমী কত সীচৌ।

—জীবের কায়া তো স্বভাবতঃই কন্দর্পের মত সুন্দর, সেটিকে বৃথা মণ্ডন ক'রে, উল্টো ক'রে কি লাভ হবে? গোরখ কহেন—হে মূর্খ, কেন অমৃত ধারা দিয়ে অরণ্ড গাছকে শুধু শুধু করছো সিঞ্চন?

গোরখনাথের প্রবর্ত্তিত সাধনার এই মধ্যপন্থা সাধারণ মানুষের পক্ষে কল্যাণকর হয়, অধ্যাত্মসাধনা তাহাদের কাছে হইয়া উঠে সহজসাধ্য। শুধু তাহাই নয়, তাঁহার ধর্ম্মান্দোলনে কোনদিনই তিনি ব্রাহ্মণ শূদ্র ধনী দরিদ্রের বিচার করেন নাই। অবাধ উদার কল্যাণ-বোধে উদ্দীপ্ত হইয়া তাঁহার ধর্ম্মীয় আদর্শ ও সাধনপন্থা ছড়াইয়া পড়িয়াছে সমাজের সর্ব্বস্তরে। যোগীশ্বর আদিনাথকে শিবরূপে জনজীবনের পুরোভাগে তিনি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন এবং লক্ষ লক্ষ ভক্ত ও সাধক ইহার ফলে উপকৃত হইয়াছেন। সমকালীন সমাজ জীবনের বহুতর কালিমাও দূরীভূত হইয়াছে তাঁহার শৈব সাধনার প্রভাবে।[১]

যোগ সাধনার গগনচুম্বী শিখরে সিদ্ধাচার্য্য গোরখনাথ সদা সমাসীন, অত্যাশ্চর্য্য যোগবিভূতিসমূহও সম্পূর্ণরূপে হইয়াছে তাঁহার করায়ত্ত। সারা ভারতের দিকে দিকে যখনই তিনি ভক্তগণসহ পরিভ্রমণ করেন,

১ আদিনাথ—হিজ্ এটার্ন্যাল আইডিয়েল: মোহন্ত দিগ্বিজয় নাথ—নদার্ন ইণ্ডিয়া পত্রিকা, ৩১ ডিসেম্বর-১৯৬৫

শিবকল্প মহাযোগীরূপে হন সংপূজিত—শত শত প্রতিভাধর সাধক তাঁহার চরণতলে আসিয়া ভক্তিভরে আশ্রয় নেয়।

মৎসেন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল,— নাথধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ সংবাহকরূপে গোরখ-নাথ বিরাজমান থাকিবেন, উদ্‌যাপন করিবেন ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট জনকল্যাণের মহান ব্রত। গুরুর সে ইচ্ছা গোরখনাথ পূর্ণ করিয়াছেন, লক্ষ লক্ষ নরনারীর বুকে জাগাইয়া তুলিয়াছেন মুমুক্ষার আকুতি, অজস্র সাধকের জীবনে জ্বালাইয়া দিয়াছেন যোগসিদ্ধির অনির্ব্বাণ শিখা। এবার তাঁহার নিজ জীবনে আসিয়াছে নাথত্বের পূর্ণতম বিকাশের পালা। সেই বিকাশকে সম্ভাবিত করার জন্য, পরম শিবত্বে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য, এবার যে তাঁহাকে সর্ব্বস্ব পণ করিতে হইবে।

গোরখপুরের নিভৃত সাধন গুহাটিতে বসিয়া সেদিন তিনি এই কথাটিই বারবার ভাবিতেছিলেন। কিন্তু সাধনার এই শ্রেষ্ঠতম স্তরে পৌঁছিতে হইলে গুরুর উপস্থিতি এবং গুরুর সাহায্য ছাড়া তো চলে না। বহুবৎসর পরে আজ তাই শ্রীগুরুর চরণ দর্শনের জন্য তিনি বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন।

মৎস্যেন্দ্রনাথের সহিত গোরখনাথের শেষ সাক্ষাৎ হইয়াছিল নেপালে। তারপর গুরুর নির্দ্দেশে দীর্ঘকাল তিনি নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন এবং অনেকদিন উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটে নাই। মৎস্যেন্দ্র এখন কোথায় কিভাবে আছেন তাহা অজ্ঞাত। ভাবিয়া চিন্তিয়া গোরক্ষনাথ শেষটায় নেপালের দিকেই পা বাড়াইলেন।

পশুপতিনাথে পৌঁছিয়াই প্রধান সিদ্ধাচার্য্যদের নিকট তিনি ছুটিয়া গেলেন, জানিয়া নিলেন গুরুর সন্ধান। হিমালয়ের এক দুর্গম গুহায় বসিয়া মৎস্যেন্দ্র এতকাল তপস্যারত ছিলেন। সম্প্রতি নেপালের বাহিরে কোথায় নাকি তিনি আত্মগোপন করিয়া আছেন।

ব্যাকুলহৃদয় গোরখনাথ বারবার সেবকদের প্রশ্ন করেন, "ভাই, তাড়াতাড়ি আমায় বলে দাও, গুরুজী কোথায় কোন্ নিভৃত নিবাসে অবস্থান করছেন। অবিলম্বে তাঁর সাক্ষাৎ যে আমার পাওয়া চাই।"

সেবকদের অনেকেই মহাযোগী গোরখ্‌নাথকে চিনিতে পারিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার প্রশ্নের উত্তর কেহই দিতেছেন না। এক রহস্যময় নীরবতা তাঁহাদের মধ্যে বিরাজমান।

গুরুর অদর্শনে অধীর গোরখনাথ এবার ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। কঠোরস্বরে দৃপ্তভঙ্গীতে কহিলেন, "আমি গোরখনাথ বারবার তোমাদের অনুরোধ জানাচ্ছি—গুরুর সন্ধানটি আমায় শিগ্‌গীর বলে দাও। কিন্তু একি তোমাদের অশিষ্ট আচরণ! মুখের সামান্য একটি কথা বার করতেও এমনতর কার্পণ্য।"

একজন প্রাচীন সেবক-শিষ্য তাড়াতাড়ি সম্মুখে আগাইয়া আসেন। শান্ত দৃঢ়স্বরে কহেন, "যোগীবর, আপনার প্রশ্ন আমরা ঠিকই শুনতে পেয়েছি। কিন্তু এ বিষয়ে কোন সাহায্য করার উপায় আমাদের নেই। গুরুজী মৎস্যেন্দ্রনাথ তাঁর একটি বিশেষ সঙ্কল্প নিয়ে সুদূর অঞ্চলের এক গিরি গুহায় গিয়েছেন তপস্যা করতে। তাঁর সন্ধান বলে দিয়ে, সেখানকার ভীড় বাড়িয়ে, আমরা তো তাঁর কাজে অযথা বিঘ্ন উৎপাদন করতে পারিনে।"

"প্রাচীন হয়ে অর্ব্বাচীনেরই মত কথা আপনি বলছেন! প্রাণ-প্রিয় শিষ্য গোরখনাথকে দেখলে মৎস্যেন্দ্রনাথের আরব্ধ কর্ম্মে ঘটবে বিঘ্ন?"—ক্রুদ্ধস্বরে চীৎকার করিয়া উঠেন গোরখনাথ।

একটি নবীন শিষ্যের আর ধৈর্য্য রহিলনা। উত্তরে কঠোর ভাষায় বলিলেন, "শুনুন তবে গোরখনাথ, আপনি গুরুজীর মহা অন্তরঙ্গ বলে যতই দাবী করুন না কেন, আপনাকে তাঁর তপস্যা-স্থানে যেতে দেওয়া হবে না। হ্যাঁ, আরো একটা কথা। মহাকৌল মৎস্যেন্দ্রনাথ নেপালের শ্রেষ্ঠ সিদ্ধাচার্য্য। অবলোকিতেশ্বর জ্ঞানে দেশের সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা ক'রে, পূজা ক'রে। তাঁর স্থায়ী সাধন আসন এখানে পাতা রয়েছে—আর তাঁর তপস্যার মঙ্গলজ্যোতি সদা বিকীর্ণ হচ্ছে এই পবিত্র গুহা থেকে। চেঁচামেচি করে এখানকার শান্তি ভঙ্গ করবেন না যেন।"

এবার ক্রোধে ফাটিয়া পড়েন মহাযোগী গোরখনাথ, গর্জ্জিয়া উঠিয়া

বলেন, "মূর্খ ! তুমি তো জানোনা, শিষ্য-গোরখনাথ যেখানে উপেক্ষিত, মৎস্যেন্দ্রনাথের কল্যাণময় হস্ত সেখানে খুঁজে পাওয়া যায় না। শোন তবে, আমি আজ এখানে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করছি—গুরু মহারাজ এখানে উপস্থিত না হওয়া অবধি নেপালের আকাশে ক্ষীণতম একটুকরো মেঘও ভেসে আসবেনা। সারা দেশের উপর পতিত হবে অনাবৃষ্টির অভিশাপ ! জলাভাবে ঘরে ঘরে উঠবে হাহাকার !"

রোষকষায়িত নয়নে আকাশের দিকে একটিবার দৃষ্টিপাত করিয়া সিন্দুরচর্চ্চিত ত্রিশূলটি গোরখনাথ মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া দেন। তৎক্ষণাৎ সেখানে সর্ব্বসমক্ষে উদ্‌ঘাটিত হয় এক অলৌকিক দৃশ্য।

ত্রিশূলবিদ্ধ স্থান হইতে নির্গত হয় লেলিহান অগ্নিশিখা, তড়িৎবেগে ধাইয়া চলে ঊর্দ্ধাকাশে। নেপালের পাহাড় ও উপত্যকার উপর দিয়া চক্রাকারে ঘুরিয়া দূর দিগন্তে উহা বিলীন হইয়া যায়।

তখন ঘোর বর্ষাকাল, আষাঢ়ের জলভরা মেঘে সারা গগন ছাইয়া আছে। গোরখনাথের ত্রিশূল-উদ্ভূত ঐ অগ্নিশিখার ইন্দ্রজালস্পর্শে মেঘপুঞ্জ স্বল্পকাল মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়। উপস্থিত সাধকদল বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে এই অদ্ভুত দৃশ্যের দিকে চাহিয়া থাকেন।

এবার গোরখনাথ নিকটস্থ এক পর্ব্বতগুহায় প্রবেশ করেন। নূতন করিয়া সুকঠোর পঞ্চতপা অনুষ্ঠানের এক সঙ্কল্প তাঁহাকে পাইয়া বসে। হোমানল জ্বালাইয়া মহাযোগী নিমগ্ন হন গভীর তপস্যায়।

দীর্ঘ বারো বৎসরকাল গোরখনাথ এই গুহার অভ্যন্তরে অবস্থান করেন এবং এই বারোটি বৎসর নেপালের জনজীবনে আগত হয় এক প্রকাণ্ড অভিশাপরূপে। ভোগমতীর উচ্ছল স্রোতধারা ক্রমে পরিণত হয় একটি শীর্ণ জলরেখায়। পার্ব্বত্য ঝরণাসমূহ একেবারে শুষ্ক, কূপে বা সরোবরে এক ফোঁটা জলের চিহ্ন দেখা যায় না। ক্ষেতের সমস্ত ফসল অকালে ঝরিয়া পড়ে, ফসলের বীজ রোপণ করিতে না পারিয়া বিপন্ন চাষীরা দুই চোখে দেখে অন্ধকার।

যোগীবর গোরখনাথের ক্রোধবহ্নির ফলেই এই দুর্দৈব,—একথা দাবাদলের মত ছড়াইয়া পড়ে দেশের সর্ব্ব অঞ্চলে। লোকের মুখে মুখে এই কাহিনী হয় পল্লবিত। অনেকে সভয়ে বলাবলি করিতে থাকে, 'ক্রুদ্ধ গোরখনাথ বারো বৎসরের জন্য ধ্যান গুহায় উপবিষ্ট হয়েছেন, মেঘলোকের দুরন্ত সপ্তনাগিনীকে এনেছেন স্ববশে, আর এই নাগিনীদের কুণ্ডলীর উপর মহাসাধক স্থাপন করেছেন তাঁর ধ্যানাসন। গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ নেপালে ফিরে না এলে, এই নাগিনীদের মুক্ত না করলে, অনাবৃষ্টির অভিশাপ দূর হবে না।[১] সারা নেপাল পুড়ে হবে ছারখার।

অনন্যোপায় হইয়া প্রজারা এবার দলে দলে নেপাল-রাজ বড়দেবের কাছে গিয়া উপস্থিত হয়। আর্ত্তকণ্ঠে তাহাদের আবেদন জানায়, "মহারাজ, আপনি যে কোন উপায়ে গোরখনাথজীর গুরু মৎস্যেন্দ্র-প্রভুকে তাঁর নিভৃত বাস থেকে ফিরিয়ে আনুন। তাঁকে দিয়ে গোরখনাথজীকে শান্ত করুন। নইলে তাঁর রোষ ও অভিশাপের কবল থেকে রাজ্যের কারো নিস্তার নেই।"

রাজার বৃদ্ধ পিতা মৎস্যেন্দ্রনাথের অন্যতম কৃপাপ্রাপ্ত শিষ্য। এই সঙ্কটে তাঁহারও স্মরণ নেওয়া হইল। আর পরামর্শের জন্য ডাকা হইল রাজ্যের প্রধান আচার্য্যকে। ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি কহিলেন, "মহারাজ, মৎস্যেন্দ্রপ্রভু নিভৃত বাসের সঙ্কল্প নিয়েছেন, এসময়ে তাঁর কাছে সরাসরি আমাদের যাওয়ায় বিপদ আছে। তাছাড়া, তাঁর তপস্যাস্থান কপোতল পর্ব্বতের চারধারে তিনি 'বন্ধ' দিয়ে রেখেছেন। সে বেষ্টনী ডিঙিয়ে যাবার কারুর উপায় নেই। আমি বলি কি, আপনারা সর্ব্বাগ্রে বাঘাম্বর জ্ঞানডাকিনীর পূজা দিয়ে তাঁকে প্রসন্ন করুন, তবে আর সেখানে যেতে কোন ভয় থাকবে না।"

আচার্য্যের নির্দ্দেশমত কাজ করা হয় এবং পূজা হোম সমাপনের পর তাঁহাকে সঙ্গে নিয়া রাজা বড়দেবের পিতা উপস্থিত হন কপোতলে। গোরখনাথের রোষের কথা, বার বৎসর নেপালবাসীর অবর্ণনীয় দুঃখ-

১ রাইট : হিস্টোরি অব নেপাল, পৃ ১৪০-৪৪

কষ্টের কথা, সমস্ত কিছু তাঁহাকে জানানো হয়। করুণার্দ্র মৎস্যেন্দ্রনাথ আর কালবিলম্ব না করিয়া ভক্তগণসহ নেপালে ফিরিয়া আসেন।

নেপালের মাটিতে তিনি পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে ঘটিতে দেখা যায় বিস্ময়কর নৈসর্গিক পরিবর্ত্তন! গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দহনে লোকে ত্রাহি ত্রাহি রব তুলিতেছে। এ সময়ে আকাশের প্রান্তে ধীরে ধীরে জড়ো হইতে থাকে পুঞ্জ পুঞ্জ ঘনকৃষ্ণ মেঘ। স্বল্পকাল মধ্যে শুরু হয় প্রবল বর্ষণ, শীর্ণকায়া ভোগমতীতে আবার নামিয়া আসে দুর্ব্বার জলস্রোত, পাহাড়ী ঝর্ণার বুকে জাগে প্লাবনের উচ্ছ্বলতা, ঊষর ক্ষেত খামার স্বর্গলোকের কোন্ যাদুকরের অলৌকিক স্পর্শে সরস হইয়া উঠে। শান্তি ও স্নিগ্ধতার রসে অভিসিঞ্চিত হয় সমগ্র দেশ।

বর্ষণস্নাত পাহাড়ের গা বাহিয়া স্রোতধারা নামিয়া আসিতেছে, গোরখনাথের ধ্যানগুহা হইয়াছে জলে জলময়। বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া যোগীবর হঠাৎ নয়ন উন্মীলন করিলেন। অন্তরে তাঁহার অপার বিস্ময়। একি অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার! এমনটি তো হওয়ার কথা নয়! ক্রোধভরে তিনি সঙ্কল্পবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন,—অনাবৃষ্টির অভিশাপ নেপালের ললাটে বিরাজ করিবে বারো বৎসর। তাহার অন্যথা তো কখনো হইবার নয়। প্রকৃতি তাঁহার কিঙ্করী সদৃশা, যে আদেশ তিনি একবার দিয়াছেন তাহা সে অমান্য করিবে কোন্ সাহসে?

ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ চমকিয়া উঠেন গোরখনাথ। সে কি? তবে কি এমন কোন মহাযোগীর এখানে আগমন হইয়াছে প্রকৃতিবশীত্বের দিক দিয়া যিনি তাঁহার অপেক্ষা বেশী শক্তিমান?

প্রকৃত ব্যাপার কি জানিবার জন্য তিনি ধ্যানস্থ হন, মানসপটে অমনি ভাসিয়া উঠে গুরুজী মৎস্যেন্দ্রনাথের মহিমময় মূর্ত্তিখানি। তৎক্ষণাৎ উপলব্ধিতে আসিয়া যায়—কৃপা করিয়া গুরু মহারাজ নেপালে আজ আবির্ভূত হইয়াছেন, সারা দেশকে বাঁচানোর জন্য ছাড়িয়া আসিয়াছেন কপোতল পাহাড়ের নিভৃতি। মহাশক্তিধর গুরুই তবে গোরখনাথের

অনাবৃষ্টির এই 'বন্ধ' কাটিয়া দিয়া মুক্ত করিয়াছেন মেঘলোকের স্নিগ্ধ জলধারা।[১]

গুরু আসিয়া সম্মুখে দাঁড়ান, স্নেহপূর্ণ স্বরে কহেন "বৎস, তোমার ব্যাকুলতার জন্যই আমায় এভাবে ছুটে আসতে হলো। তোমার প্রাণের প্রার্থনা আমি জানি। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার সর্ব্বাভীষ্ট এবার পূর্ণ হোক।"

"প্রভু, আপনার অদর্শনে অধীর হয়ে এ রাজ্যের অধিবাসীদের কত কষ্টই না আমি দিয়েছি। কৃপা ক'রে আমায় ক্ষমা করুন।"—করজোড়ে নিবেদন করেন গোরখনাথ।

"বৎস, আমি যে জানি, এত সব কিছু ঘটেছে পরমশিবেরই ইচ্ছায়, তোমার নূতনতর পঞ্চতপা সাধনের ভেতর দিয়ে আমার আশ্রিত দেশ নেপালের ভাগ্যেও ঘটে গেল দীর্ঘদিনব্যাপী এক শোধন ক্রিয়া। যে গ্লানি, যে পাপ এ রাজ্যে জমেছিলো, তোমার মত রুদ্রপ্রতিম সাধকের রোষে তা বিনষ্ট হলো। এবার এ অঞ্চলে দুঃখ দহনের ভেতর দিয়ে এসেছে পরম কল্যাণ। এখন থেকে এই পার্ব্বত্য রাজ্য সংরক্ষিত থাকবে শুভঙ্কর দেবশক্তি দ্বারা।"

"আপনার অশেষ কৃপা, প্রভু।"

"তুমি যে আমার সন্ধানে এখানে আসবে, এ আমি জানতাম, বৎস। কপোতল পর্ব্বতের নিভৃতিতে বসে যে পরমবস্তু তোমার জন্য আমি

---

[১] যোগবলে অনাবৃষ্টি নিবারণ করিয়া মহাকৌল মৎস্যেন্দ্রনাথ জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে নেপালবাসীদের হৃদয় জয় করেন। নেপালের বৌদ্ধদের দৃষ্টিতে তিনি প্রভু অবলোকিতেশ্বর, আর সেখানকার হিন্দুরা তাঁহাকে পূজা ক'রে নেপালের রক্ষক-দেবতা জ্ঞানে। আজ অবধি নেপালীরা তাঁহার উদ্ধারণ-লীলার স্মৃতিটি শ্রদ্ধাভরে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। প্রতিবৎসর রাজধানী কাঠমণ্ডুতে এক জনপ্রিয় শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়, শৈব সন্ন্যাসীরা মৎস্যেন্দ্রের একটি তিনফুট উঁচু রক্তবর্ণ প্রতিমা সাড়ম্বরে বহন করেন, রাণা এবং সর্দ্দারেরা এই দেবমূর্ত্তির অনুগমন করেন আর রাজতরবারী নিবেদন করা হয় বিগ্রহের পদতলে। এই শোভাযাত্রাটি নেপালের বর্ষাঋতু ও সুখ সমৃদ্ধির দ্যোতক, রাজ্যের ধর্ম্মবৎসরেরও সূচনা এই দিনটি হইতে। দ্রঃ ল্যাণ্ডন : নেপাল—ভল্যু ১, পৃ ২১০-১১

রক্ষা করে আসছি, আজ তা নিঃশেষে তোমায় দিয়ে দেবার সময় হয়েছে। তবে, তার আগে তোমারও কিছু করবার আছে।

"আজ্ঞা করুন, প্রভু।

"কৌল সাধনার মহাসিদ্ধি-শিখরে এবার তুমি পৌঁছুবে, শিবতনু লাভ ক'রে পূর্ণপ্রজ্ঞায় ও নাথত্বে হবে তোমার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। কিন্তু তার আগে আমার প্রদত্ত কয়েকটি নিগূঢ় সাধন ক্রিয়া তোমায় সম্পন্ন ক'রে নিতে হবে, বৎস।"

গোরখনাথ আবার ধ্যানগুহায় গিয়া প্রবেশ করেন, গুরুর নির্দ্দেশিত ক্রিয়া সমাপ্ত কবার পরই হন সমাধিস্থ।

পরদিন সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইতেই মহাযোগী দেখিলেন, অন্তরঙ্গ পার্ষদদেব সঙ্গে গিয়া গুরু মহারাজ তাঁহার সাধনগুহাব সম্মুখে স্মিতহাস্যে দাঁড়াইয়া আছেন।

প্রিয়তম শিষ্য আজ পূর্ণমনস্কাম। প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপনের পর সবাইব উদ্দেশ্যে মৎস্যেন্দ্রনাথ কহিলেন, "আজ আমাদের এক পরম শুভদিন। নাথ-যোগসিদ্ধির যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ পরম্পরাক্রমে আমার কাছে এযাবৎ গচ্ছিত ছিল, গোবখনাথকে তা আমি দান করেছি। পূর্ণ সামরস্য, পূর্ণ-প্রজ্ঞা ও পূর্ণ অদ্বৈতবোধে সে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, লাভ করেছে নাথযোগীদের বহু আকাঙ্ক্ষিত সহজ সমাধি। বিশ্বসৃষ্টির সকল কিছুর সাথে পূর্ণরূপে সে হয়ে গিয়েছে একাত্মক। এই সহজ সমাধির কিছুটা আভাষ আমাব 'অকূলবীর তন্ত্রে' তোমরা পেয়েছো। এই পরম অবস্থা লাভ ক'রে গোবখনাথ আজ হয়েছে—

স্বয়ং দেবী, স্বয়ং দেবঃ স্বয়ং শিষ্যঃ স্বয়ং গুরুঃ।
স্বয়ং ধ্যানম্ স্বয়ং ধ্যাতা স্বয়ং সর্ব্বত্র দেবতাঃ।"[১]

চরণে প্রণত গোরখনাথকে বুকের কাছে গুরু টানিয়া নিলেন, মৃদুস্বরে কহিলেন, "বৎস, এই চরম উপলব্ধির পর তো নরদেহে আর বেশীদিন

১ কৌলজ্ঞাননির্ণয়ঃ মৎস্যেন্দ্রনাথ—সম্পাদনাঃ ডঃ প্রবোধ বাগচী, কলিকাতা সংস্কৃত সিরিজ নং ৩. অকূল, ক, পৃঃ ২৬

থাকা সম্ভব নয়। এখন থেকে সর্ব্ব অস্তিত্ব তোমার থাকবে শিবসত্তায় বিধৃত, অল্পকালমধ্যে তোমার তনু হবে শিবসত্তায় রূপায়িত। সিদ্ধদেহ নাথযোগীর কোন কর্ম্ম থাকে না, বৎস, শুধু মুমুক্ষু ও ভক্ত সাধকদের কৃপা বিতরণ ক'রা ছাড়া।"

"কিন্তু প্রভু, আপনি এখন অবস্থান করবেন কোথায়?"

"বৎস, নাথত্বের পরম্পরা রক্ষার এক গুরু দায়িত্ব, আমার ছিল। আজ সে দায়িত্ব তোমায় আমি অর্পণ করলুম, আমার ছুটি হয়ে গেল। এবার আমার অপ্রকট হতে হবে। তোমার প্রতি নির্দ্দেশ রইলো, এখান থেকে সরাসরি তুমি তোমার প্রথম সিদ্ধিস্থান গোরখপুরেই ফিরে যাও। সেই পুণ্য-স্থানকে কেন্দ্র ক'রে সিদ্ধ দেহে বিশ্বের সর্ব্বস্থানে স্বেচ্ছামত বিচরণ ক'র, সিদ্ধিকামী যোগী সাধকদের ক'র সাহায্য দান। এই ঐশী কর্ম্ম তোমায় উদ্‌যাপন ক'রতে হবে বারো বৎসর, তারপর স্বেচ্ছামত ছেদ টেনে দিও তোমার সিদ্ধাচার্য্য জীবনে।"

উপস্থিত ভক্ত সাধকেরা অবাক বিস্ময়ে দুই মহাযোগীর দিকে চাহিয়া আছেন, শুনিতেছেন অমৃতময় কথোপকথন। তাঁহাদের দিকে ফিরিয়া মৎস্যেন্দ্রনাথ কহিলেন, "গোরখনাথের এই সিদ্ধগুহাটি[১] শুধু নেপালবাসীরই পরম পবিত্র তীর্থরূপে বিরাজ করবেনা, সারা ভারতের মুক্তিকামী নরনারীর কাছেও এটি হবে এক মুক্তিপ্রদ মহাজাগ্রত তীর্থ।[২] শুধু তাই নয়, উত্তরকালে আমার প্রিয়তম শিষ্য গোরখনাথের নাম অনুসারে নেপাল রাজ্যের অধিবাসীরাও নিজেদের পরিচয় দেবে গোর্খাজাতি বলে।[২]

[১] পশ্চিম নেপালে, গোরখনাথের সিদ্ধিস্থান এই গুহার অভ্যন্তরে আজো সংরক্ষিত রহিয়াছে গোরখনাথের ত্রিশূল, শিঙ্গা, জীর্ণ আসন, শঙ্খ ও পিতলের দীপাধার। গুহার পাশেই প্রতিষ্ঠিত প্রভু গোরখনাথের এক নাতিবৃহৎ মনোরম মন্দির, শৈব যোগীদের এটি অবশ্য দর্শনীয়, গুর্খাজাতির কাছে এই মন্দির এক অক্ষয় সম্পদ। বরেণ্য মহাযোগীর এই নিভৃত তপস্যাস্থলের উপর দিয়া কুলুকুলু রবে বহিয়া চলিয়াছে এক ক্ষুদ্রকায়া পার্ব্বত্য নদী।

[২] ল্যাণ্ডন: নেপাল—ভলু ১, পৃঃ ৬৬

কথা কয়টি শেষ হইতে না হইতেই মহাকৌল মৎস্যেন্দ্রনাথের দেহটি পরিণত হয় একটি জ্যোতির্ম্ময় পিণ্ডে, উর্দ্ধাকাশে উত্থিত হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে কোথায় তাহা অদৃশ্য হইয়া যায়।

মৎস্যেন্দ্রের আদেশে গোরখনাথ শেষবারের মত গোরখপুরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। গুরুকৃপায় মহাসাধক এখন আপ্তকাম, নাথত্বে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত। অধ্যাত্মজীবনের চাওয়া পাওয়ার পালা চিরতরে চুকিয়া গিয়াছে—এখন কেবল তাঁহার দেওয়ার পালা। কৃপাঘন, মহিমময় মূর্ত্তিতে সাধন-মন্দিরে তিনি সমাসীন থাকেন, দিনের পর দিন সেখানে আসিয়া জড়ো হয় নাথযোগী ও সিদ্ধিলাভেচ্ছু সাধকেরা। কখনো গোরখনাথের সামান্য একটু দর্শন বা স্পর্শনে, কখনো বা নিগূঢ় সাধন-নির্দ্দেশের ফলে, এই মুমুক্ষু দর্শনার্থীরা হইতেছে রূপান্তরিত। শুধু গোরখপুরে সমাগত সাধকদের মধ্যেই নয়, ভারতের প্রতিটি অঞ্চলে, কখনো সুদূর উত্তর ও মধ্যপ্রদেশে, কখনো পাঞ্জাবে রাজপুতানায়, কখনো বা দাক্ষিণাত্যে মহাযোগীর কল্যাণহস্ত হইতেছে প্রসারিত। সিদ্ধির তোরণদ্বারে দণ্ডায়মান কত সাধক ধন্য হইতেছে গোরখ-প্রভুর অলৌকিক আবির্ভাবে, রূপান্তরিত হইতেছে তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় সিদ্ধদেহের দর্শনলাভে।

এই অপরূপ কৃপালীলা অনুষ্ঠিত হইতে থাকে একাদিক্রমে বারো বৎসর ব্যাপিয়া। তারপর নরলীলা সম্বরণের চিহ্নিত দিবস এবং চিহ্নিত লগ্নটি একদিন আসিয়া পড়ে।

নির্দ্দেশমত আগে হইতেই গোরখপুরের আশ্রমে সমবেত হইয়াছেন মহাযোগীর প্রধান যোগীশিষ্য ও পার্ষদেরা। ইঁহাদের মধ্যে রহিয়াছেন কচ্ছ-ধিনোধরের ধরমনাথ, পাঞ্জাব টিলামঠের লক্ষ্মণনাথ। জরুরী আহ্বান পাইয়া ব্যাকুল হৃদয়ে ছুটিয়া আসিয়াছেন সিদ্ধাচার্য্য দয়ানাথ ও গোপীচাঁদ। মহারাষ্ট্রের গহিনীনাথ এবং বোম্বাইর বিশিষ্টা সাধিকা দেবী-বিমলাঙ্গী নাথও রহিয়াছেন ইঁহাদের মধ্যে।

অন্তরঙ্গ শিষ্যদের সস্নেহে নিকটে আহ্বান করিয়া যোগীবর গোরখনাথ

কহিলেন, "একটা বিশেষ প্রয়োজনে তোমাদের সবাইকে আজ আমি এখানে আহ্বান ক'রে এনেছি। গুরুকৃপার শ্রেষ্ঠ সম্পদ পাবার পরও এই বারো বৎসর জীবদেহে আমি বাস করেছি, গুরুরই নির্দ্দেশে। এবার মরলীলায় ছেদ টানতে হবে। আজই মধ্যরাত্রে এই মন্দিরে আমি অপ্রকট হবো—এ স্থূলদেহের সান্নিধ্য আর তোমরা কখনো পাবে না।"

শিষ্যদের কাছে এ সংবাদ যে মর্ম্মান্তিক। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে গোরখনাথকে তাঁহারা মিনতি জানান এই সঙ্কল্প ত্যাগের জন্য। কিন্তু মহাযোগী তাহাতে কর্ণপাত করেন কই?

স্নেহ-মধুর কণ্ঠে আবার তিনি বলিতে থাকেন, "তোমাদের ভয় নেই, সিদ্ধদেহে আমি অবশ্যই বিরাজমান থাকবো এবং সাধন জীবনের প্রয়োজন অনুযায়ী তোমরা আমার দর্শন পাবে, সাহায্যে পাবে। আর তোমাদের সবার কাছে আমার শেষ অনুরোধ—নাথধর্ম্মের আদর্শ ও শৈব যোগসাধনার নিগূঢ় পদ্ধতিটিকে তোমরা বাঁচিয়ে রেখো। এ দেশের ধর্ম্মজীবন আজ ক্ষয়িষ্ণু হয়ে এসেছে, দেবাদিদেব শিবের উপাসনা প্রচার ক'রে তাকে পুনরুজ্জীবিত ক'রে তোল। সারা ভারতের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে আমার আশ্রিত ও অনুগামী নাথযোগীর দল, গড়ে উঠেছে অজস্র মঠমন্দির। এদের সাহায্য নিয়ে নাথ-যোগসাধনাকে সর্ব্বজনের কল্যাণে দিকে দিকে তোমরা ছড়িয়ে দাও। তোমাদের সবার জন্য রইলো আমার অন্তরের শুভ কামনা ও আশীর্ব্বাদ।"

কথা কয়টি শেষ হইতে না হইতেই মন্দির কক্ষ এক স্বর্গীয় সৌগন্ধে ও স্নিগ্ধতায় ভরিয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায়—যোগীবর গোরখনাথের স্থূল দেহ একটি শুভ্র জ্যোতির্ম্মণ্ডলে পরিণত হইয়া গিয়াছে, আর তাহার মধ্য দিয়া আকারিত হইয়া উঠিতেছে তাঁহার লোকোত্তর সিদ্ধদেহ বা শিবতনু। ক্ষণপরেই সকলের নয়ন সমক্ষে, বাতায়ন পথ দিয়া এই সিদ্ধদেহ ঊর্দ্ধাকাশে কোথায় উধাও হইয়া গেল।

ভক্ত শিষ্যের দল এতক্ষণ বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া এই দৃশ্যের দিকে

নির্নিমেষে চাহিয়া ছিলেন। এবার স্মরণে আসিল গুরু বিচ্ছেদের বাস্তব সত্যটি। সবাই ভাঙ্গিয়া পড়িলেন আর্ত্তি ও কান্নায়।

অজস্র সংখ্যক নাথপন্থী যোগী ও শৈব সাধক মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন—মরজীবনের লীলা সমাপ্ত হইয়া গেলেও যোগীশ্রেষ্ঠ গোরখনাথ আজো বিরাজিত রহিয়াছেন তাঁহার কৃপাঘন দিব্যসত্তা নিয়া। এই বিশ্বচরাচরের সর্ব্বত্র সর্ব্বস্তরে অবাধে তিনি করেন বিচরণ, সর্ব্বজীবের উদ্ধারের জন্য তাঁহার কল্যাণহস্ত হয় সতত প্রসারিত। বিশেষ করিয়া নাথযোগী শৈব ও সাধকদের মতে, মহাযোগী গোরখ-প্রভু যে—

স্বেচ্ছাচারী স্বয়ংকর্তা লীলয়াচজরামরঃ।
অবধ্যো দেবদৈত্যানাং ক্রীড়তি ভৈরবো যথা।[১]

[১] সিদ্ধ সিদ্ধান্ত পদ্ধতি : গোরখনাথ

গুরু অঙ্গদ

সারা উত্তর ভারত ব্যাপিয়া তখন শিখগুরু নানকের বিপুল প্রতিষ্ঠা, ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষরূপে চারিদিকে তাঁহার জয় জয়কার। পণ্ডিত মূর্খ, রাজা প্রজা, ধনী নির্ধন সবাই আসিয়া ভীড় করে তাঁহার কর্ত্তারপুরের ধর্ম্মসভায়।

ভোর হইতে না হইতেই ভক্তেরা আসিয়া চন্দ্রাতপ তলে সমবেত হয়, আবৃত্তি চলে পবিত্র জপজীর, গীত হয় আশা-কি-উয়ার। ভক্তকণ্ঠের মধুর ঝঙ্কারে প্রাঙ্গণ মুখরিত হইয়া উঠে। আবার রাত্রির নিস্তব্ধ আকাশে ছড়ায় সোদার্ ও সোহিলার মর্ম্মস্পর্শী অনুরন। ঘন ঘন উচ্চারিত হয় 'ওয়া গুরুজীকি ফতে'—ভক্ত ও মুমুক্ষুদের প্রাণে জাগাইয়া তোলে নিষ্ঠা ও শরণাগতির দীপশিখা!

সেদিনকার ভজনসভায় এক প্রসিদ্ধ যোগী আসিয়া উপস্থিত হন। গুরু নানকের সঙ্গে তাঁহার দীর্ঘদিনের অন্তরঙ্গতা। সাদর অভ্যর্থনা জানাইয়া যোগীবরকে আসন দেওয়া হইল।

কুশল প্রশ্নাদির পর যোগীবর স্মিত হাস্যে কহিলেন, "নানকজী, একথা কিন্তু সবাইকে স্বীকার করতেই হবে আপনার শিষ্যভাগ্য চমৎকার। শত শত মুমুক্ষু মানুষ আত্মিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এখানে ছুটে আসছে, নিচ্ছে আপনার পরম আশ্রয়। আর কি অদ্ভুত ভক্তিনিষ্ঠা এই শিষ্যদের। আত্ম-নিবেদনের কি গভীর আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছে এদের চোখে মুখে। এ দৃশ্য দেখলে চোখ জুড়োয়।"

"তা বটে, তা বটে"—বলিয়া নানক প্রথমটায় সায় দেন, তারপর এই প্রসঙ্গের জের টানিয়া মন্তব্য করেন, "যোগীবর, সাধারণত ভক্তদের

ভাবরসের ফেনাটাই কিন্তু লোকের চোখে বেশী পড়ে। অথচ আসল বস্তু হচ্ছে ভেতরকার থিতানো রস। সব আধারে এ রস পাওয়া যায় না, আর তা স্বচ্ছ ও সুন্দরও সব সময় নয়।"

"না—না সেকি কথা? আপনার মত মহাত্মার চেলা এরা। এদের শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠায় ফাঁকি থাকবে কেন? তা কি ক'রে হয়?"

"থাক্‌গে এসব কথা। যোগীবর, আপনি কিন্তু এবার অনেকদিন বাদে এলেন আমাদের আশ্রমে। যদি এসেছেনই, কৃপা ক'রে দু'চার দিন থাকুন, আমাদের সেবা গ্রহণ করুন।"

"বেশ, বেশ, আপনার যেমন অভিরুচি তাই হবে"—সানন্দে সম্মতি জানান মাননীয় অতিথি।

পরদিন ভোর হইতে না হইতেই নানক এক অদ্ভুত বেশ ধারণ করিয়া যোগীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ান। ভক্ত ও সেবকেরা তো গুরুর এই বেশভূষা দেখিয়া হতবাক্‌। পীত রং-এর আলখাল্লা ত্যাগ করিয়া তিনি পরিয়াছেন ছিন্ন মলিন বাস। হাতে এক শাণিত কৃপাণ। আর পাশে দাঁড়াইয়া লম্ফঝম্ফ করিতেছে গুটিকয়েক শিকারী কুকুর। সকলেই বলাবলি ক'রে, কে জানে গুরুর আজ কি এক খেয়াল হইয়াছে—সবাইকে সঙ্গে নিয়া শিকারের উদ্দেশে রাবীর তীরে কোন্‌ এক গভীর অরণ্যে তিনি যাইবেন।

যোগী সপ্রশ্ন দৃষ্টি হানিতেই নানক আগাইয়া আসিয়া মৃদুস্বরে কহেন, "আজ এক অভিনয়ের জন্য তৈরী হয় এসেছি, তাইতো শিকারীর মত এই সাজ। চলুন আমার সঙ্গে বন ভ্রমণে। সেখানে আপনাকে দেখাবো, ভক্তদের মধ্যে প্রকৃত শরণাগতি আছে ক'জনার? গুরুগতপ্রাণ হবার যোগ্যতাই বা রয়েছে ক'াদের?"

যোগীর ঔৎসুক্যের অবধি নাই, মহা উৎসাহে তখনি নানকের সঙ্গে বাহির হইয়া পড়েন। দর্শনার্থী ও ভক্তদের সংখ্যা আশ্রমে নিতান্ত কম নয়, তাঁহাদের অনেকেই আগাইয়া আসেন গুরুর কাণ্ড দেখিতে।

ক্ষণপরেই প্রকাশ পায়, গুরু নানক আজ শিকারে বাহির হইবেন,

দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করিবেন অরণ্যাঞ্চলে। কিছু সংখ্যক ভক্ত শিষ্য সোৎসাহে প্রস্তুত হন তাঁহার অনুগমনের জন্য, আর একদলে দেখা যায় বিপরীত মনোভাব। তাঁহারা ভাবেন, গুরু পারের কাণ্ডারী, অধ্যাত্ম-সাধনার ধারা নামিয়া আসে তাঁহারই মহাজীবনের উৎস হইতে। এভাবে সাধারণ এক শিকারীর বেশে জঙ্গলে জঙ্গলে কেন তিনি ঘুরিবেন ? তাছাড়া, প্রেমিক সাধক ও সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া নানকজী সর্ব্বত্র খ্যাত। সেই মহাসাধক যাইবেন শিকারে ? করিবেন পশু হত্যা ? এ কেমন কথা ?

একদল সন্দিগ্ধচেতা লোক তখনই নিঃশব্দে সেখান হইতে সরিয়া পড়ে, আর কিছু সংখ্যক কৌতূহলী ভক্ত ও অন্তরঙ্গ শিষ্য নানকের সঙ্গে যাওয়ার জন্য তৈরী হয়।

যাত্রা শুরু করার আগে গুরু কহেন, "তোমরা দল বেঁধে আমার সঙ্গে চলেছো, ভালই। কিন্তু একটা সর্ত্ত সবাইকে পালন করতে হবে! কারুর সঙ্গে একটা কাণাকড়িও রাখা চলবেনা, যতক্ষণ আমার এই বন ভ্রমণ সমাপ্ত না হয়।"

এ সর্ত্ত সবাই সানন্দে মানিয়া নেন। অভ্যাগত যোগী ও নিজের ভক্ত শিষ্যদের নিয়া নানক শুরু করেন তাঁহার পথ-চলা।

কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর দেখা যায়, পথের আশে পাশে অজস্র তাম্রমুদ্রা ছড়ানো রহিয়াছে। জনহীন এ অরণ্যে এগুলি কোথা হইতে আসিল ? এ বড় আশ্চর্য্যের কথা।

তাৎপর্য্য বুঝিতে যোগীর কিন্তু দেরী হইল না। মৃদুস্বরে গুরু নানককে কহিলেন, "বুঝতে পারছি, এ আপনারই সিদ্ধাইর খেলা, নইলে দুর্গম জনমানবহীন স্থানে এত পয়সা কে শুধু শুধু ছড়িয়ে রাখতে যাবে ?"

নানকের মুখে ফুটিয়া উঠে স্মিত হাসির রেখা। মৃদুস্বরে যোগীকে বলেন, "আপনার ধারণা ঠিকই, কিন্তু এখনি কাউকে কিছু বলার দরকার নেই। এগিয়ে চলুন, আর চুপ ক'রে ঘটনাবলী শুধু লক্ষ্য করে যান।"

ক্ষণপরেই দেখা যায় সঙ্গীদের কয়েকজন পিছনে পড়িয়া নিবিষ্ট মনে

তাম্র মুদ্রাগুলি সংগ্রহ করিতেছে। ঝুলি ভর্ত্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবার অলক্ষ্যে দল ছাড়িয়া তাহারা চলিয়া যায়।

আরো কিছুটা দূর অগ্রসর হওয়া গেল। সেখানেও আর এক বিস্ময়। বনপথে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে বহুসংখ্যক রূপার টাকা। এগুলি কুড়ানোর পর আর একদল অনুগামী ভক্ত গোপনে হঠাৎ সরিয়া পড়ে। নানক ও যোগীবর উভয়ে বিনিময় করেন অর্থপূর্ণ দৃষ্টি।

সঙ্গীদের নিয়া গুরু আরো আগাইয়া চলেন, অরণ্য ক্রমে আরো গভীর হইয়া উঠে। এবার পথপার্শ্বে চোখে পড়ে থরে থরে সাজানো সোনার টাকা। শিষ্য সেবকদের অনেকেই অতিমাত্রায় লুব্ধ হইয়া উঠে। গুরু সম্মুখের দিকে আগাইয়া যাইতেই পিছন হইতে এগুলি তাহারা তাড়াতাড়ি ঝুলিতে ভরিয়া তোলে। তারপর সুযোগমত পিছন ফিরিয়া ছুটিতে থাকে গৃহের দিকে।

এবার নানকের সঙ্গীদলে অবশিষ্ট রহিয়াছে গুটিকয়েক অন্তরঙ্গ শিষ্য। ইহাদের উদ্দেশ করিয়া গুরুগম্ভীর স্বরে তিনি কহেন, "প্রভু অলখ্ পুরুষের মহা অনুগ্রহ যে তোমরা কেউ অর্থের মোহে পতিত হওনি। কিন্তু এবার একটা কথা বিশেষভাবে তোমাদের স্মরণ রাখতে বলি'। সম্মুখে তোমাদের আজ এক অগ্নিপরীক্ষা। এ সময়ে আমি যে আদেশ করবো, তাই নির্বিবচারে পালন ক'রতে হবে।"

বনের অভ্যন্তর ভাগে আরো কিছুটা প্রবেশ করিতেই দেখা গেল, সৎকার করার জন্য একটি মৃত ব্যক্তিকে সেখানে আনয়ন করা হইয়াছে। শবদেহের আপাদমস্তক শ্বেতশুভ্র বস্ত্রে আবৃত। আনুষ্ঠানিক জিনিসপত্র ইতস্তত ছড়ানো রহিয়াছে, কিন্তু কাছাকাছি কোথাও কোন জনমানব দেখা যাইতেছে না।

নিকটে যাইতেই শবদেহের তীব্র দুর্গন্ধ নাকে আসিল। বোঝা গেল, কয়েকদিন হয় এখানে উহা পরিত্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। এবার শুরু হইয়াছে পচনক্রিয়া।

বিস্মিত হইয়া সবাই বলাবলি করিতে থাকেন, শবদেহটি ফেলিয়া

রাখিয়া আত্মীয় স্বজন কোথায় অদৃশ্য হইল? এখানে বাঘ ভালুকের উপদ্রব যথেষ্ট, হয়তো হিংস্র পশুর তাড়া খাইয়াই সবাই পলাইয়াছে, ভয়ে আর ফিরিয়া আসে নাই।

বস্ত্রাচ্ছাদিত শবদেহের দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া নানক কহিলেন, "তোমাদের ভিতর এমন কে আছে, যে আমার আদেশমত এই শবের মাংস ভক্ষণ ক'রতে পারে?"

গুরুর প্রস্তাব শুনিয়া সেবকেরা তো সবাই একেবারে হতবুদ্ধি। পচা মৃতদেহ, দুর্গন্ধে যাহার ভূত পালায়, তাহা ভোজন করিতে হইবে? একি বীভৎস প্রস্তাব! গুরু কি হঠাৎ অপ্রকৃতিস্থ হইয়াছেন? নতুবা এমন কথা তাঁহার মুখ দিয়া কেন বাহির হইবে? পূতিগন্ধময় শব ভক্ষণের মধ্যে তো আধ্যাত্মিকতার কিছু নাই। তাছাড়া, গুরু নানকের কাছে শিষ্যেরা সবাই এযাবৎ ভগবৎপ্রেম ও জীবপ্রেমের প্রশস্তিই শুনিয়া আসিয়াছেন। এ ধরণের অঘোরপন্থী প্রক্রিয়ার কথাতো কখনো শুনেন নাই। তবে?

কঠিন পরীক্ষায় যাহারা এযাবৎ উত্তীর্ণ হইয়া আসিতেছেন, গুরুর কাছে সাধন নিয়া দীর্ঘকাল রহিয়াছেন, তাঁহার চরণে আত্মনিবেদিত সেইরকম জনকয়েক শিষ্যই নানকের পাশে দণ্ডায়মান। গুরুর এই অভাবনীয় প্রস্তাবের কথা শুনিয়া সবাই নত মস্তকে ভাবিতেছেন।

যোগীবর এতক্ষণে মুখ খুলিলেন। কহিলেন, "নানকজী, আপনার এ আদেশটা যেন বড় বেশী কঠোর হয়ে যাচ্ছে। যে সব একনিষ্ঠ ভক্ত প্রাণ দিতেও দৃক্‌পাত করে না, ন্যক্কারজনক কর্ম্মে লিপ্ত হতে তারাও একটু ইতস্তত করবে বই কি!"

"যোগীবর! গুরুর জন্য, ধর্ম্মের জন্য যারা সর্ব্বস্ব পণ ক'রে, তারাই হচ্ছে প্রকৃত শিখ। পরমপ্রাপ্তির যোগ্য আধার তারা। তাদের চেনবার জন্যই আজকের এ পরীক্ষা। আমার এ আদেশ আর আমি ফিরিয়ে নিচ্ছিনে।"—দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দেন নানক।

একনিষ্ঠ শিষ্য লহিনা অদূরে দাঁড়াইয়া এতক্ষণ সব শুনিতেছেন।

এবার নিঃশব্দে আগাইয়া আসিয়া নানকের চরণে প্রণাম নিবেদন করিলেন, যুক্তকরে কহিলেন, "গুরুজী, এ দীন ভৃত্য আপনার আদেশ পালন করতে সদাই প্রস্তুত। বলে দিন, শবদেহের কোন দিকটা প্রথমে আমি মুখবিবরে পুরবো। পদদ্বয় না মস্তক?

সঙ্গীরা তড়িৎস্পৃষ্টের মত চমকিয়া উঠে। ভক্ত লহিনা কি উন্মাদ হইয়া গিয়াছে?

নানক শান্তস্বরে আদেশ দেন, "বৎস লহিনা, মৃতদেহের মধ্যভাগ অর্থাৎ কোমর থেকেই তুমি ভোজন শুরু কর।"

লহিনা নির্বিকার চিত্তে সম্মুখে আগাইয়া আসেন। মুখ নীচু করিয়া বস্ত্রাচ্ছাদিত শবদেহে সবে কামড় বসাইয়াছেন, হঠাৎ ঘটিল এক অবিশ্বাস্য অলৌকিক কাণ্ড। অসহনীয় পূতিগন্ধ সেই মুহূর্তে দূরীভূত হইয়া গিয়াছে—আর পচনশীল মৃতদেহ পরিবর্তিত হইয়াছে উপাদেয় ভোজনদ্রব্যে।

বস্ত্রের আচ্ছাদন অপসারণ করিতেই দেখা গেল—থরে থরে সেখানে সজ্জিত রহিয়াছে বহুতর রসনাতৃপ্তিকর ফল ও দুগ্ধজাত ভোজনদ্রব্য। এ দৃশ্য দেখিয়া উপস্থিত সকলে বিস্ময়ে ও আনন্দে একেবারে অভিভূত হইয়া গিয়াছেন।

নানক এবার লহিনাকে নিকটে আহ্বান করেন, শিরে হাত দিয়া প্রসন্ন মধুর কণ্ঠে কহেন, "বৎস, আমার আজকের পরীক্ষায় তুমি সগৌরবে উত্তীর্ণ হয়েছো। দুর্লভ ভক্তির উদয় হয়েছে তোমার সাধন-জীবনে, ঐকৈকনিষ্ঠা নিয়ে গুরুর সত্তায় তুমি নিজেকে করেছো বিলীন। হ্যাঁ, তুমিই হচ্ছো প্রকৃত 'শিখ'। গুরুর প্রতি এই নিষ্ঠা ও ঐক্যবোধ তোমায় পৌঁছে দেবে সেই পরম 'এক'-এর, সেই অলখ্ নিরঞ্জনের, কালজয়ী মহাসত্তায়।"

যোগীবরও এবার আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছেন। প্রশংসমান দৃষ্টিতে গুরু ও শিষ্যের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "নানকজী, লহিনার মত গুরুগত শিষ্য যে কোটিতে গুটিকয়েক, তাতে সন্দেহ নেই। তার

একটা বৈশিষ্ট্য আমার চোখে বড় হয়ে ধরা দিয়েছে—গুরুধ্যান ও গুরুসেবার মধ্য দিয়েই সে লাভ করেছে তার সাধনার সিদ্ধি। গুরুর দেহ ও মন, স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুই অঙ্গের সাথেই ঘটেছে তার সাযুজ্য। আপনার অবর্ত্তমানে, মণ্ডলীতে এমন সাধক ও শিষ্যকেই আপনি গুরুর পদে সমাসীন করে যান,—যে হবে আপনারই স্বরূপ বিশেষ।"

ধীর প্রশান্ত কণ্ঠে নানক উত্তর দেন, "যোগীবর, আপনার অন্তর্দৃষ্টি একটুও ভুল করেনি, আপনি ঠিকই বলেছেন, লহিনা আমারই অঙ্গের অংশ—অঙ্গদ। আজ থেকে এই নামেই সে অভিহিত হবে। শিখদের ভবিষ্যৎ গুরুরূপেও এখন থেকে সে হয়ে রইলো চিহ্নিত"

উপস্থিত সকলের উল্লাস ও জয়ধ্বনির মধ্যে নানক অঙ্গদকে পরম প্রীতিভরে আলিঙ্গনাবদ্ধ করেন, জানান আন্তরিক আশীর্ব্বাদ।

সঙ্গী ভক্তদের দিকে তাকাইয়া প্রসন্ন কণ্ঠে গুরু আবার কহেন, "তোমরা সবাই স্মরণ রেখো—লহিনার যে নব নামকরণ আজ হলো, আমার অঙ্গ-স্বরূপ বলে যে অঙ্গীকার আমি করলাম, তার পেছনে আছে গুরুসেবা ও আত্মত্যাগের এক দীর্ঘ ইতিহাস। চরম পরীক্ষা তাকে দিতে হয়েছে বারবার, কৃতকার্য্যও সে হয়েছে পূর্ণ মর্য্যাদা নিয়ে। নিজের আত্মাভিমান নির্ম্মূল করে গুরুময় সে হয়ে উঠেছে। তাইতো অর্জ্জন করেছে তার গুরুর স্বরূপ। আমার শিখেরা সবাই যেন আমার প্রিয় অঙ্গদ থেকে এই শিক্ষাই যুগে যুগে লাভ ক'রে।"

অঙ্গদের গুরুপ্রাপ্তি, তাঁহার শরণাগতি ও সিদ্ধির কাহিনী শুধু শিখ সম্প্রদায়ে নয়, সমগ্র ভারতের অধ্যাত্মরস-পিপাসু মানুষের কাছে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

পাঞ্জাবের ফিরোজপুর জেলার একটি ক্ষুদ্র গ্রাম মাটেডি-সরাই। এখানকার এক অতি সাধারণ বণিকের ঘরে ১৫০৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন দ্বিতীয় শিখগুরু অঙ্গদ। পিতা ফেরু ব্যবসায়ীর বৃত্তি নিয়া থাকিলেও সৎ ও পরোপকারী বলিয়া গ্রামে তাঁহার সুনাম ছিল।

আর মাতা দয়া-কাউর ছিলেন সরলতা ও পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি। ধর্ম্ম কর্ম্মে, ব্রত পার্ব্বণে তাঁহার উৎসাহ উদ্দীপনার অন্ত ছিল না। শিশু পুত্র লহিনা এক শুভ যোগে মাতার কোল আলো করিয়া ভূমিষ্ঠ হন, বণিকগৃহে সেদিন আনন্দের বান ডাকিয়া উঠে।

গ্রামের বিদ্যালয়ে পাঠ শেষ হওয়ার পর লহিনাকে পিতা তাঁহার বৈষয়িক কর্ম্মে নিয়োজিত করেন। পুত্র ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করেন। এবার তাহাকে গৃহস্থীতে প্রবেশ করানো দরকার। ফেরু ও দয়া-কাউর পুত্রের বিবাহের জন্য বড় ব্যস্ত হইয়া পড়েন। স্থানীয় এক চাষীর কন্যা খিবি বড় সুলক্ষণযুক্তা, তাহাকেই বরণ করা হয় পুত্রবধূরূপে।

যথাকালে লহিনার স্ত্রী পরপর দুইটি পুত্র সন্তান প্রসব করেন; নাম তাহাদের—দাসু ও দাতু।

ভাগ্যের বিড়ম্বনায় নিজগ্রামে লহিনা বেশীদিন বাস করিতে পারেন নাই। দুর্দ্ধর্ষ মুঘল ও বেলুচিদের আক্রমণে মাটেডি-সরাই এক সময়ে বিধ্বস্ত হয় এবং পত্নী খিবি ও পুত্র দুইটীকে নিয়া লহিনা অমৃতসর জেলার খাদূর নামক এক গ্রামে আসিয়া আশ্রয় নেন। নূতন করিয়া এখানে শুরু হয় তাঁহার সাংসারিক জীবন।

নূতন পরিবেশে আসার পর হইতে লহিনার জীবনে এক বড় পরিবর্ত্তন দেখা দেয়। দেবদ্বিজে ভক্তি তাঁহার অতিমাত্রায় বাড়িয়া উঠে। বিশেষ করিয়া দেবী জ্বালামুখীর প্রতি তাঁহার নিষ্ঠা হয় প্রগাঢ়। প্রতি বৎসর দেবীপক্ষ উপস্থিত হইলেই লহিনা গ্রামের একদল ভক্ত নরনারী সঙ্গে নিয়া জ্বালামুখীতে গিয়া উপস্থিত হন। মায়ের বেদীতলে শ্রদ্ধাভরে পুষ্পাঞ্জলি দেন, আর দুই পায়ে ঘুঙুর পরিয়া উৎসব প্রাঙ্গণে প্রাণমন ঢালিয়া নৃত্য করেন। পরোপকারী সু-গৃহস্থ ও ভক্তসাধক বলিয়া শুধু খাদূরেই নয় আশেপাশের কয়েকখানা গ্রামে তিনি সুপরিচিত ও জনপ্রিয় হইয়া উঠেন।

সামান্য একটি ঘটনা বা সামান্য একটি কথা কোন কোন সময়ে মানুষের জীবনে হইয়া উঠে অসামান্য, আনিয়া দেয় সুদূরপ্রসারী

পরিবর্ত্তন। ভক্ত লহিনার জীবনেও এমনি একটি ঘটনা সেদিন ঘটিতে দেখা যায়, যাহার ফলে সমগ্র জীবন তাঁহার রূপান্তরিত হইয়া উঠে।

রাত্রির তখন শেষ যাম। কি কারণে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় লহিনা শয্যায় উঠিয়া বসিয়াছেন। শুক্লা তিথির বাঁকা চাঁদ আকাশের গায়ে ঢলিয়া পড়িয়াছে, বাতায়ন পথে প্রবেশ করিতেছে মৃদু মধুর বায়ু হিল্লোল।

হঠাৎ লহিনার কাণে আসে ভজনের অপূর্ব্ব সুরলহরী। কুটিরের অদূরেই ভক্ত যোধার বাস। প্রায়ই এমনি সময়ে, যখন গ্রামের সবাই অঘোরে নিদ্রা যায়, নিজ কৃত্যাদি সারিয়া তিনি শুরু করেন পবিত্র ভজন। কিন্তু এমন মধুর, এমন প্রাণরস-উৎসারক ভজন তো লহিনার কাণে কোনদিন প্রবেশ করে নাই! হৃদয় তন্ত্রীতে পশিতেছে ঐ স্বর্গীয় ঝঙ্কার, আর সমগ্র সত্তাকে আকর্ষণ করিতেছে অমোঘ শক্তিতে।

দুয়ার খুলিয়া লহিনা অঙ্গনে গিয়া দাড়ান, স্পষ্টতর ভাবে কাণে আসে যোধার প্রাণগলানো অপূর্ব্ব সঙ্গীত। ভক্তিরসাপ্লুত এই সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা লহিনার চেতনাকে দিব্যভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলে। সাধক যোধা আবেশভরে গাহিতেছেন—

স্মরণ কর, ভজন কর, সেই পরম প্রভুকে,
চিরসুখ আর চির আনন্দের
উৎসরূপে যিনি রয়েছেন বিরাজিত।
ওগো, তুমি যে প্রমত্ত হয়েছো লোভে—
ডুবেছো পাপের পঙ্কে,
তাইতো মরছো তিলে তিলে এমন ক'রে
চরম দুঃখের এই দহনে।
পাপের পথ চিরতরে ছেড়ে দাও,
আর ঝাঁপ দেবার আগে ছাখো তাকিয়ে।
এমনি করে ঢালো পাশার দান
যেন প্রভুর হাতে না হয় তোমার পরাজয়,
বরং—জিনে নিতে পারো পরমধন।

ভক্তপ্রাণের আকুতি-ভরা সামান্য কয়েকটি গানের চরণ, লহিনার মর্ম্মমূলে ইহাই আনিয়া দিল নূতন চৈতন্যের আলো, নূতন দিগ্‌দর্শন। ভোর না হইতেই আকুল হইয়া তিনি ছুটিলেন যোধার গৃহের দিকে। প্রেমভরে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, "ভাই, কোথায় পেলে তুমি এমন দেহ-মন-প্রাণ উত্তলকরা অপরূপ ভজনসম্পদ? কে করেছে এ অপূর্ব্ব বস্তু রচনা? কে শিখিয়েছে তোমায়?"

"ভাই, এ যে আমার গুরু বাবা-নানকের রচনা। প্রাণোৎসারিত এই অপূর্ব্ব ভজন নিজে তিনি আমায় যত্ন করে শিখিয়েছেন। আর এই সদ্‌গুরুর শরণ নিয়েই যে আমি বেঁচে আছি। আছি পরম আনন্দে"— যোধা বলেন কৃতজ্ঞতার সুরে।

লহিনা কাঁদিয়া পড়েন, কাতর কণ্ঠে মিনতি জানান, "কোথায় থাকেন তোমার আশ্রয়দাতা এই মহাপুরুষ? কাল রাতে তোমার ভজন শোনবার পর থেকেই আমি যেন পাগল হয়ে উঠেছি। প্রাণ আমার ছট্‌ফট্‌ করছে। ভাই, শিগ্‌গীর তাঁকে একবার দর্শন করিয়ে আমার তাপিত চিত্ত শীতল ক'র।"

যোধা সানন্দে রাজী হইলেন। কহিলেন, "জ্বালা-মুখীর পথেই তো পড়ে কর্ত্তারপুর, যেখানে বাবা নানকের আখ্‌ড়া। বরাবরের মতো এবারও তো তুমি দেবী দর্শনে যাচ্ছো। বেশতো, কর্ত্তারপুরে দুদিন থেকে আমার গুরুকে দর্শন করে যেও।"

প্রস্তাবটি লহিনার মনে ধরিল। কিছুদিনের মধ্যেই দলবল নিয়া চলিলেন জ্বালামুখীর উদ্দেশে। পথেই সেই কর্ত্তারপুর। লহিনা সবাইকে ডাকিয়া কহেন, "রাবী নদীর তীরে, নিজের আশ্রম ভবনে অবস্থান করছেন প্রভু নানক—এ অঞ্চলের এক বিখ্যাত সিদ্ধ মহাপুরুষ। ভাব্‌ছি, সবাই মিলে তাঁকে দর্শন ক'রে আসি। তারপর জ্বালামুখীতে গিয়ে পুষ্পাঞ্জলি দেবো দেবীর চরণে। এক যাত্রায় আমাদের দুটি বড় সুফল লাভ হবে। কি বল তোমরা?"

এ প্রস্তাবে আপত্তি করার কি আছে? সবাই মিলিয়া উপস্থিত হইলেন নানকের আশ্রমে।

অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে ভাবাবিষ্ট মহাপুরুষ দরবারে বসিয়া আসেন। অন্তরঙ্গ কয়েকটি শিষ্য ভক্তি-আপ্লুত কণ্ঠে গাহিয়া চলিয়াছেন পরমপ্রভুর স্তবগান। মর্দানার রবাব হইতে উৎসারিত হইতেছে সুমধুর সুর মূর্চ্ছনা। ভক্ত শ্রোতাদের প্রাণ মন স্বর্গীয় আনন্দে বিভোর। উর্দ্ধায়িত এক ভাবলোকে সবাই যেন বিচরণ করিতেছেন।

এই অপূর্ব্ব পরিবেশে অদূরে উপবিষ্ট এই মহাসাধকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া লহিনা একেবারে আত্মবিস্মৃত হইয়া যান। ভজন থামিয়া গেলে সকাতরে পতিত হন নানকজীর পদতলে। সাশ্রুনয়নে নিবেদন করেন নিজের মনস্তাপের কথা, আর্ত্তির কথা। প্রার্থনা জানান, "প্রভু, সংসারের দহন জ্বালায় আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি, কৃপা ক'রে আপনি আমায় উদ্ধার করুন। চরণে আশ্রয় দিয়ে করুন জীবন রক্ষা।"

পরম স্নেহে বাবা নানক তাঁহাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করেন, খুঁটিয়া খুঁটিয়া করেন নানা প্রশ্ন, জানিয়া নেন তাঁহার জীবনের সকল তথ্য। তারপর শান্তস্বরে কহেন, "বৎস, জ্বালামুখীতে যাবার সঙ্কল্প নিয়ে এসেছো, এখন বরং সেখানেই তুমি যাও। পরে সুবিধামত আবার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রো।"

"প্রভু, যে জ্বালা নিয়ে প্রতিবৎসর জ্বালামুখীতে যাই, আজ তা নির্ব্বাপিত হয়েছে আপনাকে দর্শন ক'রে। সেখানে যাবার আকাঙ্ক্ষা হয়েছে একেবারে অন্তর্হিত। এখন থেকে আমি আপনারই চরণপ্রান্তে পড়ে থাকতে চাই, আপনার সেবায় এই দেহ-মন-প্রাণ দিতে চাই বিলিয়ে।"

বিস্মিত তীর্থসঙ্গীদের কাছে লহিনা নিজের এই সিদ্ধান্ত জানাইয়া দেন, ঝুলি হইতে নূতন কেনা ঘুঙুর জোড়া তুলিয়া নিয়া বলেন, "দেবী জ্বালামুখীর বেদীর সামনে এই ঘুঙুর পরে আমি নৃত্যগীত করি' প্রতি বৎসর। আজ এর প্রয়োজন আমার কাছে ফুরিয়ে গেছে। তাই শুধু

জ্বালামুখীতেই নয়, খাদূরে নিজের ঘর সংসারেও আর আমি ফিরে যাচ্ছিনে।”

সঙ্গীরা মহা ব্যস্ত হইয়া অনুনয়-বিনয় কবিতে থাকেন, “সে কি গো, ঘরে যে তোমার স্ত্রী ও দুই ছেলে রয়েছে, আরো রয়েছেন বৃদ্ধ মা বাপ। তাঁদের ফেলে রেখে তুমি সাধু হয়ে যাবে? একি কথা বলছো, লহিনা? তাছাড়া, জ্বালামুখী তীর্থে যাবে বলে তুমিই সবাইকে নিয়ে এসেছো, এখন তাদের ছেড়ে গেলে যে তোমার পাপ হবে। না-না, এমন পাগলামী তুমি ক’রো না।”

“যে সুখ, যে আনন্দের জন্য জীবন-ভর এত ছোটাছুটি করা, তা যে আমি কর্ত্তারপুরে এসে পেয়ে গিয়েছি ভাই। তবে শুধু শুধু হেথায় সেথায় ছুটাছুটির প্রশ্ন আর ওঠে কোথায়?”—হাসিয়া উত্তর দেন লহিনা।

যুক্তিতর্ক বাদবচসা সব ব্যর্থ হয়—লহিনাকে টলানো যায় না। সঙ্গী গ্রামবাসীরা বিরক্ত হইয়া নিজেদের গন্তব্য অভিমুখে প্রস্থান ক’রে।

গুরু তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছেন, অঙ্গীকার করিয়াছেন, লহিনার তাই আনন্দের অবধি নাই। মনপ্রাণ দিয়া বাবা-নানকের সেবা করেন, আর বাকী সময় অতিবাহিত করেন প্রবীণ ভক্ত শিষ্যদের সঙ্গে।

নানক সুপ্রসিদ্ধ মহাপুরুষ, ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ তাঁহার দুর্ব্বার, তাই দিনরাত আশ্রমে ভক্ত ও দর্শনার্থীদের আগমনের বিরাম নাই। দরবার আর লঙ্গরখানায় লোকজনের ভীড় সদা লাগিয়াই আছে। এই ভীড়ে লহিনা মাঝে মাঝে খেই হারাইয়া ফেলেন, নিজেকে কোথাও যেন খুঁজিয়া পান না।

কাজকর্ম্ম, ধ্যান ভজনের ফাঁকে ফাঁকে তাঁহার মনে জাগে কত রকমের প্রশ্ন, কত কাতর প্রার্থনা। নবাগত ভক্ত তিনি—দীনাতিদীন। বাবা-নানকের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য্য লাভ ক’রা, বহু প্রার্থিত কৃপা লাভ ক’রা তাঁহার পক্ষে কতটা সম্ভব কে জানে? অন্তরে প্রবল আকাঙ্ক্ষা—অবসর মত বাবার শ্রীমুখনিঃসৃত তত্ত্বকথা শুনিবেন, গ্রহণ করিবেন সাধন নির্দেশ।

কিন্তু এই ভীড়ের ভিতর সে আকাঙ্ক্ষা পূরণের কোন সম্ভাবনাই যে তিনি দেখিতেছেন না। তবে উপায়? কি গতি তাঁহার হইবে?

অন্তর্যামী নানক নবাগত ভক্তের অন্তরের কথাটি বুঝিয়া নিলেন। কহিলেন, "বৎস লহিনা, অন্তরে বৃথা এ দুঃখ কেন তোমার? নিজেকে একান্ত নিঃশেষে উজাড় ক'রে দাও পরম প্রভুর চরণে। তাঁর স্বরূপের ধ্যান মনন করে যাও, অবিরাম গেয়ে চল তার নাম। সকলের চাইতে তিনিই যে আপনার জন। এমন জনকে কায়মনোবাক্যে আপনার ক'রে নেওয়া, তাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে ডুবে যাওয়া, এটাই যে সাধনা, বৎস।"

"যাঁকে জানিনে চিনিনে, তাঁকে আপনার ক'রে নেওয়া, তাতে বিলীন হয়ে যাওয়া—একি সহজ কথা, প্রভু?"—সবিনয়ে নিবেদন করেন ভক্তপ্রবর লহিনা।

"বৎস, এ পরম বোধ তো আর একদিনে জেগে ওঠে না। এজন্য চাই নিরন্তর তাঁর স্বরূপের ধ্যান। তবে শোন আমার একটি জপজী, তাঁর স্তবগাথায় এর ইঙ্গিত রয়েছে—

কেউ তো তাঁকে করেনি সৃষ্টি,
কেউ করেনি তাঁকে প্রতিষ্ঠিত,
অনাদ্যন্ত স্বয়ম্ভু আমার প্রভু—
পরম 'এক'রূপে রয়েছেন চির-বিরাজমান।
আরাধনা যে-ই করেছে তাঁকে
পেয়েছে সীমাহীন মর্য্যাদা।
নানক, প্রাণভরে গাও তাঁর স্তুতি গান
সকল কিছু মহত্ত্ব ও মাধুর্য্যের যিনি আকর।
গাও আর শোন তাঁর গুণগান,
তাঁর প্রেমে রসায়িত ক'র তোমার চিত্ত—
তবেই দূর হবে সকল দুঃখ আর দৈন্য,
সকল সুখের যিনি পারাবার—
হে নানক, তাঁতেই হয়ে যাও বিলীন।

ঈশ্বরের বাণী রয়েছে নিহিত গুরুর উপদেশে—
গুরুর উপদেশেই, হে মুমুক্ষু, লাভ কর'বে তুমি জ্ঞান,
গুরুই এনে দেবেন তোমার পরম উপলব্ধি।
ঈশ্বর রয়েছেন অনুস্যূত এই বিশ্বচরাচরে।
হে মুমুক্ষু, গুরুই শিব, গুরুই ব্রহ্মা বিষ্ণু,
গুরুই তোমার পার্ব্বতী লক্ষ্মী আর সরস্বতী। [১]

স্বরচিত জপজী আবৃত্তি করার পর নানক নীরব হন, প্রেমভরে লহিনার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন।

ভাবগদ্‌গদকণ্ঠে নবীন ভক্ত উত্তর দেন, "বাবা, বিশ্বপ্রভুর বিশ্বাতীত স্বরূপ আপনি উদ্‌ঘাটিত করেছেন। কিন্তু এ যে আমার মত লোকের ধ্যান ধারণার বাইরে। ক্ষুদ্র ডিঙি নিয়ে মহাপারাবার পার হবো আমি কোন্ সাহসে? সত্যকার কোন সঙ্গতিই যে আমার নেই।"

"আছে, বৎস। পারানির কড়ি হচ্ছে তাঁরই পরম পবিত্র নাম। এ নাম শ্রবণ ক'রে ক'রে আগে দেহ মন পবিত্র ক'রো। তারপর শুদ্ধ দেহের আধারে রোপন ক'র সেই নামের অমোঘ বীজ। আমার একটি পুরোণো জপজীতে নামমাহাত্ম্যের দিগ্‌দর্শন রয়েছে—

প্রভুর নাম মাহাত্ম্যের নেই সীমা—
তা শুধু শ্রবণ করলে মানুষ হয় ঊর্দ্ধায়িত,
হয় শিব, ব্রহ্মা আর ইন্দ্রের মতন দেবতা।
এ নামের যাদু অভাজনকে করে মহাজন,
দেহচক্রের রহস্য ক'রে ভেদ,
আর এনে দেয় যোগসাধনার পথ সন্ধান।
নাম-শ্রবণের চাবিতে হয় উন্মোচিত
শাস্ত্র, স্মৃতি আর বেদের নিহিতার্থ।
নানক, ভক্ত সাধুরাই যে চির-ধন্য।

---

১ ম্যাকলিফ্: দ্য শিখ রিলিজিয়ন (জপজী) ভল্যু ১, পৃঃ ১৯৮

মধুমাখা নাম শ্রবণের ফলে
তাঁদের দুঃখ আর পাপ হয় অপসৃত।[১]

অতঃপর একদিন লহিনা গুরু নানককে ধরিয়া পড়েন, "বাবা, ঘর-সংসার সব ছেড়ে এসে আপনার চরণে শরণ নিয়েছি, এবার কৃপা ক'রে আমায় দীক্ষা দিন, আপনার শিখসঙ্গৎ-এ দিন প্রবেশের অধিকার।"

আশ্বাস দিয়া নানক বলেন, "বৎস, তুমি অধীর হয়ো না। আগে কিছুদিনের জন্য নিজ গৃহে তুমি ফিরে যাও। পিতা মাতা আর স্ত্রী পুত্রেরা তোমার সিদ্ধান্তের খবর পেয়ে মুষ্‌ড়ে পড়েছে। তাদের বুঝিয়ে শান্ত ক'র, সাংসারিক বিলিব্যবস্থা যা ক'রা দরকার তা শেষ ক'র। তারপর কর্ত্তারপুরে এসো, তখন তোমায় আমি দীক্ষা দেবো।"

নির্দ্দেশ না মানিয়া উপায় নাই, তাই লহিনাকে খাদূরে ফিরিয়া যাইতে হইল। আত্মপরিজনেরা আশা ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন, এবার তাঁহাকে দেখিয়া সবাই মহা আনন্দিত

লহিনা সবিস্তারে স্ত্রীকে সব কথা বলিলেন: বাবা নানকের দর্শনের পর কি আমূল পরিবর্ত্তন আসিয়াছে তাঁহার জীবনে, তাহা বর্ণনা করিলেন। বুঝাইলেন, "এতকাল পিতা-মাতা ও তোমাদের সেবা করেছি, এবার প্রাণমন সমর্পণ করবো গুরুর সেবায়। ভাগ্যক্রমে বাবা নানককে পেয়েছি আমার পাবের কাণ্ডারীরূপে, তাঁরই নির্দ্দেশমত ভাসাবো আমার জীবন তরী। তবে, তোমাদের ভয় নেই, আমি সংসার-বিরাগী হয়ে কোথাও উধাও হচ্ছি না। বাস ক'রবো গুরুর আশ্রমে, অথবা নিজের গৃহকে আশ্রম ক'রে এখানেই সার্থক ক'রে তুলবো গুরুপ্রদত্ত সাধন।"

পত্নী খিবির শঙ্কা ও দুশ্চিন্তা একেবারে দূর না হইলেও কিছু পরিমাণে তিনি আশ্বস্ত হইলেন। বৈষয়িক যে দায়িত্ব লহিনার উপর ছিল, দুই পুত্রের উপর তাহা অর্পণ করিয়া ফেলিলেন তিনি মুক্তির নিঃশ্বাস। তারপর ভজন গাহিতে গাহিতে রওনা হইলেন কর্ত্তারপুরে।

[১] দ্য শিখ রিলিজিয়ন্—পৃঃ ২০০

আশ্রমে পৌঁছিতেই নানকের পত্নী সুলখনীদেবী লহিনাকে পরম সমাদরে, নিজ পুত্রজ্ঞানে, গ্রহণ করিলেন। গুরু নানক তখন বাড়িতে নাই। ক্ষেতে সেদিন ফসল কাটা হইতেছিল—এই ফসল দিয়াই সম্বৎসরের অতিথি সংকার চলে, তাই নানক স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তদারক করিতেছেন। লহিনা দ্রুতপদে সেখানে গিয়া উপস্থিত।

গুরুর চরণ বন্দনা করিয়া উঠিতেই দেখিলেন, তিনি যেন বেশ কিছুটা বিব্রত। বড় বড় তিনটি ফসল-স্তূপ সেখানে জড়ো করিয়া কৃষাণেরা অপর ক্ষেতে কাজ করিতে গিয়াছে। এখন এগুলি আশ্রমে কি ভাবে বহন করিয়া নেওয়া যায়? কর্দ্দমাক্ত ক্ষেত হইতে ফসলগুলি কাটা হইয়াছে, এ বোঝা একবার মাথায় নিলে কাপড় জামার দুর্দ্দশার অন্ত থাকিবে না। সঙ্গী ভক্ত শিষ্যেরা কেহই একাজ করিতে উৎসাহী নন। সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতেছেন।

লহিনা তাড়াতাড়ি আগাইয়া গেলেন শস্যস্তূপের দিকে। মৃদুস্বরে বাবা-নানককে জিজ্ঞাসা করিলেন, কয়টি বোঝা এখান হইতে সরানো দরকার? উত্তর হইল—যতটা সে বহন করিতে পারে।

প্রাণপণ প্রয়াসে তিনটি ভারী শস্যস্তূপই লহিনা একের পর এক মাথায় উঠাইয়া নেন্, তারপর পথ চলিতে থাকেন গুরুর সঙ্গে।

আশ্রমে পৌঁছিতেই উভয়ে পড়িয়া যান সুলখনী দেবীর সম্মুখে। লহিনার মাথায় পর্ব্বতপ্রমাণ শস্যের বোঝা। এ দৃশ্য দেখিয়া নানক-পত্নী ক্রোধে বিরক্তিতে অধীর হইয়া উঠেন। স্বামীকে তীব্র তিরস্কার করিয়া কহেন—“একি রকমের আক্কেল তোমার বলতো? নূতন একটি ছেলে ঘরে এসেছে, তার মাথায় এমন বড় বড় তিন তিনটে বোঝা কি ক'রে চাপাতে পারলে? আর কি কেউ ছিল না আশে পাশে? কোথায় ছিল তোমার ভক্ত শিখেরা, কোথায় ছিল পুত্র দুটি? আহা চেয়ে ছাখো, বাছা লহিনা ক্লান্ত হয়ে কি রকম হাঁপাচ্ছে। কাটা ফসলের কাদা ঝরছে সারা গায়ে। নূতন জামা কাপড়গুলো একেবারে নোংরা হয়ে গিয়েছে। কেন ওর এ দুর্দ্দশা করলে, বলতো?”

স্মিত হাস্যে নানক উত্তর দেন, "সুলখনী, ভগবান যে নিজেই কৃপা করে লহিনার শিরে তিন তিনটে বোঝা চাপাবার ব্যবস্থা করছেন।[১] এ শস্যের বোঝা তারই একটা আভাস মাত্র। আর পরিচ্ছদ কর্দ্দমাক্ত হয়েছে বলে অনুযোগ করছো? চেয়ে ছাখো—কাদা নয়, তা গৈরিক স্রাব।"

শুধু সুলখনী দেবীই নয়, প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান ভক্ত ও শিষ্যের দল সবিস্ময়ে দেখিলেন এক অলৌকিক দৃশ্য। লহিনার শেরওয়ানী, পাঞ্জাবী ও পাগড়ী সেই মুহূর্ত্তে রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে বৈরাগী সন্ন্যাসীর ব্যবহৃত গৈরিক রঙ-এ।

উপস্থিত সকলে গুরু নানক ও লহিনাকে ঘিরিয়া সমস্বরে বারবার জয়ধ্বনি দিতে থাকে—'ওয়া গুরুজী কি ফতে'।

কয়েকদিনের মধ্যেই, একটি শুভ লগ্ন দেখিয়া বাবা-নানক লহিনাকে দীক্ষা দেন, গ্রহণ করেন তাঁহাকে শিখরূপে, অন্যতম অন্তরঙ্গ পার্ষদ এবং শিষ্যরূপে।

গুরুর নির্দ্দেশে নিগূঢ় ভক্তি সাধনার পথে এখন হইতে বহিয়া চলে ভক্ত লহিনার অধ্যাত্মসাধনা। এজন্য কোন কৃচ্ছ্র, কোন তপস্যাই তিনি বাদ দেন নাই, আর তাঁহার এই কঠোর সাধনার মূল ভিত্তিরূপে তিনি আঁকড়িয়া ধরিয়াছিলেন গুরুসেবা ও গুরুনিষ্ঠাকে।

অধ্যাত্ম-সাধনা ও সিদ্ধির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলেই লহিনা কহিতেন, "সাধনার প্রধান অন্তরায় হচ্ছে আত্মাভিমান, যা মানুষের খণ্ডবুদ্ধিকে জীইয়ে রাখে, বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখে সর্ব্বময় সর্ব্বপরিপ্লাবী ঈশ্বর সত্তা থেকে। এই আত্মাভিমানের মূল উৎপাটন কর'তে হলে চাই একনিষ্ঠ গুরুসেবা, চাই সেবা ও আত্মত্যাগের ভেতর দিয়ে গুরুর সাথে একাত্মক

[১] শিখেরা বিশ্বাস করেন, ভক্তপ্রবর লহিনার মাথার এই তিনটি শস্যের বোঝা হইতেছে উত্তরকালের গুরু অঙ্গদের তিনটি ঐশ্বরীয় দায়িত্বের প্রতীক। এই তিনটি হইতেছে—আধ্যাত্মিক, বৈষয়িক ও গুরুগদী সম্পর্কিত দায়িত্ব।

হয়ে যাওয়া। তবেই ঘটে প্রকৃত সৌভাগ্যোদয়, সাক্ষাৎ মিলে ধ্যেয় বস্তু —অলখ পুরুষের।

গুরুসেবার উদযাপনে সাধক লহিনার বিন্দুমাত্র ত্রুটি কখনো দেখা যায় নাই। গুরুর সামান্যতম ইচ্ছাটি তাঁহার কাছে হইয়া উঠিয়াছে অলঙ্ঘনীয় আদেশ। এজন্য যে কোন দুঃখ কষ্ট তিনি নির্ব্বিকার চিত্তে সহ্য করিয়াছেন, দিনের দিন মাসের পর মাস নিজেকে তিলে তিলে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন।

গুরু নানকও তাঁহার এই চিহ্নিত অন্তরঙ্গ শিষ্যকে কম পরীক্ষা করেন নাই। সে-বার হিমালয়ে খুব তুষারঝঞ্ঝা দেখা দিয়াছে, সারা পাঞ্জাবে পড়িয়াছে দুঃসহ শীত। এমন সময়ে কর্ত্তারপুরে হঠাৎ এক রাত্রে শুরু হইল প্রবল ঝড়ের তাণ্ডব। হাওয়ার মাতামাতি আর বর্ষণের যেন বিরতি নাই। শেষ রাত্রে দেখা গেল নানকের আশ্রম ভবনের একটি বড় দেয়ালের নিম্নাংশ অনেকটা ধ্বসিয়া গিয়াছে।

গুরু নানক মহা ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিলেন, ব্যাকুল স্বরে কহিলেন, "এক্ষুনি এটি মেরামত না ক'রলে তো চলবে না। তোমরা শিগ্‌গীর যা হয় এর একটা ব্যবস্থা ক'র, নইলে ঘর চাপা পড়ে যে সবাইকে প্রাণে মরতে হবে।"

এই অসহ্য শীতে, ঝড় তুফানের মধ্যে কি করিয়া এ কাজ ক'রা সম্ভব? মাল মসলা কি করিয়া যোগাড় হইবে? তাছাড়া, রাজমিস্ত্রীই বা কোথায়? নানকের পুত্রদ্বয় মন্তব্য করিলেন, "রাত ভোর হোক্, ঝড়বৃষ্টি থেমে যাক্, তারপর রাজমিস্ত্রীকে খবর দেওয়া যাবে। সে এসে যা হয় ক'রবে।"

"রাজমিস্ত্রীর কথা উঠছে কেন বলতো? গুরুর আশ্রমের সব কাজ নিষ্পন্ন হয় তাঁর একনিষ্ঠ ভক্ত শিখদের দ্বারা, তা কি তোমাদের জানা নেই?"—বিরক্ত হইয়া নানক ভৎর্সনা করেন।

লহিনা এতক্ষণ চুপ করিয়াই ছিলেন। এবার নীরবে ধীরপদে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু উপকরণ যোগাড়

করিয়া নিজেই ঐ ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ রজনীতে রত হইয়া পড়িলেন গুরুর আদিষ্ট কর্ম্মে।

ক্রমে প্রভাত হয়। কয়েক ঘণ্টা কঠোর পরিশ্রমের ফলে লহিনার কাজও প্রায় সমাপ্ত হইয়াছে। পর্য্যবেক্ষণের পর গুরুগম্ভীর স্বরে নানক কহিলেন, "নাঃ—যেমনটি ভেবেছিলাম তা হয়নি। দেয়াল তুমি মেরামত করেছ বটে, কিন্তু তা বেঁকে গিয়েছে। সবটা ভেঙ্গে ফেলে আবার নূতন ক'রে এটা গ'ড়ে তোল।"

বিনা বাক্যব্যয়ে লহিনা তখনি দেয়াল খুলিয়া ফেলিলেন। আবার নূতন করিয়া নির্ম্মাণের তোড়জোড় শুরু হইল।

পরের বারও গুরুকে সন্তুষ্ট করা গেল না। তিনি কহিলেন, "লহিনা, এবার দেখছি তুমি আরো ভুল করেছো। দেয়ালের গোটা ভিত্তিটাকেই আরো পিছিয়ে দাও—তারপর আবার সবটা নূতন ক'রে তৈরী ক'র।"

গুরুসর্ব্বস্ব লহিনার কাছে গুরুর সামান্যতম ইচ্ছাও সদা শিরোধার্য্য। তাঁর এ ইচ্ছা পূরণের জন্য হাসিতে হাসিতে তিনি প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত। গাঁইতি, পাচন হাতে নিয়া আবার তিনি কাজে নামিলেন।

দিনশেষে দেখা গেল, এবারকার কাজও গুরুর মনঃপূত হয় নাই। আদেশ দিলেন, আবার উহা নূতন করিয়া গড়িতে হইবে।

বারবার এই নিরর্থক ভাঙ্গাগড়া দেখিয়া শিখেরা সবাই অবাক হইয়া গিয়াছেন। গুরুর এক পুত্র তো লহিনাকে বলিয়াই ফেলিলেন, "এরকম একটা অযৌক্তিক ব্যাপার নিয়ে তোমার এমন মত্ত হওয়ার কোন মানে নেই। বোকামী ছাড়া একে আর কি বলা যায়?"

দৃপ্ত ভঙ্গিতে লহিনা উঠিয়া দাঁড়ান। উত্তরে বলেন, "বিদ্যে বুদ্ধি সামর্থ্য যা কিছু ছিল, সবই যে সঁপে দিয়েছি গুরুর চরণে। তা তো আর ফিরিয়ে নিতে পারিনে। তবে গুরুর আদেশের যৌক্তিকতা বিচারের সুযোগ আর পাচ্ছি কই?"

নানক নিকটেই দণ্ডায়মান। প্রশান্ত কণ্ঠে কহিলেন, "এ মানুষটির মূল্য বোঝবার সামর্থ্য তোমাদের কারুর নেই। সেবা ও প্রেমের কঠিনতম

পরীক্ষায় লহিনা হয়েছে সসম্মানে উত্তীর্ণ। অখণ্ড চেতনায় সে উদ্বুদ্ধ হয়েছে, প্রাণে পেয়েছে অলখ্ পুরুষের অমৃত পরশ। ভক্ত লহিনা ধন্য, তাঁকে পেয়ে শিখরাও হয়েছে ধন্য।"

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই নানকের দরবারে উপস্থিত হন তাঁহার যোগী-বন্ধু আর, অনুষ্ঠিত হয় নানকের সেই শিকার-অভিনয়। শবদেহ ভক্ষণের আদেশ দিয়া গুরু পরীক্ষা করেন গুরুগত-প্রাণ লহিনার ভক্তি-পরাকাষ্ঠা। তাঁহার নূতন নামকরণ হয়—অঙ্গদ।

গুরুর আশ্রমে অঙ্গদ একাদিক্রমে তিন বৎসর অতিবাহিত করিলেন, নিষ্ঠাভরে আহরণ করিলেন সাধন জীবনের অমূল্য রত্নরাজী। এবার গুরু একদিন ডাকিয়া কহিলেন, "বৎস, এখন কিছুদিনের জন্য তুমি খাদুরে নিজ ভবনে গিয়ে বাস ক'রো। দীক্ষাবীজ আমার কাছ থেকে ইতিপূর্ব্বে পেয়েছো, পেয়েছো শ্রীভগবানের নামমন্ত্র। সযত্নে তা অভ্যাস ক'রে যাও। তারপর প্রয়োজন মত পাবে আমার নির্দ্দেশ।"

পরম ভক্ত অঙ্গদের দুই চোখ অশ্রুসজল হইয়া উঠে। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে নিবেদন করেন, "বাবা, এতদিন কৃপার ধারা অবিরল বর্ষণ ক'রে এসে আজ আমায় দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন কেন? আপনার সেবায় আমি কি কোন ত্রুটি করেছি?"

"না, অঙ্গদ তা নয়, সেবানিষ্ঠা ও ত্যাগ তিতিক্ষায় তুমি অতুলনীয় আমার ইচ্ছে, তুমি কিছুদিন আমার প্রভাব গণ্ডীর বাইরে থাকো।"

"কেন, গুরুজী?"

"একক প্রয়াসে সাধন ভজন সম্পন্ন ক'রে, ভেতরকার ভিৎ আগে মজবুত ক'রে তোল। বৎস, সংসারকে এড়িয়ে গিয়ে তোমায় সাধন করতে হবেনা, সংসারের আবর্ত্তের মধ্যে বসে থেকেই উদ্‌যাপন ক'র শ্রীভগবানের তপস্যা। তাতে একদিক দিয়ে হবে তোমার পরীক্ষা, অপরদিকে আমার ভক্তগোষ্ঠী পাবে তোমার পবিত্র সাহচর্য্য।"

বিদায়ের সময় উপস্থিত। বিচ্ছেদ ব্যাকুল প্রিয় ভক্তকে আশ্বাস

দিয়া নানক কহিলেন, "বৎস অঙ্গদ, একটা কথা স্মরণ রেখো, যেখানে যত দূরেই তুমি অবস্থান ক'র না কেন, আমায় সব সময়েই পাবে তোমার অন্তরের মধ্যে।"

অঙ্গদ খাদুরে আসিবার সঙ্গে সঙ্গে শহরে চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠে। অনেকেই জানে, নানকের অতি অন্তরঙ্গ শিষ্য তিনি—ভক্ত ও মুমুক্ষুরা তাই দলে দলে আসিয়া ভীড় ক'রে তাঁহার গৃহে।

নগর-প্রধান তখৎ-মল্ল সেদিন তাঁহার কাছে আসিয়া উপস্থিত। দীর্ঘকাল বৈষয়িক জীবন যাপন করিয়া সংসারে বিতৃষ্ণা আসিয়াছে—একান্ত ইচ্ছা, অঙ্গদ তাঁহাকে সাধন ভজন সম্পর্কে কিছু উপদেশ দিন, অধ্যাত্মজীবন গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করুন।

দীনভাবে অঙ্গদ উত্তর দেন, "ভাই, অতি অভাজন আমি। গুরুর সন্তোষ বিধানের যোগ্যতা আমার কই? আমার মত ক্ষুদ্র আধার তাঁর অপার কৃপা ধারণ ক'রবে, তা কি ক'রে সম্ভব? আমি বাবা নানকের শরণ নিয়ে, তাঁর দিকেই সদা তাকিয়ে আছি। তুমিও এই সদ্‌গুরুর দিকেই মুখ ফেরাও, তাঁকে অর্পণ ক'র তোমার ভক্তি আর ভালবাসা—তবেই পূর্ণ হবে তোমার মনস্কাম।"

ভক্তপ্রবর তখনি সোৎসাহে তখৎ-মলকে শ্রবণ করান নানক-রচিত এক স্তবগান—

প্রভু আমার তাদেরই করেন উজ্জীবিত
হৃদয়ে যাদের আছে প্রেমের বীজ,
তাদেরই প'রে অকৃপণ ক'রে ঢালেন কৃপা—
ভুলিয়ে দেন যত কিছু দুঃখ আর শোক।
নিয়তির যেমনতর রয়েছে বিধান
তেমনিভাবে ঘটে গুরুর আবির্ভাব,
উদ্ধার করেন মানুষকে ত্রিতাপ থেকে,
ঢেলে দেন তার তৃষিত কণ্ঠে
শ্রীভগবানের সঞ্জীবনী নামের সুধা।

বিরল সৌভাগ্যে তারাই হয় ভাগ্যবান,
দুঃখী ভিখারীর মত, জন্ম মৃত্যুর পাপচক্র পথে
ঘুরে ঘুরে মরতে হয়না তাদের।
ওগো, যে পেয়েছে প্রভুর দরবারে ঢোকার অধিকার
সে কেন পৃথিবীর মানুষকে জানাবে কুর্ণিস ?
স্বর্গের দ্বারী ঈশ্বরের এই পার্ষদকে খুলে দেবে দ্বার—
আর মর্ত্তের মানুষের মুক্তি-তোরণ
উন্মোচিত হবে তার দাক্ষিণ্যময় কৃপায়।
নিয়তির বিধান বিধৃত রয়েছে প্রভুর হাতে,
কা'র কি করবার আছে তা নিয়ে ?
প্রভু যে আমার সর্ব্বনিয়ন্তা—
সৃষ্টি, স্থিতি আর প্রলয়ের আবর্ত্তন-চক্র
ঘুরছে সদাই তাঁর দৃষ্টির ইঙ্গিতে।
হে নানক, ডুবে যাও প্রভুর নামসুধার সাগরে
ধন্য হও পেয়ে তোমার পরম ধন।[১]

এই অপূর্ব্ব স্তব রচনা করিয়াছেন সদ্‌গুরু নানক, আর আবেগভরে অশ্রু ছল ছল নেত্রে গাহিতেছেন তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য অঙ্গদ। শ্রবণমাত্র তখৎ-মলের হৃদয়ে বিস্তারিত হয় এই স্তবগাথার অলৌকিক প্রভাব। ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া বারবার অঙ্গদের চরণে সে জানাইতে থাকে নম্র প্রণতি।

অঙ্গদ লোকের কাছে যতই বৈষ্ণবীয় দৈন্য দেখান, লোকে ততই তাঁহাকে গণ্য ক'রে উচ্চ কোটির এক মহাপুরুষ বলিয়া। কর্ত্তারপুরে গুরু নানকের প্রধান শিষ্যরূপে তাঁহার খ্যাতি আগে হইতেই রটিয়াছে। এবার, এখানে আসার পর তাঁহাকে দর্শন করিয়া, তাঁহার কথা শুনিয়া, লোকের আকর্ষণ আরো বাড়িয়া উঠিতেছে। জিজ্ঞাসু ও দর্শনার্থীরা ভীড়

১ ম্যাকলিফ্ : ভল্যু ২, পৃঃ ৭

করিতেছে দলে দলে। ভক্তও কম জুটে নাই। সবাই মিলিয়া তাঁহার বাসভবনকে একটি আশ্রম বানাইয়া তুলিয়াছে, আর অভ্যাগত ও শরণার্থীদের আহারের জন্য খোলা হইয়াছে ছোটখাটো একটি লঙ্গরখানা।

এভাবে ভক্ত-প্রধান অঙ্গদকে কেন্দ্র করিয়া খাদূরে নানকপন্থী শিখদের একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে। বহুলোক তাঁহার আশ্রয়লাভ করিয়া ধন্য হয়।

প্রিয় শিষ্যকে দেখার জন্য নানক সদলবলে দুইবার তাঁহার গৃহে আগমন করেন। কৃপালু গুরুর নিকট হইতে নিগূঢ় সাধনার নানা নির্দ্দেশ এ সময়ে অঙ্গদ প্রাপ্ত হন, লাভ করেন বহু আকাঙ্ক্ষিত ভক্তি-সিদ্ধি। শ্রীভগবানের দিব্য সত্তাকে সারা জগৎ সংসারে অনুস্যূত দেখিয়া হন তিনি কৃতকৃতার্থ।

শেষবারের মত নানক সেবার খাদূরে উপস্থিত হইয়াছেন। অন্তরঙ্গ ভক্তদের সঙ্গে কয়েকটি দিন কাটিয়া গেল পরম আনন্দে। বিদায় গ্রহণের প্রাক্কালে, নিভৃতে প্রিয় পার্ষদ অঙ্গদকে তিনি কাছে ডাকিলেন। স্নেহপূর্ণ স্বরে কহিলেন, "বৎস, তোমার কৃচ্ছ্র, ত্যাগ ও তপস্যার পালা এবার শেষ হয়েছে। এসব কোন কিছুতেই আর তোমার দরকার নেই। আমার সাধন-ঐশ্বর্য্য তুমি লাভ করেছ, তোমার আর আমার ভেতরে আজ আর কোন পার্থক্য নেই। তোমার অঙ্গদ নাম সার্থক হয়ে উঠেছে, তুমি অর্জ্জন করেছো আমার স্বরূপ। আজ তুমি আমার শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ ও অভিনন্দন গ্রহণ ক'র।"

কিছুদিন পরের কথা। ভক্ত অঙ্গদ সে-বার গুরুদর্শনে কর্ত্তারপুরে গিয়াছেন। আশ্রমে আজকাল ভীড় প্রায় সব সময় লাগিয়াই থাকে এবং যাহারাই গুরুকে দর্শন করিতে আসে দুই চারিদিন এখানে অবস্থান করিয়া যায়। এই বিপুল সংখ্যক অতিথির থাকা-খাওয়ার সব ব্যবস্থা নানক ও তাঁহার শিষ্যদেরই করিতে হয়।

অঙ্গদ যেদিন গুরুর আশ্রমে পৌঁছিলেন সেদিনও বহু দর্শনার্থীর সমাগম সেখানে হইয়াছে। তখন ঘোর বর্ষা আর দুর্যোগের সময়। অবিরল

ধারে বারিপাত চলিয়াছে আর সেই সঙ্গে রাবী নদীর বন্যায় কূল হইয়াছে প্লাবিত। আশ্রমের খাদ্য শস্য সব ফুরাইয়া গিয়াছে, আর নূতন করিয়া সংগ্রহ করারও কোন উপায় দেখা যাইতেছেনা। অথচ বহু অতিথিকে খাওয়ানের দায়িত্ব রহিয়াছে। পরিচালকেরা নিরুপায় হইয়া নানকের শরণাপন্ন হইলেন।

সারা অঞ্চল জলে ভাসিয়া গিয়াছে, বহু খোঁজাখুঁজি করিয়াও সকলে খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কথিত আছে, আশ্রমিকদের এই সঙ্কট মোচনের জন্য নানক সেদিন প্রয়োগ করেন তাঁহার যোগৈশ্বর্য্য।

ধ্যানাসন ত্যাগ করিয়া তিনি বাহিরে আসিলেন, অন্তরঙ্গ শিখদের নিয়া উপস্থিত হইলেন নিকটস্থ বাগিচায়। একটি কীকড় গাছের নীচে উপস্থিত হইয়া অঙ্গদকে আদেশ দিলেন, "বৎস, এর শাখায় আরোহণ ক'রে খুব জোরে ঝাঁকুনি দাও তো। তোমাদের সবাইর উপযোগী পর্য্যাপ্ত উপাদেয় খাবার এখান থেকেই মিলবে।"

সকলে বিস্ময়ে হতবাক্। এ কি অবিশ্বাস্য কথা গুরু কহিতেছেন? নানকের পুত্র শ্রীচাঁদ বলিয়া উঠেন, "কীকড় গাছের ডালপালা কাঁটায় ভরা, ফলগুলো তিক্ত, অখাদ্য। এ গাছ থেকে সুস্বাদু কিছু পাওয়া যায় এমন অদ্ভুত কথা তো কখনো শুনিনি।"

"শোননি, তা ঠিকই। তবে আজ এখানে দাঁড়িয়ে সবাই চাক্ষুষ দর্শন ক'র, ভক্তের সঙ্কট হলে, সঙ্কল্পে সে দৃঢ় হলে, অবশ্যই শ্রীভগবানের কৃপার অলৌকিক প্রকাশ ঘটে। এতে অস্বাভাবিকত্ব কিছু নেই। ভক্তবীর অঙ্গদ আজ তোমাদের সবাইকে বিপদ থেকে উদ্ধার ক'রবে।"

গুরুর ইঙ্গিত মাত্র অঙ্গদ সম্মুখস্থ কীকড় বৃক্ষে আরোহণ করিলেন। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিবার সঙ্গে সঙ্গে ভূতলে পড়িতে লাগিল রাশি রাশি রসনাতৃপ্তিকর ফল ও মিষ্টদ্রব্য।[১]

এই অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিয়া ভক্ত শিখেরা আনন্দে অধীর হয়, বার বার জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিতে থাকে।

---

[১] ম্যাকলিফ্: দ্য শিখ্ রিলিজিয়ন্—ভল্যু ২, পৃঃ ২২

কয়েকজন প্রধান শিখ যুক্তকরে আগাইয়া আসে, নানকের চরণ বন্দনা করিয়া কৃতজ্ঞতার সুরে বলে, "বাবা, আমরা সবাই আজ ধন্য। আপনার এমনতর যোগ বিভূতির লীলা এখানে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করলাম, তাতো কম সৌভাগ্যের কথা নয়!"

"এজন্য ধন্যবাদ দাও ভক্ত অঙ্গদকে।"

"সে কি কথা, বাবা! অঙ্গদের এখানে কি কর্‌বার ছিল? আসলে আজকের এই অভাবনীয় কাণ্ড সংঘটিত হয়েছে আপনারই অলৌকিক সিদ্ধাইর বলে। বুঝতে পেরেছি, এ বিভূতি-লীলা আপনি প্রকটিত করেছেন ভক্ত ও মুমুক্ষুদের বিশ্বাস দৃঢ় করার জন্য, জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের জন্য।"

"বিভূতি-লীলা আমার—একথা তোমরা ঠিকই বলেছ। কিন্তু লীলা কখনো সম্ভব হয় কি, লীলার চিহ্নিত ধারক ও বাহক এগিয়ে না এলে? ভক্তিসিদ্ধ অঙ্গদের জন্যই ঐশ্বরীয় শক্তির এই প্রকাশ আজ তোমরা দেখতে পেলে। অঙ্গদের মনে যে প্রবল আর্ত্তি জেগেছিলো—গুরুর আশ্রমে এতগুলো লোক অনাহারে থাকবে, গুরুর এই অমর্য্যাদা তাঁকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হবে! শ্রী ভগবান তার সে আর্ত্তি শুনেছিলেন। সে যখন আমার আসনের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো, আমার ভেতর থেকে বেড়িয়ে এলো একটা অমোঘ ঐশী নির্দ্দেশ। কাজেই আজকের এ ঘটনার জন্য অঙ্গদকেই তোমরা অভিনন্দন জানাও।"

সেদিন শিখদের এক বিশেষ পুণ্যদিন। জপজী ও আশা-কি-উয়র-এর শেষে দরবারে বসিয়া গুরুজী তত্ত্ব ও সাধন সম্পর্কে ভক্তদের নির্দ্দেশ দিতেছেন। হঠাৎ পবিত্র গদি হইতে তিনি নামিয়া আসিলেন। ধীর প্রশান্ত কণ্ঠে সবাইকে ডাকিয়া কহিলেন, "তোমরা—প্রবীণ ও নবীন ভক্তেরা—অনেকেই এখানে উপস্থিত রয়েছো। আজ তোমাদের সবার সমক্ষে আমি আমার দীর্ঘ জীবন নাট্যের একটা বড় অধ্যায় সমাপন ক'রবো। এ পরিবর্ত্তনের সাথে একা আমিই সংশ্লিষ্ট তা নয়, সমগ্র শিখমণ্ডলীও তাতে জড়িত রয়েছে।"

বাবা নানক কি বলিতে চাহেন, তাহা বুঝা যাইতেছেনা, ভক্তেরা

ঔৎসুক্যভরে নির্নিমেষে তাঁহার দিকে তাকাইয়া আছেন। ক্ষণপরে আগাইয়া আসিয়া তিনি অঙ্গদের হস্ত ধারণ করিলেন, সস্নেহে তাঁহাকে উপবেশন করাইলেন নিজের গদিতে।

পার্শ্বস্থিত থলির উপর সাজানো ছিল একটি নারিকেল ও পাঁচটি তাম্রমুদ্রা। অঙ্গদের সম্মুখে সেটি স্থাপন করিয়া প্রবীণ শিখ ভাই-বুধাকে গুরু কহিলেন, "তোমাদের কাছে আজ আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করতে চাই। তোমরা সবাই জেনে রাখো—ভক্ত অঙ্গদই হচ্ছে আমার গদির উত্তরাধিকারী। বুধা, তুমি সকলের তরফ থেকে অঙ্গদের কপালে চন্দনের টিপ পরিয়ে দাও। আর, সবাই মিলে জয়ধ্বনি দাও জগৎ-প্রভু অলখ্ পুরুষের।"

আদেশ তখনি পালিত হইল। সারা দরবার মুখর হইয়া উঠিল ভক্ত শিষ্যদের আনন্দগুঞ্জনে।

সবাইকে উদ্দেশ করিয়া নানক আবার কহিলেন, "আমার আদেশ, তোমরা সবাই আমায় যেমন এতদিন কায়মনোবাক্যে সেবা করেছো, শ্রদ্ধা ভক্তি ও আনুগত্য দিয়েছো, অঙ্গদের বেলায়ও তা অবশ্য ক'রবে। সে যে আমারই প্রতিমূর্ত্তি।"

অঙ্গদ গুরুজীর গদি প্রাপ্ত হওয়ায় নানকের দুই পুত্র তেমন সুখী হইতে পারেন নাই। নিজেরা মনে মনে যে আকাঙ্ক্ষা এতদিন পোষণ করিতেছিলেন, তাহা পূরণ হওয়ার আর কোন আশা রহিল না।

পুত্রদ্বয়ের দিকে তাকাইয়া নানক কহিলেন, "গুরুর পদ অধিকার সে-ই শুধু ক'রতে পারে, যে তার জীবন-সাধনা সমাপ্ত করেছে চরম ত্যাগ-তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে, আর গুরুর মধ্যে যে নিজেকে দিয়েছে অবলুপ্ত ক'রে।"

গদি আরোহণ-পর্ব্ব শেষ হওয়ার পর গুরু নির্দ্দেশ দিলেন, "অঙ্গদ, তুমি খাদুরে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস ক'রতে থাকো। আচার্য্য ও পথপ্রদর্শকরূপে ভার নাও সহস্র সহস্র শিখভক্তের। অচিরেই আমার জীবন দীপ নির্ব্বাপিত হবে। তার জন্য আগে থেকে প্রস্তুত হও, বৎস।"

অশ্রু-ছলছল নয়নে অঙ্গদ আশ্রম হইতে বিদায় নিলেন, স্বীয় ভবনে ফিরিয়া আসিয়া শুরু করিলেন গুরু-আদিষ্ট কর্ম্মের উদ্‌যাপন।

অঙ্গদকে গুরুগদীতে সমাসীন করার কিছুদিনের মধ্যেই মহাসাধক নানক তাঁহার মর্ত্তলীলার ছেদ টানিয়া দেন, অগণিত ভক্ত ও মুমুক্ষু গুরুর বিহনে নিমগ্ন হন শোকের পাথারে।

অঙ্গদ শোকে বড় মুহ্যমান হইয়া পড়েন, হৃদয়ে তাঁহার জাগিয়া উঠে তীব্র নির্ব্বেদ। বারবার ভাবিতে থাকেন, গুরু নানক ছিলেন তাঁহার জীবনের আলো, সেই আলোই যদি এমন করিয়া নিভিয়া গেল তবে কেন আর জনজীবনের মধ্যে, অসার সংসারের মধ্যে, অনর্থক জড়াইয়া থাকা। কেনই বা এই গুরুগিরি?

বিষণ্ণ মনে একাকী সেদিন পথ চলিতেছেন, হঠাৎ নারী ভক্ত নেহালীর সঙ্গে তাঁহার দেখা। অতি দীন দরিদ্রা সে—ঘুঁটে বেচিয়া দিনাতিপাত চলে, কিন্তু সাধু সন্তের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তির সীমা নাই। নিজের সঙ্গতি থাকুক না থাকুক, মহাত্মাদের দর্শন পাইলেই তাঁহাদের সেবার জন্য সে তৎপর হইয়া উঠে।

নেহালী সাদর অভ্যর্থনা জানাইতেই অঙ্গদের মনে এক নূতন চিন্তা খেলিয়া গেল। গুরুর অদর্শনের পর বহিরঙ্গ জীবনের প্রতি বড় বিতৃষ্ণা জাগিয়াছে। এবার কিছুদিন আত্মগোপন করিয়া থাকিয়া ধ্যান ভজনে অতিবাহিত করা মন্দ কি?

কহিলেন, "নেহালী, তুমি আমার একটা উপকার ক'রবে? আমি ভাব্‌ছি, কিছুদিনের জন্য লোকলোচনের বাইরে থাক্‌বো। একটা ছোট্ট ঘর আমায় ছেড়ে দিতে পারো?"

"কেন পারবোনা, প্রভু? আপনার জন্য এ সামান্য কাজটি করতে পারা—সে তো আমার মত অভাগিনীর পরম সৌভাগ্য"—যুক্তকরে নেহালী নিবেদন ক'রে।

"এই ঘরে আমি নিভৃতে বাস ক'রবো, ভজন আর গুরুর স্মরণ-মননে রত থাক্‌বো। আর ত্থাখো, কখনো কাউকে আমার সংবাদ তুমি জানাবে

না। বাইরে থেকে দরজায় তালা দিয়ে রাখবে, আর দিনান্তে অল্প একটু দুধ রেখে আসবে আমার আহারের জন্য।"

নেহালী সোৎসাহে রাজী হয়, আর সেই দিন হইতে ঘুঁটে-কুড়েনীর কুঁড়ে ঘরটিতে শুরু হয় অঙ্গদের অজ্ঞাতবাস। ছয় মাসের অধিক কাল এভাবে অতিবাহিত হইয়া যায়।

বাবা-নানক লোকান্তরে গিয়াছেন, নূতন গুরু অঙ্গদও লোকলোচন এড়াইয়া সাধন ভজনে কোথায় রহিয়াছেন নিমগ্ন। মাসের পর মাস অতিক্রান্ত হয়, তবুও কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। ভক্ত শিখেরা দুঃখ, শোক ও হতাশায় ভাঙ্গিয়া পড়ার মত হইয়াছেন।

প্রবীণ ও ভজনশীল সাধু বলিয়া শিখমণ্ডলীতে ভাই-বুধার খ্যাতি যথেষ্ট। নানকের প্রিয় এবং অন্তরঙ্গ ভক্ত হিসাবেও সকলে তাঁহাকে মান্য করিয়া চলে। শীর্ষস্থানীয় শিখ সাধকেরা সেদিন সবাই দল বাঁধিয়া তাঁহার কাছে গিয়া উপস্থিত।

ভারাক্রান্ত হৃদয়ে, অনুযোগের সুরে তাঁহারা কহিলেন, "ভাই-বুধা, আমাদের বিপদের কথা সবই তুমি জান। বাবা নানক গত হয়েছেন। তাঁর অভাবে তাঁর দ্বিতীয় স্বরূপ, গুরু অঙ্গদ, শিখদের আশ্রয় দেবেন এই আশায় সবাই বুক বেঁধেছিল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি কোথায় আজ আত্মগোপন ক'রে রয়েছেন। অনুসন্ধানের কিছু বাকী রাখিনি, কিন্তু কোন ফল হয়নি। এই বিপদ থেকে তোমায় আমাদের উদ্ধার ক'রতে হবে।"

"কিন্তু, আমি এ বিষয়ে কি করতে পারি ?"

"পারলে—তুমিই পারো, ভাই-বুধা, ধ্যানযোগে জেনে নিয়ে তুমি আমাদের ব'লো—অঙ্গদ কোথায় লুকিয়ে রয়েছেন। শোক-বিহ্বল ভক্ত শিষ্যদের হৃদয়ে একমাত্র তুমিই আজ এনে দিতে পারো সান্ত্বনা ও শান্তির প্রলেপ।"

সকলের একান্ত অনুরোধে ভাই-বুধাকে অগত্যা রাজী হইতে হইল। ধ্যানযোগে তিনি জানিতে পারিলেন, অঙ্গদ নগরের উপান্তে এক দরিদ্রা

ঘুঁটেওয়ালীর ঘরে বসিয়া গোপনে সাধন ভজনে রত রহিয়াছেন। একেবারে অন্তর্মুখীন। বহির্জ্জগতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের আর তাঁহার ইচ্ছা নাই।

ভাই বুধাকে মুখপাত্র করিয়া শিখের দল ব্যাকুল হৃদয়ে সেদিন গুরু অঙ্গদের নূতন বাসস্থানে গিয়া উপস্থিত। কিন্তু দেখা গেল, কক্ষের দ্বারটি বাহির হইতে তালাবদ্ধ রহিয়াছে।

আগন্তুকদের প্রশ্নের উত্তরে নেহালী নিবেদন ক'রে, "আপনারা ভুল ক'রে এখানে এসেছেন। এটা আমারই কুঁড়ে ঘর, আমি একলাটি এখানে বাস করি। গুরু অঙ্গদ বলে কেউ তো এখানে থাকেন না।"

ভাই বুধার দুই চোখ প্রদীপ্ত হইয়া ওঠে। দৃঢ়স্বরে বলিয়া উঠেন, "নারী, তুমি বৃথা আমাদের সঙ্গে চাতুরী করছো, আমার ধ্যানদৃষ্টি কখনো তো ভুল করতে পারে না। আমরা ঠিক স্থানেই এসেছি, তাতে সন্দেহ নেই। তাছাড়া, তুমি একটা কথা স্মরণ রেখো, সূর্য্য সদাই স্বপ্রকাশ, তার আলোকধারা স্বাভাবিকভাবেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি গুরু অঙ্গদের আবির্ভাব ও অবস্থিতির কথা লুকানো কখনো সম্ভব নয়। আমি ধ্যানযোগে জেনেছি, তিনি এখানে এই রুদ্ধকক্ষের ভেতরে সশরীরে বিরাজিত। গুরুকে তুমি নিবেদন ক'র, আমরা সবাই তাঁর দর্শনপ্রার্থী।

সংবাদ পাওয়া মাত্র অঙ্গদ বাহির হইয়া আসিলেন, ভাই বুধা প্রভৃতি প্রাচীন ভক্তদের দিলেন প্রগাঢ় আলিঙ্গন।

গুরুর দিকে দৃষ্টি পড়তেই, ভক্ত শিষ্যেরা চমকিয়া উঠিলেন। ছয় মাসের নিভৃত সাধনায় একি অদ্ভুত রূপান্তর তাঁহার? এ যেন গুরু নানকেরই এক দ্বিতীয় মূর্ত্তি। মুখে চোখে রহিয়াছে সেই স্বর্গীয় দীপ্তি, কথাবার্ত্তা ও আচরণ তাঁহারই মত। এমন কি আকৃতিও হইয়াছে বাবা-নানকের অনুরূপ। সবাই বুঝিলেন, এই ছয় মাসের ধ্যান ভজনময় নিভৃত জীবনে অঙ্গদ লাভ করিয়াছেন অপরিমেয় সাধন-ঐশ্বর্য্য, রূপান্তরিত হইয়াছেন এক ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষরূপে। পরমানন্দে সবাই মিলিয়া তাঁহার জয়ধ্বনি দিতে লাগিলেন।

অন্তরঙ্গ ভক্ত ও বন্ধুদের সহিত মিলনে অঙ্গদের চিত্ত প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। কহিলেন, "ভাই বুধা, দেশের সবাই জানে—বাবা নানকের শিষ্যদের মধ্যে তুমি প্রবীণ ও জ্ঞানী। গুরুকৃপার বলে অলৌকিক শক্তিও তুমি কম অর্জ্জন করোনি। তাই আত্মগোপনের চেষ্টা করেও তোমায় ফাঁকি দিতে পারলাম কই?"

উত্তরে বুধা কহিলেন, "গুরু-গদী এভাবে খালি থাকবে, এমন ইচ্ছা নিশ্চয়ই বাবা নানকের কখনো ছিল না। তুমি আবার জনজীবনে ফিরে এসো, উদ্ধার ক'র ভক্ত ও মুমুক্ষুদের।"

অঙ্গদকে এবার সম্মতি জানাইতে হইল, কহিলেন, "ভাই বুধা; বেশ, তোমাদের ইচ্ছাই তবে পূর্ণ হোক, ভক্তদের মধ্যেই এবার আমি ফিরে যাচ্ছি।"

শিখদের দিকে তাকাইয়া অঙ্গদ সহাস্যে কহেন, "স্বয়ং বাবা-নানকও ভাই বুধাকে প্রশংসা করতেন, আমি তো কোন্ ছার। আর জানতো, ভাই-বুধা কি ক'রে গুরুর কাছে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। বুধা তখন বালক মাত্র। আক্রমণকারী সুলতানের সৈন্যেরা একদিন তাঁর গ্রামের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো, ক্ষেতের সমস্ত পাকা ফসল নিঃশেষ ক'রে কেটে নিয়ে গেল। বুধা ছুটে গিয়ে তাঁর বাপকে বল্লেন,—'একি সব কাণ্ড! সব যে ওরা নিয়ে গেল, আমরা সবাই কি না খেয়ে মরবো? তুমি এখনি গিয়ে হানাদারদের থামাও।' বাপ বল্লেন, 'একি বলছিস তুই? সুলতানের সেনার বিরুদ্ধে লড়বো, সে ক্ষমতা আমার কই?' ছোটকাল থেকেই ভাই-বুধা বড় চিন্তাশীল। মনে তাঁর আলোড়ন উঠ্‌লো—'বাবা সুলতানের আক্রমণ থেকেই আমাদের বাঁচাতে পারছেন না, তবে মৃত্যুর হাত থেকে কি ক'রে বাঁচাবেন?'"

ভাই বুধা সলজ্জকণ্ঠে বাধা দেন, কহেন, "গুরু অঙ্গদ, কি লাভ এসব পুরাণো কথা তুলে, বলতো?"

"কিছু লাভ আছে বৈ কি; তোমার মত মহান লোকের জীবন চিত্র সাম্‌নে তুলে ধরলে, মানুষ যে চরিত্র পায়, শক্তি পায়, আর পায় সত্যকার জ্ঞান বুদ্ধি।"

সঙ্গীদের দিকে তাকাইয়া আবার অঙ্গদ বলা শুরু করেন, "হ্যাঁ, তারপরই বুধা ছুটে আসেন বাবা নানকের কাছে। নানক তাঁর অন্তরের কথা শুনে মহা উৎফুল্ল। বলেন—ভাই, তুমি যে বয়সে বালক হয়েও জ্ঞানী লোকের মত কথা বলছো! পুর্ব্বজন্মের সংস্কার বশে, প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয়েছে তোমার মধ্যে—যা মানুষের জীবনে আসে বৃদ্ধ অবস্থায়, নানা তিক্ত অভিজ্ঞতা ও ঘাত প্রতিঘাতের ফলে। তুমি সত্যই জ্ঞানবৃদ্ধ! আজ থেকে তাই তোমার নূতন নামকরণ হলো—বুধা (বৃদ্ধ)। বাবা-নানক ভাই-বুধার জ্ঞানকে সদাই নিয়োজিত করতেন শিখদের সেবায়।"

শিখদের সমভিব্যাহারে অঙ্গদ সেদিন তাঁহার অজ্ঞাতবাস হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, তারপর পূর্ব্ববৎ সমাসীন হইলেন গুরু-গদীতে।

তাঁহার দিনচর্য্যার বেশীর ভাগ ব্যয়িত হইত ঈশ্বরপ্রসঙ্গ, ভজন আর মুমুক্ষু ও আর্ত্তদের কল্যাণে। রাত্রি শেষ হওয়ার তিন ঘণ্টা আগে তিনি শয্যাত্যাগ করিতেন, নদীতে স্নান সমাপন করিয়া আসিয়া উপবিষ্ট হইতেন ধ্যানাসনে। উদয়শিখরে প্রাতঃসূর্য্যের আবির্ভাব ঘটিবার আগেই দরবারে তাঁহাকে ঘিরিয়া ভক্তেরা শুরু করিত জপজী ও আশা-কি-উয়র। তারপর আর্ত্ত ও দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্তদের দুঃখ তাপ নিবারণের পালা। সিদ্ধ মহাত্মার অঙ্গনে দূর দূরান্ত হইতে আসিয়া এই সব লোক ধর্না দিত। কৃপা লাভের পর সানন্দে প্রত্যাবর্ত্তন করিত নিজ নিজ গৃহে।

অঙ্গদের ধর্ম্ম-দরবার ছিল এক দর্শনীয় বস্তু। তত্ত্ব উপদেশ এবং ভজন সঙ্গীতে প্রায়ই ইহা মুখর হইয়া উঠিত—ভক্ত, মুমুক্ষু, সাধক ও দর্শনার্থীদের হৃদয়ে আনিত উজ্জীবন ও উদ্দীপনা।

এই দরবার ছিল সর্ব্বজনীন। সর্ব্বস্তরের মানুষ—অন্ত্যজ ও দরিদ্রতম ব্যক্তি হইতে শুরু করিয়া সমাজের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও ধনী ব্যক্তিরা এখানে উপস্থিত হইতেন, মহান্ গুরুর উপদেশ ও আশীর্ব্বাদে লাভ করিতেন শান্তি ও ভগবৎপ্রেম।

অঙ্গদের সাধন-উপদেশের মর্ম্মকথা ছিল—আত্মত্যাগ ও শরণাগতি।

লৌকিক ও অলৌকিক শক্তির মাধ্যমে সাধনার এই দুইটি মূল তত্ত্ব জিজ্ঞাসুদের হৃদয়ে তিনি গ্রথিত করিয়া দিতেন।

ধিঙ্গা নামক এক ক্ষৌরকার-ভক্ত অঙ্গদের প্রিয়পাত্র ছিল। জিজ্ঞাসু হইয়া একদিন সে নিবেদন ক'রে, "বাবা, আমি মূর্খ, দীনহীন। কিন্তু মনে দুরাশা রয়েছে প্রচুর। শ্রীভগবানের পরমপদ পাবার জন্য আপনার আশ্রয়ে ভিখারীর মত পড়ে আছি। কৃপা ক'রে সত্যকার পথটি আমায় দেখিয়ে দিন।"

উত্তরে অঙ্গদ বলেন, "ধিঙ্গা, দীনহীন বলেই যে তোমার সুবিধা বেশী, আগে থেকেই আমার করুণাময় প্রভুর করুণার পাত্র হয়ে আছো। প্রভুর রাতুল চরণ পেতে হলে, সর্ব্বাগ্রে চাই সেই চরণে আত্মোৎসর্গ। গুরু-সেবা আর গুরুর প্রতি একৈকনিষ্ঠা ছাড়া সে আত্মোৎসর্গ তো কখনো আসে না। আত্মাভিমান বিনষ্ট করে গুরুর কাছে আশ্রয় নাও, তিনিই পৌঁছে দেবেন পরম প্রভুর ধামে।"

মালু শাহ নামে একটি ভক্ত কোন মুঘল সেনাধ্যক্ষের অধীনে কাজ করিত। তত্ত্বোপদেশের জন্য অঙ্গদকে সে ধরিয়া বসিলে তিনি উত্তর দেন, "মালু, তোমার সাধনা শুরু ক'র তোমার ঐ মনিবেরই সেবার ভেতর দিয়ে। যত বিপদই আসুক, প্রতিপক্ষের যত আক্রমণই ঘটুক, মনিবের পাশে দাঁড়িয়ে তাকে রক্ষা ক'রা, তার জন্য আত্মোৎসর্গ করাই হচ্ছে তোমার প্রধান কর্ত্তব্য। আর এটাই হবে তোমার ধর্ম্মজীবনের আসল ভিত্তি।"

সারা জীবন পাপকর্ম্মে লিপ্ত থাকার পর কিদারু নামক এক ব্যক্তি অনুতপ্ত হৃদয়ে মহাপুরুষ অঙ্গদের শরণ নেয়। বারবার মিনতি জানাইতে থাকে, "বাবা, পাপের আগুন চারদিক থেকে যেন আমায় ঘিরে ধরেছে। দয়া করে বলুন, আমার উপায় কি, উদ্ধারের পথই বা কি?"

আশ্বাসভরা কণ্ঠে অঙ্গদ কহিলেন, "বৎস কিদারু, গহন অরণ্যে যখন দাবানল জ্বলে ওঠে, অসহায় হরিণগুলো কি ক'রে? ভীত চঞ্চল

হয়ে প্রথমটায় তারা এদিক ওদিকে খুব খানিকটা ছুটাছুটি ক'রে। তারপর ছায়াচ্ছন্ন স্নিগ্ধতোয়া একটি সরোবরের তীরে গিয়ে উপস্থিত হয়, দেহটি শীতল ক'রে নেয়। তেমনি পাপের আগুনকেও এড়াতে হবে সমর্থ সিদ্ধ গুরুর চরণ-ছায়াতলে বসে। তার উপদেশই বুলিয়ে দেবে চিরশান্তির প্রলেপ।"

বলওয়ান্দ্‌ ও সত্তা, এই দুইজন ছিল গুরু অঙ্গদের ধর্ম্মদরবারের প্রধান গায়ক। সুকণ্ঠ ও সঙ্গীতজ্ঞ বলিয়া তাহাদের খুব সুনাম। শত শত ভক্ত ও দর্শনার্থী তাহাদের ভজন গান শুনিবার জন্য ভীড় ক'রে, মুগ্ধ হইয়া জানায় প্রশংসাবাদ।

বলওয়ান্দ্‌ ও সত্তার মনে কিন্তু ধীরে ধীরে অহঙ্কার জাগিয়া উঠে, ক্রমে উহা সীমা ছাড়াইয়া যায়। যখন তখন স্বেচ্ছামত লোকের উপর তাহারা উপদ্রব ক'রে, এমন কি প্রধান ও শ্রদ্ধাভাজন শিখদেরও কটূক্তি অপমান করিতে তাহারা ছাড়ে না। এ সব কথা গুরু অঙ্গদের কাণে যায় এবং তিনি মহা অপ্রসন্ন হইয়া উঠেন।

উদ্ধত গায়কদ্বয়ের কিন্তু তাহাতে ভ্রুক্ষেপ নাই বরং গুরুর সঙ্গেই তাহারা ঝগড়া শুরু করিয়া দেয়। শেষটায় ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিলে অঙ্গদ ইহাদিগকে একদিন সভা হইতে দূর করিয়া দেন।

বলওয়ান্দ্‌ ও সত্তা এবার প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ক'রে, বলিতে থাকে, "বটে! গুরু দরবারের প্রধান গায়ক হচ্ছি আমরা। সেই আমরাই যদি চলে যাই, দরবারের জৌলুষ আর কি থাকে? এবার থেকে আমরা নিজগৃহে ভজন-গানের সভা বসাবো। সবাই অবাক হয়ে দেখবে, কেমন ভীড় জমে যায়, কেমন এক নূতন মণ্ডলী গড়ে ওঠে।"

বলা বাহুল্য শিখেরা কেহই এই দুষ্টদের সমর্থন দেয় নাই। অবশেষে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই উহারা চরম দুর্ভোগের মধ্যে পতিত হয়। বন্ধু বান্ধবেরা কেহ আজকাল আর দেখা সাক্ষাৎ করিতে আসে না, ভক্ত শিষ্যেরাও সতর্কভাবে তাহাদের এড়াইয়া চলে। সামাজিক অসহযোগ,

লাঞ্ছনা ও অর্থকষ্টের ফলে বলওয়ান্দ্ ও সত্তা একেবারে মুষড়িয়া পড়ে। হৃদয়ে জাগে তীব্র অনুতাপ, প্রধান ভক্তদের কাছে গিয়া মিনতি করিতে থাকে, "আমরা না বুঝে এমন কুকর্ম্ম করে ফেলেছি। গুরুর বিরুদ্ধাচরণ করে অধর্ম্মে পতিত হয়েছি। তোমরা বলে ক'য়ে এবারকার মত আমাদের মাপ করিয়ে দাও।"

অঙ্গদের কাছে একথা একদিন সসঙ্কোচে উত্থাপন করা হয়। তিনি তো চটিয়া আগুন। উত্তেজিত স্বরে কহিলেন, "ভুল আর বোকামীর মার্জ্জনা আছে, কিন্তু গুরু বিরোধিতার মত পাপ নেই, আর এ পাপের নেই মার্জ্জনা। এই দুষ্টদের হয়ে যে সুপারিশ কর'বে তাকেও আমি দণ্ড দেবো মণ্ডলীর শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য। গোঁফ দাড়ি কামিয়ে মাথা ন্যাড়া ক'রে তাকে গাধার পিঠে তুলে দেওয়া হবে, তারপর ঘোরানো হবে শহরের রাজপথ দিয়ে।"

মাস দুই পরে বলওয়ান্দ্ ও সত্তা লাহোরে গিয়া নানকের অন্তরঙ্গ শিষ্য ভাই-লাধাকে খুব ধরিয়া বসে। কাঁদিয়া কাটিয়া অনুনয় করিতে থাকে, "ভাইজী, আমরা সবাই জানি, গুরু অঙ্গদ আপনাকে শ্রদ্ধা করেন এবং ভালোবাসেন। গুরু আমাদের ওপর বড় ক্রুদ্ধ হয়ে রয়েছেন। তাঁকে বলুন, এবারটির জন্য আমাদের অপরাধ তিনি মাপ করুন, দরবারে ফিরে যাবার হুকুম দিন। আমরা জানি, আপনার কথা কখনো তিনি ঠেলতে পারবেন না।"

ভাই লাধা আদ্যোপান্ত সব কথাই শুনিয়াছেন। এই দুই বিদ্রোহী শিষ্যের মার্জ্জনার জন্য যে বলিতে আসিবে, গুরু তাহাকেও দণ্ড দিতে ছাড়িবেন না, এ কথাও তাঁহার জানা আছে। অথচ এই অনুতপ্ত শিখদ্বয়কে সাহায্য না করিয়াই বা তিনি থাকেন কি করিয়া? হৃদয় বড় দয়ার্দ্র হইয়া উঠিল। আপন মনে কহিতে লাগিলেন, এই দুষ্কৃতদের পাপ স্খালনের চেষ্টায় সাহায্য নিশ্চয় দিতে হবে। যত পথভ্রান্তই তারা হোক্, সংশোধনের সুযোগ কেন তারা পাবে না? কেন পাবে না কৃপালু গুরুর মার্জ্জনা?"

পরদিন খাদুর শহরের রাজপথে দেখা গেল এক বিচিত্র শোভাযাত্রা। সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় শিখ সাধক, ভাই লাধা, একটি গর্দ্দভের পিঠে বসিয়াছেন উল্টা হইয়া, লেজের দিকে মুখ করিয়া। মস্তক তাঁহার মুণ্ডিত, সারা মুখে কালিঝুলি মাখানো। আর সম্মুখে রহিয়াছে গুরুর বিতারিত গায়ক শিষ্যদ্বয়, বলওয়ান্দ্ ও সত্তা।

ত্রয়ীর এই অদ্ভুত মিছিল সারা রাজপথ পরিভ্রমণ করিয়া শেষটায় উপস্থিত হইল গুরু অঙ্গদের দরবারে।

অঙ্গদ তো মহা বিস্মিত। জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই-লাধার আজ একি খেয়ালীপনা? এই বেশে, এমন ভাবে, এখানে কেন?"

লাধা উত্তর দিলেন, "ভক্ত শিখেরা সবাই তো গুরুর মত পূর্ণজ্ঞানী নয়। ভুলভ্রান্তি, পদস্খলন তাঁদের হবেই। কিন্তু গুরু, যিনি সর্ব্বকৃপার উৎস, তাঁর কৃপা কেন তারা পাবে না? কেন পাবেনা বাঁচবার সুযোগ?

"তা তো বুঝলুম। কিন্তু আসল বক্তব্যটি কি শুনি?"

"অনুতপ্ত বলওয়ান্দ্ ও সত্তাকে আপনি মার্জ্জনা করুন, দরবারে বসে পূর্ব্ববৎ ভজন শুরু করতে দিন। নইলে ওদের জীবনে যে নেমে আসবে মহতী বিনষ্টি।"

প্রবীণ গুরুভ্রাতার অনুরোধ গুরু অঙ্গদ রক্ষা করিলেন। তারপর সমবেত ভক্ত ও দর্শনার্থীদের উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "সার্থকনামা সাধক ভাই-লাধার এক মহিমময় মূর্ত্তি তোমরা এখানে দেখ্‌লে—দেখে ধন্য হলে। কি গভীর তাঁর মানব প্রেম! পরার্থে আত্মোৎসর্গ করার কি মহনীয় বৃত্তি! সাধনার বলে আত্মাভিমান বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে, তাইতো মহাপুরুষ দুর্জ্জনের উদ্ধার সাধনের জন্য অম্লানবদনে এমনিভাবে নিজের উপর চাপাতে পেরেছেন অপমান ও লাঞ্ছনা। দ্যাখো, এমনি সব সিদ্ধসাধক ধরাতলে বিচরণ ক'রছেন আমার প্রাণসর্ব্বস্ব গুরুজী বাবা-নানকের মহান সৃষ্টিরূপে।"

অমরদাস প্রভৃতি অন্তরঙ্গ শিষ্যদের লক্ষ্য করিয়া গুরু কহিলেন, "তোমরা সদাই স্মরণ রেখো, ভক্ত-সাধকের ভাবনায় ও মননে সদা

জাগরূক থাকবে সৎ-শ্রী-অকাল-এর চিরঞ্জীব 'নাম'। আর তার কর্ম্ম সদাই নিয়োজিত থাকবে আর্ত্ত ও মুমুক্ষু মানবের উদ্ধারে। মনন ও কর্ম্মের এই আদর্শ ও ধৃতি যার নেই, মানবদেহধারী হলেও তার জীবন যে অভিশপ্ত! নিজের স্বার্থ ও নিজের অভ্যুদয় নিয়েই সে ব্যস্ত। আসল স্বার্থ হচ্ছে নিঃশ্রেয়স ও মুক্তি—এতত্ত্বটি তার জানা নেই। লেজ ও শৃঙ্গহীন একটি জীব সে—এ ছাড়া আর কি আছে পরিচয়? তার জন্মগ্রহণের মধ্যে সত্যকার কোন্ সার্থকতাই বা রয়েছে? আয়ু শেষ হয়ে গেলে শেষের দিনটিতে দানাদৈত্যের মত তার কণ্ঠরোধ করতে আসবে—মৃত্যুভয়। মর্ম্মভেদী নিঃশ্বাস ফেলে, অসহায়দের মত শূন্য হস্তে সে চলে যাবে এখান থেকে চিরতরে। তাই বলি, ঈশ্বরপ্রেম আর মানবপ্রেম—এই হোক্ ভক্তদের জীবনের মূলমন্ত্র—কোন ত্যাগ তিতিক্ষাই তুলনীয় নয় এই প্রেম-ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে।"

শিখ ধর্ম্মসঙ্গীত মাঝ্ কি উয়র-এর কয়েকটি অনবদ্য পদ গুরু অঙ্গদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ভক্তিরস ও শরণাগতির তত্ত্ব এগুলির মধ্য দিয়া উদ্ঘাটিত। তিনি কহিতেছেন:

দেখ্ছি, শুনছি আর জানছি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায়,
বিত্ত বিভব আর ভোগ সুখের মধ্যে থেকে
শ্রীভগবানকে যায় না কভু পাওয়া।
মর্ত্যের মানুষ রয়েছে সদা ঐহিক উল্লাসে মত্ত
কই তার গতিবান পদযুগল,
যা দিয়ে পৌঁছুবে সে পরম পদে?
কই তার শক্তিমান বাহু,
যা প্রসারণ করে ধরবে সে পরম প্রভুকে?
কই তার স্বচ্ছ শুদ্ধ দিব্য আঁখি,
যা দিয়ে করবে অলখ্ নিরঞ্জনকে দর্শন?
ওগো, আসন্ন বিনষ্টির ভয়—
তাই হোক তোমার ধাবনশীল পদদ্বয়।

উদার সর্ব্বপ্লাবী প্রেম হোক্ তোমার বাহু।
জ্ঞানের আলো হয়ে উঠুক তোমার আঁখি যুগল।
কহে নানক, এই নিয়েই যে এগিয়ে যাবি তুই,
প্রেমময় প্রভুর মিলন-মন্দিরে।[১]

নানকের প্রচারিত ভক্তিরসাশ্রিত ও প্রপত্তিময় সাধনার এক জীবন্ত বিগ্রহ ছিলেন গুরু অঙ্গদ। তাঁহার সাধনজীবন ও শ্লোকাবলীতে এই সাধনার মূল সুরটি অপরূপ ভঙ্গীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার রচিত জনপ্রিয় একটি ভক্তি-স্তবে ইহার স্পষ্টতর পরিচয় মিলে—

তুমিই দেহ, তুমিই আত্মা—
হে আমার পরম প্রভু,
পূর্ণ তুমি, প্রাণপ্রিয় তুমি,
আত্মার আলোরূপে রয়েছ তুমিই চির দীপ্যমান।
হে মোহন যাদুকর, হে আমার হৃদয়-হরণ,
তোমার মধু-নামের ধ্যান মনন
হৃদয়ে মোর জ্বালিয়ে দিয়েছে জ্ঞানের জ্যোতি।
করেছে মোরে তোমার নিত্যদাস,
তাই তো ধারণ ক'রে তোমার ঐ চরণ দুটি
নাশ করেছি আমার সর্ব্ব অভিমান।
পাপ আর মতিচ্ছন্নতায় ছিলেম এতকাল অন্ধ,
জ্বলেছি দুঃসহ জ্বালায় নিরন্তর,
সে পাপ সে দহন জ্বালা থেকে পেয়েছি মুক্তি।
এ অসম্ভব সম্ভব হয়েছে, হে আনন্দময়,
কারণ, তোমায় ভালবেসেছি, আর জপেছি তোমার নাম,
অহংবোধ হয়েছে বিদূরিত,
সংসারকে করেছি ত্যাগ,
হৃদয় কন্দর উদ্ভাসিত হয়েছে জ্ঞানের আলোয়।

[১] ম্যাকলিফ্—গুরু অঙ্গদ, ভল্যু ২—পৃঃ ৪৬-৪৭

অপাপবিদ্ধ প্রেমময় পরম সত্তা তুমি,
সেই তোমার সুরে মিলেছে আমার সুর,
তাই মানুষের মতামত আজ অর্থহীন আমার কাছে।
হে আমার দয়িত, অতীতে যেমনটি দিয়েছো আশ্রয়
তেমনি দাও আবার ভবিষ্যতে—
তোমার মত আপন কেউ যে নেই আমার।
প্রভুর নামের রঙে্ যে রাঙিয়ে নেবে বাস,
জগৎ মাঝে সেই তো হবে পরম সুখী,
—হে প্রভু দাও তারে তোমার পরম আশ্রয়।[১]

সম্রাট হুমায়ূন ও শের শাহের মধ্যে এ সময়ে প্রবল সংঘর্ষ চলিতেছিল। কনৌজের কাছে একটি বড় যুদ্ধে হুমায়ুনের পরাজয় ঘটে এবং উপায়ান্তর অভাবে তিনি হিন্দুস্থান ত্যাগের সিদ্ধান্ত স্থির করেন। লাহোর অঞ্চলে আসার পর কথা প্রসঙ্গে সিদ্ধপুরুষ গুরু অঙ্গদের কথা তিনি শুনিলেন। ভাবিলেন, ফকীর ও সাধুদের সিদ্ধাইর বলে অনেক সময় বহু দুরূহ কাজ সম্পন্ন হয়! সম্ভব হইলে গুরু অঙ্গদের অলৌকিক শক্তির সাহায্য নিতে দোষ কি?

সাধুর জন্য প্রচুর ভেট সংগ্রহ করা হইল। অতঃপর গুটিকয়েক ঘনিষ্ঠ সহকর্ম্মী ও একদল দেহরক্ষী নিয়া হুমায়ূন সেদিন অঙ্গদের দরবারে গিয়া উপস্থিত। প্রভাতী ভজনসঙ্গীত সবেমাত্র শেষ হইয়াছে। অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে গুরু নিজের আসনে বসিয়া ভাবাবিষ্ট। ভক্ত ও শিষ্যেরা নীরবে নির্নিমেষ নয়নে এই স্বর্গীয় দৃশ্যের দিকে তাকাইয়া আছেন। এমন সময়ে সম্রাট সদলবলে ধর্ম্ম দরবারে প্রবেশ করিলেন।

গুরুকে নিয়া সবাই ব্যস্ত, হুমায়ুনের উপস্থিতির দিকে তাই কাহারো দৃষ্টি নাই। কেহ তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা ও জানাইতেছে না। ভেট নিয়া তিনি অপেক্ষমান, ইহাই বা কোথায় রাখা হইবে?

[১] গুরু অঙ্গদের দরবার নগরী খাদুরে প্রাপ্ত পুরাতন পুঁথি হইতে—ম্যাকলিফ্: ভল্যু ২, পৃঃ ৫৭।

এভাবে বেশ কিছুক্ষণ দণ্ডায়মান থাকার পর হুমায়ুন ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হইয়া উঠেন। হুঙ্কার দিয়া উঠিয়া কোষবদ্ধ তরবারীতে করেন হস্ত অর্পণ। এ সাধু যত বড়ই হোননা কেন, এমনতর উপেক্ষা এবং অপমান সহ্য করিতে তিনি রাজী নন। তরবারীর আঘাতে এখনই সব করিবেন তছনছ্।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সম্রাটের তরবারীটি খাপের মধ্যে কি করিয়া যেন আটকাইয়া গেল? বহু চেষ্টা-চরিত্র করিয়াও তাহা বাহির করা যাইতেছেনা।

হুমায়ুন বড় ভীত হইলেন। তবে কি সিদ্ধাইর শক্তিতে সাধুই করিয়াছেন এই অলৌকিক কাণ্ড?

গুরু অঙ্গদ এবার অনেকটা প্রকৃতিস্থ। নয়ন উন্মীলন করিয়া শান্ত মৃদু কণ্ঠে নবাগত দর্শনার্থী হুমায়ুনের উদ্দেশে কহিলেন, "লক্ষ্য করছি, যখনকার যে কর্ত্তব্য, সম্রাট তা ক'রতে পারেন না। শেরশাহ্‌কে লক্ষ্য ক'রে এই তরবারী চালনার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু সম্রাট তখন তা করতে সমর্থ হননি। এখন আপনি এসেছেন ভগবানের প্রতিনিধি সাধু মহাত্মাদের সম্মিলনীতে। ভক্তিভরে তাঁদের সেলাম করবেন, মর্য্যাদা দেবেন—তা নয়, তরবারী নিয়ে তাঁদের ওপর হামলা করতে চাচ্ছেন। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আপনি পালিয়ে এলেন কাপুরুষের মত, আর এখানে নিরস্ত্র, ঈশ্বরের উপাসনারত, সাধুদের আসরে পৌঁছেই হয়ে উঠেছেন পরাক্রমশালী বীর যোদ্ধা। এ বড় লজ্জার কথা নয় কি?"

হুমায়ুনের লজ্জা ও অনুতাপের অবধি রহিল না। আন্তরিক ক্ষমা প্রার্থনার পর তিনি মহাত্মার কৃপা ভিক্ষা চাহিতে লাগিলেন।

শান্ত স্বরে অঙ্গদ কহিলেন, "সম্রাট, নিরস্ত্র সাধুর অঙ্গে আঘাত করতে উদ্যত হয়ে আপনি পাপ করেছেন। ঐ তরবারীর বাঁটে যদি আপনি হাত না দিতেন, তাহলে অবিলম্বে পুনরুদ্ধার ক'রতে পারতেন আপনার হারানো সাম্রাজ্য। দেখতে পাচ্ছি, এখন কিছুদিনের জন্য আপনাকে এদেশ ত্যাগ করতে হবে, সহ্য করতে হবে নানা দুঃখ লাঞ্ছনা।

কিন্তু ভাববেন না, এরপর আপনি আবার ভারতে ফিরে আসবেন, করায়ত্ত হবে দিল্লীর সিংহাসন।

অঙ্গদকে অভিবাদন জানাইয়া চিন্তাকুল হৃদয়ে হুমায়ুন সেদিন বিদায় গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর বহু দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়া তিনি পারস্যে উপনীত হন, শাহের সাহায্যে সংগ্রহ করেন একটি রণদক্ষ অশ্বারোহী সেনাদল। এই বাহিনীর সাহায্যে হৃত রাজ্য আবার তাঁহার তিনি ফিরিয়া পান।

দিল্লীর মসনদে উপবিষ্ট হইয়া হুমায়ূন কিন্তু গুরু অঙ্গদকে বিস্মৃত হন নাই। ভাবিলেন, ভবিষ্যদ্‌বক্তা ঐ শক্তিমান সাধুকে এবার তাঁহার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবেন, সম্মানের জন্য ভেট পাঠাইবেন। কিন্তু তাঁহার এ ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই—সংবাদ নিয়া জানিলেন, গুরু অঙ্গদ কিছুদিন পূর্ব্বে মরধাম ত্যাগ করিয়াছেন।

একাদিক্রমে প্রায় সাড়ে বারো বৎসর গুরুর গদীতে সমাসীন থাকার পর ভক্তিসিদ্ধ অঙ্গদের জীবনে আসে নির্ব্বেদ ও আত্মবিলুপ্তির পালা। অন্তরঙ্গ শিষ্যদের ডাকিয়া একদিন প্রশান্তকণ্ঠে তিনি কহেন, "এই দেহ তার কাজ ঢের করেছে, এবার এসেছে ছুটির দিন। শিগ্‌গীরই আমি তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে চাই।"

প্রাণপ্রিয় গুরু লীলা সম্বরণ করিবেন, এ কথা শুনামাত্র শিষ্যেরা শোকাকুল হইয়াউঠে। অশ্রুসজল নয়নে সবাই বারবার মিনতি জানায়, "প্রভু, আপনার বয়স এখনো এমন কিছু বেশী হয়নি। কৃপা ক'রে আরও দীর্ঘদিন আপনি আমাদের ভেতর থাকুন, আর্ত্ত ও মুমুক্ষু জীবের কল্যাণ সাধন করুন।"

স্মিতহাস্যে অঙ্গদ উত্তর দেন, "প্রকৃত গুরুর কৃপাপাত্র শিষ্যেরা, আদিষ্ট পুরুষেরা, কি রকম জানো—ঠিক যেন আকাশের জলভরা মেঘের মত। মানুষের প্রয়োজনে তাঁরা দেহ পরিগ্রহ করেন, আর তাদেরই প্রয়োজনে বর্ষণ করেন স্নিগ্ধ কল্যাণ-ধারা। আমার যে দেহটি তোমরা দেখছো, যা ঘিরে আনন্দ করছো—তা তৈরী হয়েছে শস্যের নির্য্যাস

থেকে। কাজেই এ দেহ কি ক'রে চিরস্থায়ী হবে? কেনই বা হবে? আরো একটা কথা তোমরা মনে রেখো। পরিচ্ছদ পুরোনো হলেই ধনীরা তা ত্যাগ ক'রে, তেমনি আধ্যাত্মিক ধনে ধনী যাঁরা, অর্থাৎ সাধুরা, তাঁরাও তেমনি পুরোণো ক্ষয়িষ্ণু দেহকে বিদায় দেয়, আত্মার আবরণ রূপে গ্রহণ করে নূতনতর দেহ, দিব্য দেহ। তাছাড়া দেহান্তের পর আমি যে আমার নিজের ঘরেই ফিরে যাচ্ছিগো। সেখানে স্বেচ্ছামত পরবো আমি বেশভূষা, অথবা খেয়াল খুসীমত থাকবো নগ্ন বা অর্দ্ধনগ্ন হ'য়ে। প্রকৃত সাধু যে হয় সে সদাই এমনি স্বেচ্ছাময় আর স্বতন্ত্র। আইন কানুন, বাধা নিষেধের বালাই তার নেই।"

শিষ্যদের আজ আর কাহারো বুঝিতে বাকী নাই, গুরু মন স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন, প্রস্তুত হইয়াছেন লোকান্তর যাত্রায়।

পরদিন দরবার শুরু হইতেই গুরু অঙ্গদ তাঁহার প্রধান শিষ্য অমরদাসকে নদীজলে স্নান করাইলেন। অঙ্গে তুলিয়া দিলেন নূতন পীতবসন। মাঙ্গলিক উপকরণ, নারিকেল ও তাম্রমুদ্রা দিয়া বরণ করার পর কপালে অঙ্কিত করিলেন পবিত্র তিলক চিহ্ন।

উপস্থিত সবার উদ্দেশে অঙ্গদ কহিলেন, "আজ থেকে ভক্তশ্রেষ্ঠ অমরদাস উপবেশন ক'রবে এই গুরু-গদীতে। যে শ্রদ্ধা, প্রীতি এবং আনুগত্য এতকাল তোমরা সবাই আমায় দিয়ে এসেছো. অমরদাসকেও নিশ্চয় তা দেবে। তাকে জানবে আমারই দ্বিতীয় মূর্ত্তি ব'লে।"

দুই দিন পরে মহাসাধক অঙ্গদের প্রতীক্ষিত শেষ লগ্নটি সমাগত হয়। প্রত্যূষে উঠিয়াই নদীজলে অবগাহন স্নান তিনি সারিয়া ফেলেন, শুরু করেন পবিত্র জপজীর আবৃত্তি। এই কৃত্য শেষ হইলে শিষ্য, ভক্ত ও আত্মপরিজন সবাইকে নিকটে আহ্বান করেন। স্নেহপুর্ণ আশ্বাস দিয়া কহেন, "তোমরা কেউ আমার জন্য বিন্দুমাত্র শোক ক'রোনা। আমি ভাগ্যবান, তাই আমার মরজীবন হয়ে উঠেছিলো শ্রীভগবানের লীলার ক্ষেত্র। আজ আমার পরম প্রভুরই ইঙ্গিতে এই জীবন ধারায় দিচ্ছি আমি ছেদ টেনে।"

এবার অমরদাসের দিকে তাকাইয়া অঙ্গদ উচ্চারণ করেন তাঁহার শেষ বাণী, "বৎস, তুমি গোবিন্দ্‌ওয়ালে গিয়ে স্থাপন ক'র তোমার নূতন দরবার। সেখানেই অবস্থান কর, ভক্ত ও মুমুক্ষুদের জীবনে ছড়িয়ে দাও প্রেমের বাণী, কল্যাণের বাণী। দেখাও সবাইকে মুক্তির পথ।"

কথা কয়টি শেষ হইতে না হইতেই ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ তাঁহার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অগণিত ভক্ত, শিষ্য ও দর্শনার্থীদের মধ্যে জাগিয়া উঠে শোকের প্রবল উচ্ছ্বাস আর আর্ত্ত কলরব।

নরসিঁ মেহতা

আজ ভক্ত নরসিঁর বড় পরিশ্রম ও ছুটাছুটি গিয়াছে, সারা দিনে স্নানাহারের অবসরটুকুও মিলে নাই। বেলা তখন মধ্যাহ্ন। হঠাৎ দেখা গেল, কয়েক মূর্ত্তি বৈরাগী সাধু ঝোলাঝুলি নিয়া গ্রামের উপান্তে আসিয়া উপস্থিত। তাড়াতাড়ি ইহাঁদের সেবার বন্দোবস্ত না করিলে চলেনা। বাড়ী বাড়ী হইতে মাগিয়া আটা-ঘি-চিনি যোগাড় ক'রা, ভোগরান্নার যোগান দেওয়া, সব কিছুরই ভার নিতে হইল নরসিঁকে। ইষ্টসেবা ও প্রসাদ গ্রহণ সমাপ্ত হইল, সন্ধ্যার পর সাধুরা শুরু করিলেন ইষ্টগোষ্ঠী। ভগবৎ-প্রসঙ্গ ও ভজন কীর্ত্তনের পর গভীর রাতে তাঁহারা বিদায় নিলেন। নরসিঁও তাড়াতাড়ি ছুটিলেন গৃহের দিকে।

সাধুসঙ্গের আনন্দে সময় কোথা দিয়া কাটিয়া গিয়াছে, হুঁস ছিলনা। এবার চমকিয়া উঠিলেন। তাইতো। এখন যে রাত্রির মধ্যযাম। বাড়ীর সবাই নিশ্চয় খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া এতক্ষণ শুইয়া পড়িয়াছে, জাগিয়া আছে শুধু তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী মানেকবাঈ। স্বামীর ভোজন শেষ হইলে যা হয় কিছু মুখে দিয়া তবে সে বিশ্রাম করিতে যাইবে। স্ত্রীকে নিয়া কোন সমস্যা নাই, কিন্তু নরসিঁর আসল ভয় ভ্রাতৃজায়াকে। সুযোগ পাইলেই যখন তখন নরসিঁকে সে বিদ্ধ করিতে থাকে তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে। এত রাত্রি অবধি বাড়ীর বাহিরে কাটাইয়া আসিয়া, একবার যদি সে ঐ মুখরা নারীর সম্মুখে পড়ে, তবে আর রক্ষা নাই।

নিঃশব্দে পা টিপিয়া টিপিয়া নরসিঁ রান্নাঘরে প্রবেশ ক'রেন। পত্নী মানেক-বাই এক কোণে বসিয়া তন্দ্রার ঘোরে ঢুলিতেছিলেন। কিন্তু স্বামীর উপস্থিতি মুহূর্ত্তমধ্যে টের পাইয়া যান, ঢাকা-দেওয়া ভোজনের থালিটি তাড়াতাড়ি আগাইয়া দেন তাঁহার সম্মুখে।

বড় ভাই-ই বাড়ীর কর্ত্তা এবং রোজগারের সবটা তাঁহারই। তাই তাঁহার আহার্য্য হিসেবে রোজ থাকে ঘি-দেওয়া কড়্হি ভাত। আর নরসিঁর থালিতে থাকে ধোক্‌ড়া, বাখ্‌ড়া আর একটু শাকভাজা। ঢাকা-দেওয়া খাবার শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে। এক টুকরা বাখ্‌ড়া পাত হইতে তুলিয়া সবায় নরসিঁ মুখে পুরিয়াছেন, এমন সময় ঝড়ের বেগে প্রবেশ করিলন ভ্রাতৃজায়া।

উত্তেজিত স্বরে কহিলেন, "বলি, এতরাত অবধি কোথায় নাচানাচি করে এলে শুনি? বড় ভাই খেটে খেটে সারা হয়ে গেল এই সংসারটাকে ধরে রাখতে, আর এতগুলো লোকের অন্ন জোটাতে। একটিবার একথাটা মনেও আসেনা? তাছাড়া, শুধু নিজেই বসে বসে খাচ্ছো তাই নয়, মাগ্-ছেলে-মেয়ে নিয়ে চেপে বসে আছো এখানে। সমর্থ মানুষ, রোজগার ক'রে পরিবারকে খাওয়াবে, তা নয়, দিনরাত ধেই-ধেই ক'রে কতগুলো বাজে লোকের সঙ্গে নেচে বেড়াবে আর ভাই-এর অন্ন ধ্বংস করবে। লজ্জা হয়না তোমার ওগুলো এমনি ক'রে গিল্‌তে?

খাওয়া থামাইয়া নরসিঁ থালি হইতে হাত তুলিয়া নেন। মানেক-বাঈ সজল চক্ষে তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসেন, বড় জা'র হাত চাপিয়া ধরিয়া অনুনয় করেন, "দিদি, পায়ে পড়ি তোমার। সারা দিন অভুক্ত—খাওয়াটা ওঁকে শেষ করে নিতে দাও।"

"তুই চুপ কর্ তো। রোজগার না ক'রে যে পুরুষ খায়, তার আবার মান অপমান কি? আমি একটা হেস্তনেস্ত আজ এখানে করবোই।"

নরসিঁ ততক্ষণে ভোজনের আসন ছাড়িয়া ভ্রাতৃবধূর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। শান্তস্বরে কহিলেন, "তোমায় অযথা উত্তেজিত হতে হবেনা। এই মুহূর্ত্তে আমি এবাড়ী ত্যাগ ক'রে যাচ্ছি। ফিরবো অল্প কিছুদিন বাদেই, তখন মানেক-বাই আর শিশু পুত্র-কন্যা দুটিকে নিয়ে যাবো।"

"এখন যাওয়া হচ্ছে কোন্ চুলোয়, শুনি?"—শ্লেষভরা কণ্ঠে প্রশ্ন ক'রেন নরসিঁর ভাবীজী।

"যাবো আমার কৃষ্ণের কাছে, রণছোড়জীর কাছে,—দ্বারকায়। যে ক'রেই হোক তাঁর দর্শন আমার চাই। তোমাদের আশ্রয় থেকে চ্যুত ক'রে, তুমি আমায় কৃষ্ণের পরমাশ্রয়েই ঠেলে দিলে, ভাবীজী। এজন্য তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতার আমার অন্ত নেই।"

পত্নী মানেকবাঈ স্বামীর পদতলে আছাড়িয়া পড়েন, উচ্চ স্বরে ডুক্‌রিয়া কাঁদিতে থাকেন।

নরসিঁ আশ্বাস দিয়া কহেন, "কেঁদোনা মানেকবাঈ, তোমার দুঃখের এবার অবসান হবে। ভুল আমারই হয়েছিল—প্রকাণ্ড ভুল। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে এতকাল কেঁদেছি, কিন্তু দুহাত দিয়ে কৃষ্ণকে তো ধরিনি? একহাতে আঁকড়ে ধরেছি ভাইএর আশ্রয়, আর এক হাত বাড়িয়েছি আমার কৃষ্ণের দিকে। তার ফলেই তো পেলাম এত দুঃখ আর এত লাঞ্ছনা। এবার ভুলের সংশোধন ক'রবো, দুহাত দিয়ে ধ'রবো আমার প্রাণের ঠাকুরকে। নিঃশেষে ক'রবো, তাঁর চরণে আত্মনিবেদন। আমাদের সব ভারই যে সানন্দে বহন ক'রবেন তিনি। না—আমার বড় দেরী হয়ে যাচ্ছে, আমি এবার যাই।"

বর্ষার আকাশে মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছে ঝড়ের মাতামাতি শুরু হওয়ার আর দেরী নাই। তীব্র বেগে নরসিঁ গৃহ হইতে ছুটিয়া বাহির হন, আগাইয়া চলেন সম্মুখের অরণ্যপথ দিয়া। দূর হইতে ভাসিয়া আসিতে থাকে পত্নী মানেকবাঈর উচ্চরোলের কান্না ও আকুতিভরা বিলাপ।

ঘোর অন্ধকার রাতে অনির্দ্দেশ্যের পথে নরসিঁর সেদিনকার এই পদযাত্রা পরিণত হয় সফল অভিযাত্রায়। সিদ্ধির আলোকে উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠে তাঁহার সাধন জীবন, ইষ্টদেব রণছোড়জীর দর্শনে হন তিনি কৃতকৃতার্থ।

ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে ভক্তি-সিদ্ধ মহাপুরুষ নরসিঁ মেহতা আবির্ভূত হন। এ আবির্ভাব গুজরাটের জনজীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তারিত ক'রে। গুজরাটের ধর্ম্ম-সংস্কৃতি এবং সাহিত্য সমৃদ্ধতর হয়

তাঁহার অবদানে—কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণ-উপাসনার প্রচার সে অঞ্চলে শুরু হয় পরমোৎসাহে।

জুনাগড়ের সন্নিকটে তলাজা নামক এক ক্ষুদ্র গ্রামে, নরসিঁ মেহতা জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কৃষ্ণদাস ছিলেন বড়নগরীয়া নাগর ব্রাহ্মণ। অতিমাত্রায় রক্ষণশীল বলিয়া এই ব্রাহ্মণেরা গুজরাট রাজ্যে সুপরিচিত ছিলেন।

নরসিঁ তখনো বালক মাত্র। এমন সময়ে হঠাৎ একদিন পিতা কৃষ্ণদাস লোকান্তরে গমন করিলেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা বড় ভালবাসিতেন নরসিঁকে, কোলে-পিঠে রাখিয়া তিনিই তাঁহাকে মানুষ করিলেন, ঢালিয়া দিলেন পিতৃহীন বালকের জীবনে স্নেহ মমতার রসধারা।

কৈশোরে পদার্পণ করিতে না করিতেই নরসিঁর জীবনে স্ফুরিত হইতে দেখা যায় অপূর্ব্ব অধ্যাত্মসংস্কার। তখনকার দিনে গ্রামে পরিব্রাজক সাধুরা আসিলেই, ভক্তিমান গৃহস্থেরা তাঁহাদের সেবার জন্য আগাইয়া আসিতেন। কৃষ্ণদাসের পুত্র নরসিঁ ছিলেন ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎসাহী। সাধুদের আশেপাশে সদাই তিনি ঘুর্ঘুর্ করিতেন, সেবা-পূজায় যোগান দিতেন। আর সুযোগ পাইলেই নিবিষ্টমনে শুনিতেন তাঁহাদের পরিব্রাজনের কথা, সাধনজীবনের নানা অলৌকিক অভিজ্ঞতার কথা।

নরসিঁর জীবনের বড় আকর্ষণ ছিল কীর্ত্তন-গান। যেখানে এই গানের আসর বসিত, সেখানেই তিনি সোৎসাহে ছুটিয়া যাইতেন, মাতিয়া উঠিতেন ভজনে ও কীর্ত্তনে। গ্রামে বৈরাগী সাধুর দল আসিলে তো আর কথাই নাই, ঘর সংসার ফেলিয়া তাঁহাদেরই পিছনে পিছনে দিনরাত তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেন।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার এই রকম-সকম দেখিয়া বড় বিচলিত হইয়া পড়িলেন। নরসিঁর এখন যুবক বয়স। এই বয়সেই যদি সে এমনতর উদাসীন হইয়া পড়ে, সাধুসন্তদের পিছনে অবিরত ঘোরাফেরা শুরু করিয়া দেয়, তবে তো পরিবারের কোন কাজেই সে আর লাগিবেনা।

তাছাড়া, পিতার মৃত্যুর পর হইতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উপরই পতিত হইয়াছে নরসিঁকে মানুষ করার ভার। গৃহস্থীতে তাহাকে না ঢুকাইলে, ব্যবসায় কার্য্যে না লাগাইলে, লোকেই বা কি বলিবে?

স্থির হইল, নরসিকে অবিলম্বে বিবাহ দেওয়া হইবে। মনোমত পাত্রীর জন্য খোঁজাখুজিও শুরু হইয়া গেল।

কিন্তু এধরণের পাগল ছেলেকে পছন্দ করিবে কোন্ পাত্রীপক্ষ? কর্ম্ম সংস্থান বলিতে নরসিঁর কিছু নাই। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার রোজগারে সে খায়, আর সময় কর্ত্তন ক'রে সাধু বৈরাগীদের সঙ্গে নাচিয়া কাঁদিয়া, রাধা-কৃষ্ণ লীলার অভিনয় করিয়া। এইতো সেদিন পাকা কথা দিবার পর একটি সম্বন্ধ ফস্কাইয়াই গেল। নরসিঁর ভাবোন্মত্ত ধর্ম্মজীবনের নানা কাহিনী শুনিয়া ভয়ে তাহারা আর অগ্রসর হয় নাই। অবশেষে এক শুভলগ্নে সুলক্ষণা পাত্রী মানেক বাঈ'র সহিত নরসিঁর বিবাহ অনুষ্ঠিত হইল।

নবপরিণীতা বধূ বড় ভক্তিমতী। আন্তরিক সেবাযত্ন ও প্রেমে স্বামীকে অচিরে সে আপনার করিয়া নেয়। নরসিঁর দাম্পত্য জীবনে বহিতে থাকে স্বাভাবিক আনন্দ ও প্রীতির রসস্রোত। কিন্তু পত্নীর আকর্ষণ তাঁহার জীবনে ইষ্টের আকর্ষণ হইতে কোনদিনই বড় হইয়া উঠে নাই। কন্যা কুন্‌ওঁয়ার বাঈ ও পুত্র শ্যামলের জন্মের পরেও নরসিঁর জীবনে কৃষ্ণপ্রীতি বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নাই। বরং এ প্রীতি ক্রমে ক্রমে হইয়াছে আরো গভীর, আরো ব্যাপক। শুধু নর্ত্তন কীর্ত্তনেই তাঁহার সাধন জীবন সীমাবদ্ধ থাকে নাই, কৃষ্ণরসের এক অপরূপ উৎসধারা উৎসারিত হইতে থাকে তাঁহার জীবন সত্তায়। মধুর রসের অপরূপ পদসমূহ উদ্‌গীত হইতে থাকে তাঁহার প্রেমাপ্লুত কণ্ঠে।

সংসারের আবর্ত্তে থাকিয়াও, সারবস্তু ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণকে নরসিঁ এক মুহূর্ত্তের তরেও বিস্মৃত হন নাই। কৃষ্ণরসে রসায়িত হইয়াই দিন তাঁহার পরমানন্দে অতিবাহিত হইতেছিল। এমনি সময়ে হঠাৎ সেদিনকার রাত্রিতে ঘটে ভ্রাতৃবধূর উষ্মার অহেতুক বিস্ফোরণ। লাঞ্ছনা ও

অপমানের রূঢ় আঘাত তাঁহাকে টানিয়া বাহির করে ইষ্ট প্রাপ্তির অভিযাত্রা পথে।

আকাশে মেঘের ঘোর ঘনঘটা। সেই সঙ্গে রহিয়াছে ঝড় জল আর দমকা হাওয়ার প্রবল দাপাদাপি। এই দুর্য্যোগে, অন্ধকার বনপথ দিয়া নরসিঁ আগাইয়া চলিয়াছেন, সর্ব্ব শরীর হইতেছে কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত, রক্তাপ্লুত। কিন্তু সেদিকে তাঁহার ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই। মুমুক্ষু সাধকের মুখে অবিরত কৃষ্ণনাম, আর অন্তরে কৃষ্ণদর্শনের দুর্জ্জয় সঙ্কল্প। পার্থিব জগতের কোন বাধাই আজ যেন তাঁহার এই পুণ্যময় পদযাত্রার গতি রোধ করিতে সক্ষম নয়।

রাত্রি ক্রমে প্রভাত হয়, প্রকৃতির তাণ্ডবও শেষ হইয়া আসে। বনানীর শিরে ঝলসিয়া উঠে উষার মৃদু মধুর আলোকচ্ছটা। বর্ষণ-স্নাত দেহে, ক্লান্ত চরণে নরসিঁ পথ চলিতেছেন। হঠাৎ অদূরে চোখে পড়িল এক অতি প্রাচীন ভগ্নপ্রায় দেব-দেউল।

নিকটে গিয়াই বুঝিতে পারিলেন, এই মন্দির ও এই অঞ্চল তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত। কোন সিদ্ধযোগীর প্রতিষ্ঠিত এক জাগ্রত শিববিগ্রহ এই প্রাচীন মন্দিরে বিরাজিত রহিয়াছেন। অঞ্চলটি জুনাগড়ের সন্নিহিত। বালককালে বাড়ীর লোকদের সঙ্গে পূজা দিবার জন্য এই মন্দিরে নরসিঁ বহুবার আসিয়াছেন। এস্থানের সহিত জড়িত রহিয়াছে তাঁহার পুরাতন দিনের কত সুখস্মৃতি।

নরসিঁর পদযাত্রার লক্ষ্য দ্বারকা, যেখানে তাঁহার ইষ্টবিগ্রহ রণছোড়জী অপরূপ মাধুর্য্য ও মহিমা নিয়া বিরাজ করিতেছেন, শত শহস্র ভক্তকে প্রতিদিন আকর্ষণ করিতেছেন অমোঘ প্রেমের বলে। দ্বারকায় গিয়া যতশীঘ্র সম্ভব প্রাণের ঠাকুরের সহিত মিলিত হইবেন, ইহাই ছিল তাঁহার আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু ভবিতব্য তাঁহাকে রাত্রির অন্ধকার ও ঝড় জলের ভিতর দিয়া এই ভগ্ন শিবমন্দিরের সোপানে টানিয়া আনিল কেন? কি ইহার গূঢ় তাৎপর্য্য?

অন্তরে খেলিয়া গেল চকিত চিন্তার রশ্মি। শিব হইতেছেন আশুতোষ—ভক্ত প্রাণের আকুতি আর একটি মাত্র বিল্বপত্র জাগাইয়া তোলে তাঁহার পরম সন্তোষ। এই আশুতোষকে প্রসন্ন করিয়া, বর মাগিয়া নিয়া, নরসিঁ পূরণ করিবেন তাঁহার কৃষ্ণপ্রাপ্তির অভীপ্সা।

নরসিঁ আরো ভাবিলেন, পুরাণে আছে—গোপনে আড়ি পাতিয়া শিবজী গোপবালা পরিবেষ্টিত কৃষ্ণের রাসলীলা দর্শন করিয়াছিলেন, এই অপরূপ লীলা দর্শনের অধিকারটি এবার তিনি এই জাগ্রত শিব-বিগ্রহের কাছে ভিক্ষা মাগিবেন।

সঙ্কল্প স্থির হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে বন হইতে একরাশ ফুল বেলপাতা সংগ্রহ করিয়া নরসিঁ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। ভক্তিভরে বিগ্রহের অর্চনা ও জপ সমাপ্ত করার পর নিবিষ্ট হইলেন গভীর ধ্যানে।

সারাদিন তাঁহার আর বাহ্যজ্ঞান নাই, ক্রমে রাত্রি ও প্রায় শেষ হইয়া আসিতে চলিল। এবার ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে আবির্ভূত হইলেন আশুতোষ। দেখা গেল, সারা মন্দির-গর্ভ স্বর্গীয় জ্যোতির ছটায় ভরিয়া গিয়াছে, আর তাহারই মধ্যে আকারিত হইয়া উঠিয়াছে দেবাদিদেবের দিব্য মূর্ত্তি।

প্রসন্ন কণ্ঠে ঠাকুর কহিলেন, "বৎস, তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হতে আর দেরী নেই। ভাগ্য আজ তোমার প্রতি সুপ্রসন্ন। আমি বর দিচ্ছি, দ্বারকাধীশের কৃপা তোমার ওপর বর্ষিত হবে। ইষ্ট দর্শন তোমার অচিরেই হবে, সেই সঙ্গে পূর্ণ হবে আরেকটি মনোবাঞ্ছা—রাসলীলার পরম মধুর দিব্য দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হবে তোমার নয়ন সমক্ষে। বৎস নরসিঁ, গাত্রোত্থান ক'র, দুদিন তুমি উপবাসী রয়েছ, এবার বন থেকে কিছু ফলমূল আহরণ ক'রে আনো, ভোজন সমাপ্ত ক'রে এগিয়ে যাও রনছোড়জীর পুণ্যস্থান দ্বারকার দিকে।

জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হয়। নরসিঁর কপোল প্লাবিত হয় আনন্দের অশ্রুধারায়। ভূমিতে লুটাইয়া বারবার প্রণাম নিবেদন করেন কৃপাময় দেবাদিদেবের উদ্দেশে।

পদব্রজে কয়েকদিন পথ চলার পর নরসিঁ মেহতা দ্বারকায় আসিয়া পৌঁছান। ধূলি পায়ে, আকুল হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ তিনি ছুটিয়া যান প্রভু রণছোড়জীর শ্রীমন্দিরে। প্রেমভক্তির আবেশে ভক্তপ্রবর তখন মহা প্রমত্ত। কখনো সারা আঙিনা জুড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছেন, কখনো বা উন্মত্তের মত নাচিয়া নাচিয়া গাহিতেছেন প্রভুজীর সুমধুর নাম গান। কখনো বা স্থির নিষ্পলক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন শ্রীবিগ্রহের দিকে, দুই নয়ন বাহিয়া ঝরিতেছে প্রেমাশ্রুধারা।

প্রভুজীর দিন ও রাতের সেবা পূজা শেষ হইয়া গেল। শয়ান-অনুষ্ঠান দর্শনের পর সামান্য কিছু প্রসাদান্ন মুখে দিয়া নরসিঁ মন্দির চত্বরের এককোণে বিশ্রাম করিতে বসিলেন। অন্তর আলোড়িত হইতে থাকে নানা চিন্তায়। প্রাণের ঠাকুরের দর্শন তিনি চান। মনে কত গোপন কথাই না জমিয়া উঠিয়াছে, তাহা উঘারিয়া না বলিলে, নিভৃতে ঠাকুরকে প্রাণের কথা নিবেদন না করিলে, শান্তি আসে কই ?

আরো একটি সঙ্কল্প রহিয়াছে ঠাকুরের শ্রেষ্ঠ প্রেম-মাধুর্য্যময় লীলা —রাসলীলা দর্শনের জন্য। কিন্তু এই জনারণ্যে তাহা ঘটিবার সম্ভাবনা তো দেখা যাইতেছেনা।

উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম হইতে, ভারতের সর্ব্ব অঞ্চল হইতে, জনস্রোত বহিয়া আসিতেছে এই দ্বারকাধীশ-মন্দির প্রাঙ্গণে। উচ্চ কাঁসর ঘণ্টা আর ঝাঁঝরের রবে, হাসি আনন্দ আর নৃত্যগীতে চারিদিক মুখর, ঝাড়-লণ্ঠন আর মশালের আলোয় মন্দির আলোময়। এই জনতরঙ্গে, এই জন কল্লোলে, এই নয়ন ধাঁধানো প্রগল্‌ভ আলোকচ্ছটায় নিভৃতি-প্রয়াসী নিরীহ গ্রামীণ ভক্ত নরসিঁ মেহ্‌তা যেন হাঁফাইয়া উঠিয়াছেন। নিজেকে যেমন তিনি হারাইয়া ফেলিয়াছেন, তেমনি প্রেমের ঠাকুরকেও পাইতেছেন না আপনার করিয়া। এ কি বিপদে তিনি পড়িয়াছেন !

এক ভরসা—কৃপালু আশুতোষের সেই বর। কিন্তু এই হৈ-চৈ এবং হুল্লোড়ের মধ্যে কি করিয়া তাহা ফলিয়া উঠিবে, তাহাতো- তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না।

গত কয়েক দিনের পথশ্রমে দেহ বড় ক্লান্ত। নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে নরসিঁ হঠাৎ এক সময়ে নিদ্রায় ঢলিয়া পড়িলেন।

গভীর রাত্রি। শ্রীমন্দিরের ও আশপাশের আলোকমালা নিভিয়া গিয়াছে। ঘন অন্ধকারে চারিদিক অবলুপ্ত। উন্মুক্ত আকাশের তলে নরসিঁ অঘোরে ঘুমাইতেছেন। হঠাৎ কাহার ডাকে তিনি জাগিয়া উঠিলেন। একি। এ কাহার কণ্ঠস্বর? মনে হইতেছে খুবই পরিচিত, কিন্তু সুদূর দ্বারকায় কে তাঁহাকে এমন করিয়া ডাকিবে?

আবার শোনা গেল দৈবী কণ্ঠের মৃদু গম্ভীর আওয়াজ।—"নরসিঁ, তামস ঘুমে কাল হরণ করবার জন্যই কি এখানে এসেছো? তাড়াতাড়ি মন্দিরের অলিন্দে গিয়ে ওঠো। তারপর প্রবেশ ক'র পেছনের ফুল বাগিচায়। অভীষ্ট তোমার সিদ্ধ হবে।"

বিস্ময় ও আনন্দের শিহরণ খেলিয়া গেল নরসিঁ মেহতার দেহে মনে, সারা সত্তায়। বুঝিলেন এই দৈবী কণ্ঠস্বর স্বয়ং দেবাদিদেব শিবজীর, জুনাগড়ের প্রত্যন্ত প্রদেশে, জীর্ণ দেউলে, যিনি কৃপাভরে হইয়াছিলেন আবির্ভূত।

আগ্রহ-অধীর নরসিঁ মেহতা দ্রুতপদে সেইদিকে ছুটিয়া চলিলেন। বাগিচায় প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে কাণে আসিয়া পশিল অমৃতস্যন্দী বংশীরব। উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে সুরলহরী উত্থিত হইতেছে আর ভক্ত নরসিঁ মোহগ্রস্তের মত আগাইয়া চলিয়াছেন কাননের অভ্যন্তরে। দিব্য আনন্দের আবেশে তিনি তখন উন্মত্তপ্রায়। সারা অঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছে সাত্ত্বিক বিকার। ক্রমে অদ্ধবাহ্য অবস্থায় তিনি পতিত হইলেন ভূমিতলে।

প্রেমাবিষ্ট নরসিঁর নয়ন সমক্ষে এবার উন্মোচিত হয় দিব্যলোকের অপরূপ দৃশ্যপট। দেখেন, নবজলধরকান্তি শিখিপুচ্ছধারী মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। প্রভুর আননে ভুবনভোলানো হাসি, নয়নে লীলাচঞ্চল প্রেমচাহনি!

বংশীরব থামাইয়া ঠাকুর প্রসন্নমধুর স্বরে কহেন, "নরসিঁ, জীবনে দুঃখ দহনের জ্বালা অনেক কিছু সয়েছ। এবার এসো, প্রবেশ ক'র আমার

আনন্দলোকে। আমার লীলা মাধুর্য্যে জীবনপাত্র ভরে নাও, আর আর তা বিলিয়ে দাও প্রতি ভক্ত মানবের আঙিনায়।"

চকিতে ঘটে দৃশ্যপটের পরিবর্ত্তন। প্রাণপ্রভু কৃষ্ণের সর্ব্বোত্তম প্রেমলীলা—মহারাস—রূপায়িত হয় তাঁহার সম্মুখে।

নটবর কৃষ্ণের পাগলকরা মোহন বেণু বাজিতেছে, আর ছয়টি রন্ধ্রের সুরলহরী দিব্য চৈতন্যে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতেছে মানবদেহের ষট্‌চক্র। পাখীর মধুর কূজন বনানীর বুকে জাগাইয়াছে দিব্য আনন্দের হিল্লোল, পুষ্প সৌগন্ধে দশদিক আকুল, আমোদিত। কুঞ্জে কুঞ্জে কৃষ্ণ আর কৃষ্ণপ্রিয়া গোপীদের আনন্দময় রসবিহার। একক রাসবিহারী কৃষ্ণ নয়—যত গোপী, তত কৃষ্ণ—রাসলীলার এ এক অপরূপ অপ্রাকৃত মহনীয় দৃশ্য! নরবপু গোলকপতি মুরলীধর কৃষ্ণের রচিত এ যেন এক অত্যদ্ভুত স্বর্গীয় ইন্দ্রজাল!

লীলাদৃশ্য অতঃপর অপসৃত হইয়া যায়। উন্মাদের মত ছুটিয়া গিয়া নরসিঁ পতিত হন শ্রীবিগ্রহ রণছোড়জীর বেদীতলে। ভাবাবেগে ভক্ত-প্রবর তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন।

বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে নরসিঁ দেখেন, ঊষার স্নিগ্ধ মধুর আলো চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পড়িছা আর পুরোহিতেরা বাদ্যভাণ্ডসহ প্রভুজীর মঙ্গল আরতি শুরু করিয়া দিয়াছেন।

মন্দিরের নিভৃত কোন্ হইতে নরসিঁ নিবেদন করিলেন সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। যুক্তকরে কহিলেন, "প্রভু, তোমার দীনদয়াল নাম সার্থক। এই অক্ষম দীন ভক্তের উপর যে কৃপা বর্ষণ করেছো, তার তুলনা নেই। তোমার লীলা দর্শন ক'রে প্রাণমন আজ সার্থক হয়েছে। এবার ব'ল, আমার ওপর তোমার কি আদেশ।"

কাণে আসিল দৈবী কণ্ঠস্বর, "নরসিঁ, অভীষ্ট তোমার সিদ্ধ হয়েছে। এবার গৃহে ফিরে যাও। যে আনন্দ-ধন আহরণ করলে, তা ছড়িয়ে দাও দিকে দিকে। ব্রাহ্মণ অন্ত্যজ, ধনী নির্ধন সবাইকে বিলাও এই ধন। মানুষ একান্তভাবে হরির জন, এই হচ্ছে তার একমাত্র পরিচয়—এই

তত্ত্ব তুমি প্রচার ক'র। নাম কীর্ত্তনের সুধা বিতরণ ক'র দেশের আপামর জন সাধারণকে।"

"কিন্তু প্রভু, আমার একটি প্রার্থনা যে তোমায় পূর্ণ করতে হবে। অপ্রাকৃত লীলা দর্শন করিয়ে আমার দেহ মন প্রাণকে, সারা সত্তাকে তুমি উজ্জীবিত ক'রে তুলেছো তোমার দিব্য প্রেমে আর পরম মধুর ভাবময়তায়। এই প্রেম ও এই ভাবৈশ্বর্য্য যেন আমার জীবনে চিরদিন বর্ত্তমান থাকে।"

রণছোড়জি উত্তরে বলেন, "তথাস্তু"

পুলকাঞ্চিত দেহে প্রভুর মধুনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হন নরসিঁ মেহতা। এবার তিনি আপ্তকাম, প্রাণপ্রভু কৃষ্ণের তিনি অঙ্গীকৃত সেবক ও দাস। এবার তাহার জীবনে স্ফুরিত হইয়াছে ভক্তজনের বহুবাঞ্ছিত প্রেমানন্দ আর প্রভুজীর প্রদত্ত অভয় মন্ত্র।

কয়েকদিন পদব্রজে পথ চলার পর নরসিঁ মেহতা স্বগ্রাম তলাজায় আসিয়া উপস্থিত। গৃহে পৌঁছিয়াই সোৎসাহে ভ্রাতৃজায়াকে প্রণাম নিবেদন করিলেন। কহিলেন, "ভাবীজী তোমার ঋণ কোন দিনই যে আমি শোধ করতে পারবো না। আমার কৃষ্ণদর্শনে তুমিই সাহায্য করেছো সব চাইতে বেশী। তোমার তিরস্কার না পেলে পরম পুরস্কারটি কোন দিনই এ অভাগার ভাগ্যে জুটতো না।"

অতঃপর জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে সবিনয়ে জানান, "দাদা, এতদিন স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে তোমার সংসারে থেকেছি। এবার থেকে একান্তভাবে নির্ভর ক'রবো আমার পরমপ্রভু কৃষ্ণেরই ওপর। তুমি দোষ নিওনা, আজই আমি সবাইকে নিয়ে চলে যাবো। ভাবছি, জুনাগড়ে গিয়ে বাঁধবো আমার নূতন ঘর।"

"কিন্তু, এতগুলো লোকের গ্রাসাচ্ছাদন চলবে কি ক'রে? পাগলের মত এসব কি বলছিস্ তুই।"—জ্যেষ্ঠভ্রাতা চিন্তিত স্বরে প্রশ্ন করেন।

"তুমি ভুলে যাচ্ছো, তুমি বা আমি কিছুই করছিনে। সব করছেন

সবার প্রভু রণছোড়জী। তিনি তোমায় চালিয়ে নিচ্ছেন, তোমার সংসারের সব প্রয়োজন মেটাচ্ছেন। আর আমার ভারটি নেবেন না ? বিশেষ ক'রে তিনি যে আমার সখাগো—প্রাণপ্রিয় সখা।"

জুনাগড়ের শহরতলীতে একটি ক্ষুদ্র কুটিরে নরসিঁ মেহ্‌তা তাঁহার বাসস্থান নির্ব্বাচন করিলেন। পত্নী মানেকবাঈ আর পুত্র কন্যার গ্রাসাচ্ছাদনের ভার ছাড়িয়া দিলেন ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণেরই উপর। নিজে রহিলেন কৃষ্ণরসে সদা বিভোর, সদা উন্মত্ত।

চারিদিকে রটিয়া গেল নরসিঁ মেহতার অধ্যাত্ম-রূপান্তরের কথা। দ্বারকায় গিয়া দ্বারকাধীশের কৃপা তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, হইয়াছেন শ্রেষ্ঠ ভক্তিসিদ্ধ মহাত্মায় পরিণত। নরসিঁর দর্শনের জন্য, তাঁহার উপদেশ ও নাম কীর্ত্তন শ্রবণের জন্য অঙ্গনে প্রচণ্ড ভীড় জমিতে শুরু করিল।

কৃপাপ্রাপ্ত নরসিঁর জীবনে সমাগত হইয়াছে এক নূতনতর আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্য। রাতারাতি তিনি পরিণত হইয়াছেন এক উচ্চস্তরের সাধক-কবিরূপে। কৃষ্ণস্তব, কৃষ্ণকথা ও কৃষ্ণনামগানে বরাবরই তিনি পারদর্শী। কিন্তু এবার প্রভুজীর কৃপায় বিশেষ শক্তির অধিকারী তিনি হইয়াছেন, পরিগ্রহ করিয়াছেন তাঁহার প্রচারনিষ্ঠ চারণকবি এবং চারণগায়কের পবিত্র ভূমিকা।

এই সময় হইতে অজস্র ভক্তিরসাত্মক পদ, কাব্য ও নাটক নরসিঁ মেহতা রচনা করিতে থাকেন। প্রেমভক্তির রস মাধুর্য্যে, সংবেদনশীলতা ও প্রসাদগুণে তাঁহার এই রচনাসমূহ গুজরাটি সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদরূপে আজো গণ্য হইয়া আছে।

মহাত্মা নরসিঁ মেহতার অধ্যাত্মসিদ্ধির খ্যাতি শুধু জুনাগড় শহরেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই, এ খ্যাতি অচিরে ছড়াইয়া পড়ে সমগ্র গুজরাট ও উত্তরপশ্চিম ভারতে।

দলে দলে ভক্ত দর্শনার্থীরা আসে। নরসিঁর মুখে কৃষ্ণকথা, রাধাকৃষ্ণ-

লীলার কথা শুনিয়া তাহারা মুগ্ধ হয়, পাগল হয়। তাঁহার কুটির-অঙ্গন হয় কীর্ত্তনানন্দের বড় আসর। মৃদঙ্গ ও করতালের সাহায্যে নরসিঁ যখন প্রভুর নামগানে মত্ত হন। দিব্য ভাবের আবেশ সঞ্চারিত হয় ভক্ত ও দর্শনার্থীদের মধ্যে। কৃষ্ণভাবনা ও কৃষ্ণচেতনায় জাতিবর্ণ-নির্বিবশেষে সকল নরনারী উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে।

নরসিঁর জীবনসাধনার মূল কথা—কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, নরবপু ধারণ করিয়া গোপ গোপীদের সহিত মিলিত হইয়া অপার মাধুর্য্যলীলা তিনি প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন। এই মাধুর্য্যময় এবং প্রেমময় দয়িত কৃষ্ণই মানবের উপাস্য। এ যুগে কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণপ্রেম ছাড়া মানবের আর গতি নাই।

বৈষ্ণবীয় সাধন ও দিনচর্য্যা সম্পর্কে নরসিঁ কহিয়াছেন, "ইষ্টবস্তু কৃষ্ণে একৈকনিষ্ঠা অব্যাহত রাখো। দিন রাত অতিবাহিত ক'র তাঁর স্মরণে, ভজনে ও নাম কীর্ত্তনে। কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ ক'র, কৃষ্ণই এগিয়ে এসে গ্রহণ ক'রবেন তোমার ব্যবহারিক ও অধ্যাত্ম জীবনের সকল কিছু দায়িত্বের ভার।

ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ নরসিঁ শ্রীহরিকে যেমন সর্ব্ব মন প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছেন, তেমনি বাসিয়াছেন হরির জনকে। জাতিভেদ ও বর্ণ বৈষম্য না মানিয়া, নীচ বর্ণের অছ্যুত, আচারভ্রষ্ট মানুষকে তিনি আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়াছেন বিনা দ্বিধায় এবং প্রেমাপ্লুত হৃদয়ে। হরিজন তাঁহার চোখে শুধু হরির করুণার বস্তুই নয়, হরিজন হইয়া উঠিয়াছে তাঁহার একান্ত আপনার জন[১]।

নরসিঁ মেহতার আবির্ভাব-পটভূমিকা জানিতে হইলে সমকালীন গুজরাটের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার সন্ধান নেওয়া দরকার। ১৪১১ খৃঃ হইতে ১৭০৭ খৃঃ অবধি গুজরাট রাজ্য ছিল আমেদাবাদের

---

[১] নরসিঁ মেহতার এই হরিজন-তত্ত্বই উত্তর কালে গান্ধীজীর জীবন দর্শনকে অনেকাংশে প্রভাবিত করিয়াছিল। গান্ধী জীবনের বিশিষ্ট গবেষক ও ভাষ্যকারদের মতে, গান্ধীজী 'হরিজন' নামটি গ্রহণ করিয়াছিলেন ভক্ত নরসিঁরই নিকট হইতে।

সুলতানদের শাসনাধীন এবং এই সুলতানদের যুদ্ধলিপ্সা ও রাজ্য বিস্তারের প্রয়াস অত্যন্ত প্রবল ছিল। সুলতান বাহাদুর শাহের হামলায় বিরক্ত হইয়া মুঘল সম্রাট হুমায়ুন ১৫৩৫ সালে গুজরাট আক্রমণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে, ১৫৭৩ সালে আকবর এই রাজ্য মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নেন।

আমেদাবাদের সুলতানদের আমলে গুজরাট একটি সুসম্বদ্ধ শাসন-সংস্থার অধীনে ছিল ঠিকই, কিন্তু সুলতানদের যুদ্ধ বিগ্রহের খরচ জোগাইতে গিয়া দেশের সাধারণ মানুষকে নিঃস্ব হইয়া পড়িতে হয়। খান, আমীর আর সুলতান-পদলেহী হিন্দু রাজাদের অত্যাচার ক্রমে দুঃসহ হইয়া উঠে। হিন্দু সমাজকে এ সময়ে বাধ্য হইয়া আত্মরক্ষার উপায় খুঁজিতে হয়। জাতি বর্ণের প্রাচীরের অভ্যন্তরে সমাজ আশ্রয় গ্রহণ ক'রে। প্রাচীন ঐতিহ্যের স্মরণ মনন আর পুরাণ-শাস্ত্রের আখ্যায়িকা আলোচনা ও ভক্তি পথের অনুসরণ ইহাই হইয়া উঠে সাধারণ মানুষের উপজীব্য। সাহিত্যেও জনমানসের এই বৈশিষ্ট্যটি ফুটিয়া উঠে। চৌদ্দ শতকের গোড়ার দিকে গুজরাট সাহিত্যে ও লোকগাথায় প্রথম আমরা পৌরাণিক ধর্ম্মের সুস্পষ্ট চিহ্ন দেখিতে পাই। রাধাকৃষ্ণের লীলা-কাহিনীর প্রভাব জনসমাজে বিস্তারিত হয় আর এই লীলা-রসের জোগান আসে ভাগবত পুরাণ, জয়দেবের গীতগোবিন্দ এবং বোপদেবের হরিলীলামৃত হইতে।[১] নৃসিংহনারায়ণ-মুনি ১৪১৬ সালে বিষ্ণু-ভক্তি-চন্দ্রোদয় নামে একটি ভক্তি-গ্রন্থ রচনা করেন এবং গুজরাটীদের মধ্যে ইহা জনপ্রিয় হইয়া উঠে। গির্ণার পাহাড়ের গাত্রে ১৪১৭ সালের শিলালিপিতে উৎকীর্ণ দেখা যায় এক রসমধুর দামোদরস্তুতি। এই স্তুতিতে গোপীজনের প্রিয় 'মাখনচোরা' কৃষ্ণের উল্লেখ দেখিতে পাই। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয়, জনজীবনে রাধাকৃষ্ণের লীলা-আখ্যান ইতিপূর্ব্বে প্রচারিত হইয়া গিয়াছে।

১ মুন্সী : গুজরাট অ্যাণ্ড ইট্স লিটারেচার—পৃঃ ১৬৫

এ প্রসঙ্গে গুজরাটের পুরাণ কথক গাগরিয়া ভাট্‌দের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিতে হয়। নরসিঁর পূর্ব্বসূরী হিসাবে এই গ্রাম্য ভাটেরা অভিনন্দিত হইবার যোগ্য। গ্রামে গ্রামে ইহারা ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং সঙ্গীত, আখ্যান ও কথকতার মধ্য দিয়া জনসাধারণের কাছে পরিবেশন করিতেন পুরাণের মনোজ্ঞ কাহিনী। ইঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভালণ্‌, প্রেমানন্দ, মন্ত্রী কর্মণ্‌, ভীম, কেশব হৃদেরাম্‌ প্রভৃতি। গুজরাটের ধর্ম্ম সংস্কৃতিতে এই গাগরিয়া ভাট্‌দের অবদান সম্পর্কে শ্রীকাহ্নাইয়ালাল মুন্সী লিখিয়াছেন, "এই কথক ভাট্‌ নিজেকে গণ্য ক'রতো প্রাচীন আর্য্য সংস্কৃতির এক উত্তরাধিকারীরূপে। সেই সংস্কৃতি ও সভ্যতার ঔজ্জ্বল্য ও পৌরুষের দীপ্তি, সেই অপরূপ সাহিত্য ও শুচিশুভ্র আদর্শের কথা সে গর্ব্বভরে প্রচার করতো। বিদেশী ম্লেচ্ছ সংস্কৃতির গতিরোধ করার জন্য সে উদ্‌গ্রীব ছিল। প্রাচীন যুগের উজ্জীবন সঙ্গীত সে কাণ পেতে শুনতো, তার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাক্‌তো আসন্ন জয়গৌরবের দিকে। তার হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত ক'রে দিয়ে গাইতো সে তার পূর্ব্বপুরুষের ধর্ম্মসংস্কৃতির গৌরবগাথা। গ্রামীণ পাঠকেন্দ্রগুলো প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠতো তার আগমনে, গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে সে নিবেদন ক'রতো তার প্রাণের স্তুতিগান, পথে প্রান্তরে সে ছড়িয়ে দিত তার কথকতার মাধুর্য্য, প্রতি গৃহে অনুরণিত হতো তার সঙ্গীতের ঝঙ্কার। ধর্ম্ম আর ঐতিহ্যের পরম্পরা সে সতত রাখতো জাগ্রত ক'রে। রক্ষা করতো দেশের ভাষা, সাহিত্য, প্রেরণাশক্তি ও আদর্শবাদ। এই কথক ভাট্‌দের অবদানের ফলেই গুজরাটে রাজনৈতিক দাসত্বের গণ্ডী ভেদ ক'রে সগৌরবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছিল এ দেশের ধর্ম্মসংস্কৃতির মহনীয় আদর্শ।"

ভক্ত নরসিঁ মেহতা জীবনের গোড়ার দিকে তাঁহার ভাবময় জীবন-সাধনার উপকরণ কোথা হইতে আহরণ করিয়াছিলেন, উপরোক্ত তথ্যাদি হইতে তাহার সন্ধান পাওয়া যায়।

প্রাক্‌-নরসিঁ যুগে গুজরাটের ভক্তিধর্ম্ম আন্দোলন প্রাণবন্ত হইয়া

উঠে গোস্বামী বল্লভাচার্য্যের[১] প্রভাবের ফলে। তেলেঙ্গানার এই আচার্য্য গোড়ার দিকে ছিলেন বিষ্ণুস্বামীর অনুগামী, পরে মীরার আদর্শের ভিত্তিতে এক নব ভক্তিসম্প্রদায় তিনি গঠন করেন, তাহার নাম হয় পুষ্টিমার্গ। ভক্তি সাহিত্যে তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। তাঁহার সাধন উপদেশের মর্ম্মকথা—শ্রীকৃষ্ণে শরণাগতি, সর্ব্বস্ব সমর্পণ ও রাসলীলার অনুধ্যান। দেহ মন প্রাণ, বিষয় ও পরিবার সব কিছু ভক্ত ইষ্টদেব কৃষ্ণকে সমর্পণ করিবে, নিজের বলিতে কোন কিছুই তাহার থাকিবেনা—এই সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের মিলন বিরহের লীলা, এবং বিশেষ করিয়া রাসলীলার ভাবময় অনুধ্যান হইবে ভক্তের সাধনজীবনের প্রধান উপজীব্য।

বল্লভাচার্য্য ভক্তি-সাধনায় সিদ্ধ হইয়া থাকুন বা না-ই থাকুন, তিনি যে ভক্তিরস সাহিত্যের সুপণ্ডিত ব্যাখ্যাতা ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। উত্তর ভারতের নানা তীর্থ ঘুরিতে ঘুরিতে এই প্রতিভাধর আচার্য্য গুজরাটে আসিয়া উপস্থিত হন। বহু ভক্ত শেঠ ও রাজরাজড়ার সাহায্যে নাথদ্বারার শ্রীনাথ মন্দির তিনি সাড়ম্বরে স্থাপন করেন এবং এই মন্দিরের প্রসিদ্ধি অচিরে শুধু গুজরাটেই নয় সারা উত্তর ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

আচার্য্যের পুত্র ভিথলনাথজী উত্তরকালে গুজরাটে কয়েকটি বড় বড় মন্দির নির্ম্মাণ করান। ভক্ত সুরদাস এবং অষ্টছাপ গোষ্ঠীর আরো দুই একটি কবিসাধক ভিথলনাথজীর ভক্তিবাদ দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত হইয়াছিলেন।

বল্লভাচার্য্যের কৃষ্ণনিষ্ঠা ও প্রেমভক্তিবাদ গুজরাটের ভক্তদের প্রেরণা যোগাইয়াছিল। স্বভাবতঃই নরসিঁ মেহতাও তাঁহার ভাবাদর্শে অনেকটা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ভক্ত নরসিঁর জীবনে বৃন্দাবনের নব-উজ্জীবিত প্রেমধর্ম্মের প্রভাবই পতিত হইয়াছিল বেশী এবং এই

[১] গোস্বামী বল্লভাচার্য্যের জন্মকাল ১৪৭৯ খৃষ্টাব্দ; দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া তিনি ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

প্রেমধর্ম্ম উৎসারিত হইয়াছিল শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার বৃন্দাবনবাসী শক্তিধর বৈষ্ণব পার্ষদদেরই সাধনা ও প্রচার-কুশলতার ফলে।

এ প্রসঙ্গে গুজরাট সাহিত্যের বিশিষ্ট ইতিহাসকার, মনীষী কে, এম, মুন্সী লিখিয়াছেন, "শ্রীচৈতন্যের প্রাণের একান্ত অভিলাষ ছিল, বৃন্দাবন যেন ভক্তি আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্ররূপে পরিণত হয়। ১৫১০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রবীণ ভক্ত লোকনাথ গোস্বামী বৃন্দাবনের এক পবিত্র কুঞ্জে সাধন-আসন স্থাপন করিয়া প্রচার শুরু করেন। ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে দুইটি মুস্লিম ওমরাহ তাঁহার শিক্ষাগুরুরূপে তাঁহাকে বরণ ক'রে এবং তাঁহার শরণ নেয়। পরবর্ত্তীকালে রূপ সনাতন ও তাঁহাদের সুপণ্ডিত ভ্রাতুষ্পুত্র জীবগোস্বামী বৃন্দাবনকে পরিণত করেন ভক্তিধর্ম্মের এক প্রধান সাধনপীঠ ও প্রচারকেন্দ্ররূপে। তাঁহাদের সুযোগ্য নেতৃত্ব ও প্রভাবের ফলে বৃন্দাবনী ভক্তিধারা সারা দেশকে পরিপ্লাবিত ক'রে। দয়িতের প্রতি যে ভাবঘন, যে দুর্ব্বার ভালবাসার প্রকাশ দেখি—ইষ্টবস্তু কৃষ্ণের দিকে আগাইয়া যাইতে হইবে সেই অনুপম ভালবাসা নিয়া—প্রেমভক্তি সাধনার এই তত্ত্বাদর্শ জাতীয় জীবনের স্তরে স্তরে সেদিন বিস্তারিত হইতে থাকে। এভাবে ভক্তিবাদ এদেশে সমাগত হয় এক সৃষ্টিধর্ম্মী শক্তি-প্রবাহের মত, প্রতিগৃহে আনয়ন ক'রে প্রেম ও আনন্দের বাণী, আর্য্য সংস্কৃতির ধারাকে করিয়া তোলে নবশক্তিতে উজ্জীবিত। ভক্তির এই নূতন জোয়ার বৃন্দাবন হইতে গুজরাটে আগত হয় ষোড়শ শতকে। আমার ধারণা, গুজরাটের শ্রেষ্ঠ দুইটি ভক্তকবি মীরাবাঈ এবং নরসিঁ মেহতা বৃন্দাবনেরই শক্তিধর সাধক ও আচার্য্যদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন।"[১]

সুপণ্ডিত শ্রীকান্হাইয়ালাল মুন্সীর মতবাদ মানিয়া নিলে বলিতে হয়, গুজরাটের ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ নরসিঁ মেহতা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যেরই উত্তরসূরী—চৈতন্যবৃক্ষের তিনি এক সুরসাল ফল।

[১] কে, এম, মুন্সী: গুজরাট্ অ্যাণ্ড ইট্‌স্ লিটারেচার—পৃঃ ১৭৯।

নরসিঁর কৃষ্ণসাধনার অন্যতম অঙ্গ ছিল কৃষ্ণলীলার মধুর পদ-রচনা। গুজরাটী এবং হিন্দি সাহিত্যে এই সাধক কবির প্রতিভাদীপ্ত বহুতর অবদান ছড়ানো রহিয়াছে। এ সম্পর্কে নরসিঁর জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া মুন্সীজী লিখিয়াছেন—"নরসিঁর আকর্ষণীয় সরস পদসমূহ মুখে মুখে গীত ও ব্যাখ্যাত হইয়া চলিয়াছে কয়েক শত বৎসর যাবৎ। এই পদগুলিকে জনপ্রিয় করিয়া তোলার মূলে রহিয়াছে বল্লভাচার্য্যের অনুগামীদের প্রচেষ্টা, আগামী যুগের ভক্তি-উজ্জীবনের বীজ তাঁহারা এগুলির মধ্যে নিহিত দেখিয়াছেন। ফলে গুজরাট হইতে নরসিঁ মেহতার পদসমূহ হইয়াছে অদৃশ্য ; শুধু তাহাই নয়, অ-গুজরাটী ভাষায় এগুলি চালু হইয়াছে এবং ভিন্নভাষী লেখকদের লেখা হইয়াছে তাহাতে অনেক পরিমাণে প্রক্ষিপ্ত। নরসিঁর নামে প্রচলিত 'হরমালা' ইহার একটি বড় উদাহরণ।—এই পদসংগ্রহটি আত্মপ্রকাশ ক'রে ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে। পরবর্ত্তীকালে প্রেমানন্দ এবং অন্যান্য কবিরা ইহার পুনর্ব্বিন্যাস, এবং পুনর্লিখন সম্পন্ন করেন।"

নরসিঁর পদসমূহের সংখ্যা সাত শত চল্লিশের উপর। শৃঙ্গারমালা নাম দিয়া উহা প্রকাশিত হইয়াছে। কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণ ও গোপীদের মিলন বিরহের কথায় এই কাব্যমালা ভরপুর। প্রেমভক্তির জীবন্ত বিগ্রহ, কৃষ্ণপ্রেমে সদা উন্মত্ত শ্রীচৈতন্যের মধুররসাত্মক ভজন ও তীব্র ভাবময়তার প্রভাব এই রচনাগুলিতে লক্ষ্য করা যায়।

নরসিঁর রাস-সহস্রপদীতে সংগৃহীত রহিয়াছে ১২৩টি রসমধুর সঙ্গীত ও কবিতা। ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ হইতে রাসলীলার উপাখ্যান নিয়া আপন সাধনজীবনের আন্তরিকতা ও কবিত্ব শক্তির বলে তিনি এই পদসমূহকে মনোজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছেন।

তাঁহার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাব্য-রচনার মধ্যে রহিয়াছে সুরতসংগ্রাম, বসন্ত-নাঁ পদো, হিন্দোলা নাঁ পদো এবং ভাগবতের দশম স্কন্দে বর্ণিত কৃষ্ণলীলার কতকগুলি অপূর্ব্ব কাব্য-চিত্র।

'শামল-শা-নো-বিবাহ' নামক একটি আত্মস্মৃতিমূলক কবিতাও

ভক্তকবি নরসিঁ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার নিজ জীবন এবং নিজ পরিবারের নানা তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে।

গুজরাটি সাহিত্যে নরসিঁ মেহতার প্রভাব যে দূরবিস্তারী হইয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।—"তাঁহার রচিত পদ সমূহের মধ্য দিয়া তিনি রসানুভূতির তীব্র আবেগ ও সৌন্দর্য্য-পিপাসার পরিচয় দিয়াছেন। ধীর চালের প্রভাতিয়া ছন্দ সমন্বিত তাঁহার সঙ্গীতগুলি উষাকালীন স্তব বা ভজন-সঙ্গীতের উপযোগী এবং এগুলি গুজরাটিদের কয়েক পুরুষ ব্যাপী ভাব ও ভাষাকে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে। নরসিঁর পদের আঙ্গিক ও রুচিতে সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় তেমন মিলেনা। মীরার লাবণ্য ও ছন্দ সুষমা তাঁহাতে নাই—নাই ভক্ত-সুরদাসের তীব্র আবেগধর্ম্মিতা, নাই গোস্বামী তুলসীদাসের চিরায়ত জীবন-বোধের মর্য্যাদা। তাঁহার ভাষা হয়তো একটু বেশী অলঙ্কার ঘেঁষা—যে সূক্ষ্ম পেলব স্পর্শ উচ্চ শ্রেণীর কবিতা সৃষ্টি ক'রে নরসিঁতে তাহা অনুপস্থিত। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য্য যে তাঁহার যুগের প্রাণহীন সাহিত্যের গণ্ডি ভাঙ্গিয়া তিনি বাহির হইয়া পড়েন এবং গুজরাটী কবিতাকে নৈর্ব্যক্তিক হইতে ব্যক্তি-ভিত্তিক শিল্পকলায় তিনি পরিণত করেন। কবি, ভক্তসাধক ও সনাতন আর্য্যধর্ম্মের সংবাহক-রূপে নরসিঁ মেহতা গুজরাটের ধর্ম্মসংস্কৃতিময় জীবনে ছিলেন অনন্যপুরুষ—আজো তিনি তাঁহার সেই মর্য্যাদায়ই অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন [১]।"

নরসিঁর জুনাগড়ের জীবন শুরু হয় এক অপূর্ব্ব ভাবময়তা ও ভক্তি-উন্মাদনার মধ্য দিয়া। প্রেম সাধনার বাণী তিনি সোৎসাহে প্রচার করিতেছেন জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকল মানুষের কাছে, নিজের জীবনকে করিয়া তুলিয়াছেন ভজনময় ও কৃষ্ণসর্ব্বস্ব। আর তাঁহার গৃহ-অঙ্গনটি হইয়া উঠিয়াছে অগণিত ভক্তের আশ্রয়-স্থল।

দিনরাত তাঁহার গৃহে চলিয়াছে নামগান ও কীর্ত্তনের উৎসব।

---

[১] মুন্সী: গুজরাট্ অ্যাণ্ড ইট্‌স্ লিটারেচার্-পৃঃ ১৯৯

নরসিঁ নিজে একেবারে নিঃস্ব, ভক্ত ও গুণগ্রাহীদের সাহায্যে কোনমতে সপরিবার তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদন চলে। এহেন অবস্থায় কীর্ত্তন উৎসব ও এত প্রসাদান্নের যোগাড় কি করিয়া হয়, তাহা কিন্তু বড় বিস্ময়কর। কীর্ত্তনীয়া বাদনীয়াদের সঙ্গে সঙ্গে জড় হইতেছে শত শত ভক্ত দর্শনার্থী। ইঁহাদের সবাইর জন্য রহিয়াছে প্রসাদান্নের ঢালাও বন্দোবস্ত। কে খাদ্যসম্ভার জুটাইতেছে, কোথা হইতে অর্থ আসিতেছে, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। কৃষ্ণের সংসার যেন সাজানো হইয়াছে নরসিঁ মেহতার গৃহে, আর অন্তরাল হইতে প্রাণের ঠাকুর কৃষ্ণই বহন করিতেছেন সকল কিছুর দায়িত্ব।

শহরের রক্ষণশীল নাগর ব্রাহ্মণদের প্রায় সবাই নরসিঁর জ্ঞাতি। নরসিঁর এই সর্ব্বজনীন ভক্তিবাদ, নিম্নবর্ণের নরনারীর সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠতা তাহাদের কাছে অসহ্য। একদল প্রবীণ ব্রাহ্মণ সেদিন তাঁহাদের বক্তব্য নরসিঁকে বুঝাইতে আসিয়াছেন, নানা সদুপদেশ দিতেছেন। কথাপ্রসঙ্গে তাঁহারা কহিলেন, "নরসিঁ, তুমি বৈষ্ণব হয়েছ, তা বেশ কথা। শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী বিষ্ণুর আরাধনা ক'র, কেউ তাতে আপত্তি করবেনা। কিন্তু, এসব কি হচ্ছে বলতো? প্রেমধর্ম্মের নাম ক'রে শহরের যত বাজে লোক, অছুৎ লোক নিয়ে মূর্খের মত মাতামাতি করছো। এতে-তো তোমার বা তাদের, কারুরই কল্যাণ হবেনা। এবার থেকে প্রকৃত বৈষ্ণব হতেই বরং তুমি চেষ্টা ক'রো।"

'বৈষ্ণব—বৈষ্ণব' বলিতে—ভক্তপ্রবর নরসিঁর দুই নয়নে বহিতে থাকে প্রেমাশ্রুর ধারা। আত্মসম্বরণ করার পর ভক্ত-কবির মুখ হইতে নির্গত হয় এক অপূর্ব্ব সঙ্গীত-পদ। তিনি গাহেন—

বৈষ্ণবজন তো তেনে কহিয়ে,
জে পীড় পরাই জানে রে।
পরদুঃখে উপকার করে তে,
মন অভিমান ন জানে রে॥

সকল লোকমাঁ সহুনে বন্দে,
নিন্দা তে ন করে কেনী রে।
বাচকাছমন নিশ্চল রাখে তো,
ধন্য ধন্য জননী তেনী রে ॥
সমদৃষ্টি নে তৃষ্ণা ত্যাগী,
পরস্ত্রী জেনে মাত রে।
জিহ্বা থকী অসত্য ন বোলে,
পরধন নব জ্ঞালে হাথ রে ॥
মোহমায়া ব্যাপে নহি তেনে,
দৃঢ় বৈরাগ্য জেনা মনমাঁ রে।
রামনামস্থঁ তালী রে লোগী,
সকল তীরথ তেনা তনমাঁ রে ॥
বণলোভী নে কপটরহিত ছে,
কামক্রোধনে নিবার্যা রে।
ভণে নরসৈঁয়ো তেনূঁ দরশন করতাঁ,
কুল ইকোতের তার্য্যা রে ॥[১]

—ওগো, তাকেই তো বলি প্রকৃত বৈষ্ণব
অপরের পীড়া আর দুঃখকে জানে যে নিজের ব'লে
আর্তের সেবায় সদাই সে উন্মুখ
অন্তরে নেই অভিমানের কাঁটা,
সবার চরণে জানায় সে যে নম্র নতি
ঘৃণা নেই কখনো কারুর প্রতি
দেহে মনে সে বীর—পরম ধীর ও সুস্থির।

[১] নরসিঁর এই ভক্তিরসাত্মক পদটি উত্তরকালে মহাত্মা গান্ধীকে অশেষ প্রেরণা যোগাইয়াছিল। এ পদটিকে মনে প্রাণে তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন নিজ জীবনের প্রধান স্তবগাথারূপে।

তাঁর জননী হন পরম সৌভাগ্যবতী
এই বৈষ্ণবের অন্তর সদা নিস্তরঙ্গ—নিস্পৃহ,
সকল জীবন তৃষ্ণা সে করেছে পরিত্যাগ,
পরদার মাত্রেই তাঁর কাছে হয়ে উঠেছে মাতৃসমা।
এ বৈষ্ণব নয় কখনো অসত্য-ভাষী
অপরের ধন হাত দিয়ে কখনো সে ক'রেনা স্পর্শ,
শাস্ত্রে বুৎপত্তি নেই, তবুও অন্তরে আছে আত্মবিশ্বাস,
মন তার রয়েছে সকল মায়ামোহের উর্দ্ধে।
প্রভু শ্রীরামের আরাধনায় পেয়েছে সে ভাবরস,
তার দেহটি হয়ে গিয়েছে পরম পবিত্র—
পরিণত হয়েছে সর্ব্বলোকের তীর্থ রূপে।
এই বৈষ্ণব নয় কখনো বিষয়লুব্ধ,
তঞ্চকতা নেই তাঁর জানা,
সর্ব্ব আকাঙ্ক্ষা আর ক্রোধকে করেছে সে জয়।
কহে ভক্ত নরসিঁ ওরে ভাই,
এমন বৈষ্ণবের দর্শন যে বিরল সৌভাগ্য!
এ দর্শনে একাত্তর পুরুষ হয়ে যায় উদ্ধার!

নরসিঁ মেহ্‌তা নিজে ছিলেন খাঁটি বৈষ্ণব, অপাপবিদ্ধ মহাপুরুষ। তাঁহার স্বচ্ছ দৃষ্টি ও জীবনদর্শনের কাছে তাই সাধু বৈষ্ণবের আধ্যাত্মিক উপলব্ধিটিই বড় হইয়া উঠিয়াছে, আর সমস্ত কিছু গুণ ও ঐশ্বর্য্য হইয়া গিয়াছে অবান্তর। একটি সুপ্রসিদ্ধ পদে নরসিঁ বলিতেছেন:

স্নান তর্পণ আর আরাধনায়ই কি সব হবে?
পাওয়া যাবে পরম প্রভুর দর্শন?
স্নিগ্ধ ছায়াচ্ছন্ন গৃহকোণে বসে
অজস্র দান দাতব্য নিয়েই না হয় কাটালাম জীবন—
ওগো, তাতেই কি সব হবে?

ষড় দর্শনে না হয় প্রাজ্ঞ হওয়াই গেল,
কিন্তু তার ফলে মিল্‌বে কি সে পরম ধন ?
জাতি বর্ণের গৌরব না হয় বজায় রাখাই গেল,
কিন্তু বিষয়-সুখ ছাড়া আর কী পাবো তা থেকে ?
নরসিঁ কহে, জীবনের মণিকোঠায়
সদা জাগ্রত রয়েছেন যে পরমাত্মা—
তাঁকে যে না পায়, সবই যে তার বৃথা।
চিন্তামণি রত্নের মত অমূল্য যে মানবজীবন,
তা সে হারিয়েছে চিরতরে।

পরম তত্ত্বের বিচার প্রসঙ্গে নরসিঁ সদাই জোর দিয়াছেন বাস্তব সাধন-পথের উপর। দর্শনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে ব্যস্ত না হইয়া আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তাকে দিয়াছেন বড় ঠাঁই। আত্মাভিমান নাশের উপর সাধকদের জোর দিতে বলিয়া তিনি গাহিয়াছেন ঃ

জীব ঈশ্বর অনে ব্রহ্মণা ভেদমাঁ
সত্য বস্তু নহি সদ্য জউসে।
হুঁ অনে তুঁপনূ তজীশ নরসৈঁয়া তো
গুরু তনে হর্ষথীপার পাউশে।

—ওগো, সত্য কি উদ্‌ঘাটিত হয় কখনো
চুলচেরা তত্ত্বের বিচারে ?—
জীবাত্মা, ভগবান আর পরমাত্মার
ভেদাভেদ নির্ণয় ক'রে ?
নরসিঁ কহে, আগে দূর ক'র সব ভেদবুদ্ধি,
বিস্মৃত হও 'আমি' 'তুমি'র পার্থক্যবোধ,
তবেই গুরু হবেন আবির্ভূত—
এগিয়ে দেবেন তাঁর কল্যাণ হস্ত।

ব্যক্তিগত সাধন-জীবনে নরসিঁ গভীরভাবে অনুশীলন করিতেন ভক্তিপ্রেম সাধনার মধুর পথ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মত ভাগবত পুরাণকেই তিনি ধরিয়া নিয়াছিলেন এই প্রেম সাধনার ভিত্তিরূপে। কৃষ্ণ ও গোপবালাদের মিলন-বিরহ লীলার রস আকণ্ঠ পুরিয়া পান করিয়াছিলেন—এই পরম রসে হইয়াছিলেন রসায়িত।

ইষ্টদেব কৃষ্ণের দিকে দিনের পর দিন তিনি আগাইয়া চলিয়াছেন। গোপীভাবে মন-প্রাণ সদা বিভাবিত, কখনো হাসি কান্নায়, কখনো বা মধুর রসের উচ্ছৃসতায়, কখনো বা দয়িতের প্রাণ ভোলানো স্তুতি গানে তিনি বিভোর। নিগূঢ় প্রেম সাধনা ও সিদ্ধির ইঙ্গিতবহ একটি পদে মহাভক্ত নরসিঁ গাহিতেছেন:

ভুবন স্বামী কৃষ্ণের করপল্লব আমি করেছি ধারণ,
দিয়েছি আমার প্রেমের অঙ্গীকার।
তবে আর কাকে ক'রবো আমি ভয়?
রাসলীলার ভুবনমোহন সুমধুর দৃশ্য
করেছে আমায় সম্মোহিত,
ঘটেছে পরম অদ্ভুত রূপান্তর,
দেহ আমার যেন হয়ে গিয়েছে গোপীদেহ।
মানিনী রাধার পাশে করেছি উপবেশন,
সখী হয়ে কোমল কণ্ঠে ক'রেছি কত আশ্বাসন,
প্রেমলীলার হয়েছে কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা।
রাধারাণীর পাশে বসে
প্রেমভ'রে বংশীবাদন করেছেন যিনি
সখি, তিনিই যে আমার জীবনস্বামী,
চিরতরে কেড়ে নিয়েছেন দেহ মন প্রাণ।

কান্তাভাবের, গোপীভাবের আর একটি মনোজ্ঞ পদে প্রেমিক সাধক নরসিঁ দয়িত কৃষ্ণের এক অপরূপ রসময় মূর্ত্তি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন:

সখি, দয়িত আমায় ডেকেছেন বাঁশীর সুরে ;
এক মুহূর্ত্তও আর যে যায় না ঘরে থাকা।
হৃদয়ে জেগেছে উল্লাসের প্রমত্ত ঢেউ,
একটিবার দেখতে চাই সই, তাঁর চন্দ্রবদন।
ব'ল, ব'ল এজন্য কি করতে হবে আমায় ?
কাহ্নুর কণ্ঠদেশে জড়ানো ছিল আমার বাহু,
পান করেছিলাম তাঁর আনন সুধা।···
কি ক'রে যাবো পানিয়া ভরণে ?
তাঁর বাঁশির যাদু করেছে আমায় আচ্ছন্ন,
তাঁর মোহন নয়ন দুটি হান্‌ছে সদা তীক্ষ্ণ বাণ,
আর অঙ্গ-লাবণি করেছে আমায় অবশ, বিহ্বল।
সখি, আমার শ্যামের আঁখিযুগলের নেই তুলনা।
তাতে রয়েছে প্রেমের অমোঘ মায়াজাল,
এ জাল ছিন্ন ক'রে
বলতো, কেমনে ফিরে যাই নিজ ঘরে ?
সখি, আমার দেহ মন প্রাণ
সব যে গিয়েছে চুরি !

নরসিঁর এই কৃষ্ণভাবনা, এই কৃষ্ণচর্য্যা শুধু প্রেমরসের উচ্ছ্বাস আর ভাবালুতার মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে নাই। কৃষ্ণসত্তার উদার এবং গগনচুম্বী মহিমাকে ইহা গিয়া স্পর্শ করিয়াছে। পরম পুরুষ কৃষ্ণের অনাদ্যন্ত স্বরূপ বর্ণনা করিতে গিয়া সাধক কবির কণ্ঠে যে পদটি উৎসারিত হইয়াছে যে কোন ভক্তি সাহিত্যে তাহার তুলনা বিরল :

নীরখনে গগনমাঁ কোন ঘুমী রহথো,
তেজ হুঁ তেজ হুঁ শব্দ বোলে।
শ্যামনা চরণমাঁ ইচ্ছুঁ ছুঁ মরণ রে,
আহিঁয়াঁ কোহঁ নথী কৃষ্ণ তোলে।

নরসিঁ মেহতা

শ্যাম শোভা ঘনী বুদ্ধি না শকে কলী,
অনন্ত ওচ্ছবমাঁ পঁথ ভুলী।
জড় নে চৈতন রস করী জানবো,
পকড়ী প্রেমে সজীবঁন মুলী।
জলহল জ্যোত উদ্যোত রবি কোটমাঁ,
হেমনী কোর জ্যাঁ নীসরে তোলে;
সচ্চিদানন্দ আনন্দক্রীড়া ক'রে,
সোনানাঁ পারনাঁ মাঁহী ঝুলে।
বত্তি বিণ্ তেল বিণ্, সূত্র বিণ্ জো বলী,
অচল ঝলকে সদা অনল দীবো;
নেত্র বিণ্ নীরখবো, রূপ বিণ্ পরখবো,
বিণ্ জিহ্বাএ রস সরস পীবো।
অকল অবিনাশী এ নব জায়ে কলয়ো,
অরধ উরধনী মাঁহে মহালে;
নরসৈঁয়া চো স্বামী সকল ব্যাশী রহয়ো,
প্রেমনা তঁতমাঁ সঁত ঝালে।

—একবার তাকিয়ে ছাখো
উদার নিঃসীম আকাশের দিকে:
কে আছে সেথায় ওতপ্রোত হয়ে?
উচ্চারণ করছে কে সেই সুমহান বাণী
—আমিই সেই, আমিই সেই?
অভীষ্ট আমার—কৃষ্ণচরণে দেবো তনু বিসর্জ্জন,
কারণ, প্রাণপ্রভু কৃষ্ণের কই তুলনা?
মন আমার ডুবে রয়েছে সংসারের তরল সুখে,
গভীর, ঘনঘোর কৃষ্ণ-মহিমার
পরিমাপ ক'রবে সে কি ক'রে?

চেতন ও জড় উভয়কেই জানো—
এক এবং অদ্বিতীয় ব'লে ;
চিরন্তন জীবন-সত্তাকে সপ্রেমে আঁকড়ে ধ'র,
দৃষ্টিপাত ক'র ব্রহ্মাণ্ড-ভরা অনন্ত আকাশে,
যেখানে লক্ষকোটি উদয়-ভানুর
উচ্ছ্বলিত জ্যোতির চলছে মহোৎসব।
যেখানে মহাকাশে ওতপ্রোত হিরণ্যবর্ণ অগ্নিস্রোত,
সেখানে পরম প্রভুর আনন্দ লীলার নেই বিরাম—
অনাদ্যন্ত কাল থেকে দুলছে তাঁর স্বর্ণপালঙ্ক।
কালজয়ী জ্যোতির দীপশিখা সেখানে সদা প্রজ্জ্বলিত,
সে দীপে নেই প্রয়োজন সল্‌তের বা তেলের,
সে দীপ নিষ্কম্প—অনির্ব্বাণ।
এসো আমরা দর্শন ক'রি সেই পরম পুরুষকে,
দর্শন ক'রি নয়ন ব্যতিরেকে—
দর্শন ক'রি সেই তাঁকে, যিনি নিরাকার—সীমাহীন।
এসো, এই দিব্য আনন্দামৃত পান করি আমরা
কিন্তু পার্থিব জিহ্বার কোন সাহায্য না নিয়ে।
চির-অজানা, চির-বিদ্যমান এই পরম সত্তা
জ্বল্‌ছেন মহাকাশে অনাদ্যন্ত কাল ধ'রে।
নরসিঁর প্রভু মিশে আছেন সর্ব্বসৃষ্টিতে,
কিন্তু শুধু সাধুদের প্রেমের জালেই পড়েন তিনি ধরা।

ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়া নরসিঁর খ্যাতি প্রচারিত হইতে থাকে, এবং এ খ্যাতি জুনাগড়ের সীমা ছাড়াইয়া বিস্তারিত হয় গুজরাটের নানা অঞ্চলে। নরসিঁর দিনচর্য্যার বেশীর ভাগই কাটিয়া যায় প্রভুজীর নামগান আর নৃত্য কীর্ত্তনে। ভাবাবেশে যখন যে লীলাদৃশ্য মানসপটে ভাসিয়া উঠে। ভক্তকবি তখনি তাহা স্বরচিত রসমধুর পদসমূহে ধরিয়া

রাখেন। তারপর ভক্তগণ-সহ চলে উদ্দণ্ড নৃত্য ও কীর্ত্তন। নরসিঁর এই কীর্ত্তন সভা ক্রমে গণ্য হয় জুনাগড়ের এক শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ রূপে।

ভক্তগোষ্ঠীসহ এই বৃহৎ সংসার—নরসিঁ যাহাকে বলিতেন ঠাকুর রণছোড়জীর সংসার—একদিনের তরেও কিন্তু অচল হয় নাই। ঠাকুরেরই কৃপায় আর ভক্ত শিষ্যদের সহায়তায় ইহার সমস্ত কিছু ব্যয় দিনের পরে দিন অনায়াসে নির্ব্বাহ হইয়াছে। ভক্তিমতী পত্নী মানেক-বাঈর সেবা যত্ন ও ব্যবস্থাপনাও এই সংসারটিকে ধারণ করিয়া রাখিতে কম সাহায্য করে নাই।

কন্যা কুঁওর-বাঈ যৌবনে ক্রমে পদার্পণ করিল। এবার তাঁহার বিবাহ না দিলে চলেনা। বন্ধুবান্ধবদের সহায়তায় শুভকাজ সম্পন্ন হইতে বেশী দেরী হইল না। ব্যয়সাধ্য কুটুম্বিতা ও সামাজিকতার দায়িত্বও কোনরূপে পালন করা গেল।

নরসিঁ কিন্তু মহা বিপদে পড়িলেন, পুত্র-বিবাহের বেলায়। প্রভাতী কীর্ত্তন ও ভজন সেদিন সবেমাত্র শেষ হইয়াছে। ভক্ত শিষ্যদের নিয়া একটু তিনি বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় এক প্রবীণ পুরোহিত ব্রাহ্মণ তাঁহার সম্মুখে আগাইয়া আসেন। নিবেদন করেন, "ভক্তপ্রবর, আপনার নৃত্য কীর্ত্তন দেখে, ভগবৎ ভাবে বিভাবিত নয়ন-মনলোভন মূর্ত্তি দেখে, মুগ্ধ হয়েছি। এবার আপনার একটু অবসর হয়েছে, এই ফাঁকে একটি শুভ প্রস্তাব আপনাকে জানাতে চাই।"

"কৃপা ক'রে বলুন কি আপনার বক্তব্য"—আসন ত্যাগ ক'রে, করজোড়ে উত্তর দেন নরসিঁ।

"আমি দুদিন হয় জুনাগড়ে এসেছি। স্থায়ী নিবাস বড়নগরে। প্রতাপশালী মদন মেহ্‌তার নাম নিশ্চয় আপনার শোনা আছে, আমি তাঁরই প্রতিনিধি হয়ে এই অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছি। মদন মেহতার একটি রূপবতী বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে, তার জন্য একটি সুপাত্র চাই।"

"তা, আপনি আসলে কি বলতে চান ?"

"আমি প্রস্তাব করছি—আপনার পুত্রের সঙ্গে মদন মেহ্‌তার কন্যার বিবাহ অনুষ্ঠিত হোক্।"

"সেকি? তা কি ক'রে হয়? মদন মেহতা যে বড়নগর রাজ্যের একজন দিক্‌পাল। আর আমি হচ্ছি কাঙাল, একজোড়া করতাল ছাড়া আর কোন সম্পদই আমার নেই। এহেন দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণের পুত্রের সঙ্গে মদন মেহতার কন্যার বিয়ে? এ যে হতেই পারে না।"

"নরসিঁ মেহতা, আপনার কৃষ্ণের ইচ্ছে হলে তো সব অসম্ভবই সম্ভব হয়।"

"তাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু ব্যাপার কি খুলে বলুন তো।"

"শুনুন্ তবে। আমি আজ কয়েকদিন যাবং জুনাগড়ে এসেছি। এ কয়দিনই সোৎসাহে এই কীর্ত্তন সভায় উপস্থিত ছিলাম। নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করলাম আপনার অতি অদ্ভুত প্রেমভক্তিভাব। কৃষ্ণের নিতান্ত আপন জন না হলে এ সাত্ত্বিক ভাবের উদয় মানুষের জীবনে তো হয় না! আপনার ছেলে শ্যামলকেও আমি লক্ষ্য করেছি বেশ ভালভাবে। সং ও ধর্ম্মনিষ্ঠ যেমনি, তেমনি পরের সেবা আর উপকারেও দেখেছি তার উৎসাহ। এই ছেলেকেই আমি মনোনীত করলাম মদন মেহতার কন্যার বর হিসেবে।"

"পণ্ডিতজী, সবই শুনলাম, কিন্তু মদন মেহতা যে মস্ত ধনী লোক। বড়নগরের রাজদরবারে তাঁর প্রবল প্রতিষ্ঠা। আমার মত কাঙালের মেয়েকে কেন পুত্রবধূ ক'রবেন তিনি?"

"সে আমি বুঝবো, ভাই। এ ব্যাপারে মদন মেহতা যে আমাকেই সব দায়িত্ব অর্পণ করেছে। আর আমার দিক থেকে বলতে গেলে, আপনার ছেলে শ্যামলের চাইতে উপযুক্ত পাত্র তো আমি কোথাও দেখতে পাইনে। এ প্রস্তাবে অমত ক'রবেন না, ভাই।"

কথাটি রাষ্ট্র হইতে দেরী হয় নাই। একদল ঈর্ষাপরায়ণ জ্ঞাতি নরসিঁর কাছে তখনি ছুটিয়া আসে। শ্লেষের সুরে বলে, "নরসিঁ, বলিহারি যাই তোমার চতুরতা দেখে। এদিকে দিন্-ভিখারী বৈষ্ণব সেজে আছো,

দেখাচ্ছো কাঙালপনা। আর ওদিকে ছেলের বৌ আন্‌ছো মদন মেহতার মত ধনীর ঘর থেকে। তা যাই হোক, বড়লোক কুটুম্বের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাজ করতে পারবে তো ?"

"কুটুম্ব ধনী, কিন্তু তাতে আমার কি আসে যায়"—নরসিঁ সবিনয়ে নিবেদন ক'রেন।

"না—নরসিঁ, খুব আসে যায়। আমাদের নাগর ব্রাহ্মণদের একটা সামাজিক সম্মান আছে আর আছে কুলগৌরব। তুমি যে তার হানি ঘটাবে তা আমরা হতে দেবনা। বড়লোকের মেয়ে ঘরে আনতে হলে, বড়লোকের মতই এ বিয়েতে তোমায় খরচ-পত্র ক'রতে হবে। আমাদের বংশ গৌরবের এতটুকু হানি ঘটালে, তোমায় আমরা সমাজচ্যুত ক'রবো এ কথাটি যেন স্মরণ থাকে।"

সরল হৃদয় নরসিঁ এ মন্তব্য বড় ভয় পাইয়া গেলেন। মদন মেহ্‌তার প্রতিনিধি পণ্ডিতকে তিনি কথা দিয়া ফেলিয়াছেন। অথচ তাঁহার কাছে একটি কানাকড়ির সংস্থান নাই। বংশগৌরবের অজুহাত তুলিয়া জ্ঞাতিরা চাপ দেওয়া শুরু করিয়াছে। সমারোহের সহিত এ বিবাহ অনুষ্ঠিত না হইলে তাঁহার নিগ্রহের অবধি থাকিবে না। এ যে এক মহা সঙ্কট !

পত্নী মানেক-বাঈ সব কথা ধীরভাবে শুনিলেন, কহিলেন, "এজন্য তুমি এত ভেবে মরছো কেন। দ্বারকাধীশ রণছোড়জী যাঁর প্রভু, বন্ধু—তাঁর আবার কিসের অভাব ? তুমি আজই রওনা হয়ে যাও। গিয়ে ঠাকুরকে সব খুলে ব'ল। নিশ্চয় তিনি এর একটা বিহিত ক'রবেন।"

এ প্রস্তাব শুনিয়া নরসিঁ তো মহা উৎসাহী। শ্রীবিগ্রহ রণছোড়জীকে অনেকদিন দর্শনও করা হয় নাই। পরের দিন প্রত্যূষে উঠিয়াই রওনা হইলেন প্রাণপ্রভুর অধিষ্ঠান ক্ষেত্রের উদ্দেশে।

দ্বারকায় পৌঁছিয়া কিন্তু মানেক বাঈর কোন কথাই নরসিঁর স্মরণ রহিল না। কখনো দিব্য ভাবাবেশে কখনো বা ভজনানন্দে কয়েকদিন অতিবাহিত হইয়া গেল। অবশেষে ঠাকুর একদিন তাঁহাকে দর্শন দিলেন।

প্রেমমধুরকণ্ঠে তিনি কহিলেন, "নরসিঁ, আর নয়, এবার নিজ গৃহে ফিরে যাও। সেখানে আমার অগণিত ভক্ত যে নির্ভর ক'রে থাকে তোমারই ওপর। ছাখো, মানেকবাঈ ঠিক কথাই বলেছে। আমি তোমার প্রাণপ্রিয় বন্ধু, ইহকাল পরকাল সকল কালেরই বন্ধু। হ্যা, এই ছটোই আমি দেখবো। তুমি ভেবো না, শ্যামলের বিয়ে ভালোভাবেই অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে।"

"তাই তো প্রভু, তোমার কাছে আসার পর আমি যে ঘর-সংসারের কথা, সমস্যার কথা সব একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। ভাগ্যিস্ তুমি মনে করেছো। আমি কাঙাল, নির্য্যাতন ও অপমানের ভয় আমার নেই কিন্তু সবাই জানে, তোমার মত রাজরাজেশ্বর আমার প্রতিপালক, বন্ধু। দেখো, তোমার যেন কোন নিন্দে সমালোচনা না হয়। তা হলে প্রাণে বাঁচবোনা।"

"নরসিঁ, ভয় নেই, তা হবে না। আরো জেনে রেখো, যারা একহাতে সংসারকে ধ'রে, আর একহাতে ধ'রে আমায়—তাদের ভার আমি নিতে পারিনে। অহমিকার প্রাচীর তুলে তারা আমায় দূরে সরিয়ে রাখে। যারা সব কিছু চিরতরে ত্যাগ ক'রে আমায় ছহাতে জড়িয়ে ধ'রে, তাদের সব ভার গ্রহণ না ক'রে আমার উপায় থাকে না। তুমি যে ছহাতে আমায় জড়িয়ে ধরেছো, নিয়েছো একান্ত শরণ। তাই তো তোমার সব সমস্যার দিকে সতত রয়েছে আমার দৃষ্টি।"

আশ্বস্ত হইয়া পরমানন্দে নরসিঁ জুনাগড়ে ফিরিয়া আসিলেন। পুত্র শ্যামলের বিবাহ অনুষ্ঠিত হইল যথাকালে এবং মহা সমারোহের সহিত। দ্রব্যসম্ভার, লোকজন, বাদ্যভাণ্ড, আলোকসজ্জা কোন কিছুরই অভাব দেখা গেল না। কে যে কাহার নির্দ্দেশে কাজ সম্পন্ন করিয়া যাইতেছে, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। জ্ঞাতি নাগর ব্রাহ্মণেরা তো কাণ্ড দেখিয়া হতভম্ব। কেহ বলে, এসব নরসিঁর সিদ্ধাইর খেলা। কেহ বা বলে নরসিঁর ভক্ত শিষ্যের সংখ্যা আজকাল প্রচুর, তাহারাই প্রাণপণে সাহায্য করিয়াছে, এ বিপদ হইতে তাহাকে করিয়াছে উদ্ধার।

দীন দরিদ্র ও অন্ত্যজদের জন্য নরসিঁর করুণা ও ভালবাসার অন্ত ছিল না। বস্তুত তাঁহার হরিসভা-প্রাঙ্গণ ছিল সমাজের এইসব নিম্ন শ্রেণীর মানুষের এক বড় আশ্রয়, তাপিত লাঞ্ছিত জীবনের জুড়ানোর স্থান, শান্তির স্থান।

সেদিন একদল দেহাদ আসিয়া নিবেদন ক'রে, "প্রভু, রোজ তো আপনার অঙ্গনেই আনন্দের হাট বসে আর হরিকথা হরিকীর্ত্তনে সবাই পরিতৃপ্ত হয়। আমাদের একান্ত অভিলাষ, একদিন আমাদের দেহাদ পাড়ায়, আমাদেরই কুটিরে হরিসভা বসুক। আমাদের এ মনোবাঞ্ছা কি পূর্ণ হবে? অচ্ছুৎ-দের মধ্যে গিয়ে কীর্ত্তন-নর্ত্তন করতে কি আপনি রাজী হবেন? ভয়ে ভয়েই আমাদের প্রার্থনা জানাচ্ছি। এখন আপনার যা অভিরুচি।"

"সে কি রে? এ সব কি বলছিস্"—বলিতে বলিতে সজল চক্ষে ভাবাবেগ কম্পিত দেহে নরসিঁ মেহতা আগাইয়া আসেন, প্রেমভরে আলিঙ্গনাবদ্ধ করেন তাঁহার অস্পৃশ্য দেহাদ ভক্তদের। বলেন, কৃষ্ণসেবায় তোদেরই তো সব চাইতে বড় অধিকার। আর তার বড় সুযোগও রয়েছে তোদেরই।"

অপার বিস্ময়ে দেহাদের দল প্রেমাবিষ্ট মহাপুরুষের দিকে তাকাইয়া থাকে।

নরসিঁ মেহতা বলিয়া চলেন, "ঠাকুরের কি কম কৃপা তোদের ওপর? তোদের তিনি অর্থ দেননি, দেননি উচ্চ বর্ণের গৌরব—তার ফলে তোদের অর্থের অভিমান তেমন জন্মেনি, জাতি কুলের অভিমানও আসতে পারেনি। এ কি কম সৌভাগ্যের কথা রে? তোরা নির্ধন, অন্ত্যজ—তাইতো অহমিকার বেড়া তোরা টপ্‌কে যেতে পারিস্ এত সহজেই, প্রাণ-প্রভুকে ধরতে পারিস বুকের মাঝে। দীন বলেই তো দীনদয়ালের পরম প্রিয় তোরা। সেই তোদের মত ভক্তের অঙ্গনে গিয়ে কীর্ত্তন ক'রবো, এ তো আমার ভাগ্যের কথা রে।'

"তবে যাবেন তো প্রভু?"

"নিশ্চয় আমি যাবো—বার বার যাবো তোদের দেহাদ মহল্লায়। প্রাণভরে সবাই মিলে করবো সেখানে পরমপ্রভুর নাম গান।"

পরের দিনই নরসিঁ মহা উৎসাহে দেহাদ পল্লীতে সদলবলে গিয়া উপস্থিত। শত শত অস্পৃশ্য ভক্ত কৃষ্ণনামে প্রমত্ত হইয়া নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতেছে, আর ভক্তিসিদ্ধ মহাত্মা নরসিঁ মেহতা তাহাদের মধ্যে দণ্ডায়মান। ভাবাবেশে কখনো অর্দ্ধবাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিতেছেন, কখনো বা উদ্দীপিত হইয়া গাহিতেছেন প্রেমরসের নব নব পদ ও স্তুতিগান। দেহাদদের মধ্যে ভক্তিপ্রেমের এক প্রচণ্ড জোয়ার সেদিন বহিয়া চলিল।

রক্ষণশীল জ্ঞাতিরা, নাগর ব্রাহ্মণেরা, কিন্তু নরসিঁর উপর মহা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। মারমুখ হইয়া অনেকে সেদিন তাঁহার আঙ্গিনায় উপস্থিত হয়, উত্তেজিত স্বরে কহিতে থাকে, "ব্রাহ্মণের সন্তান হয়ে, বিশেষ ক'রে শাস্ত্রবিদ্ নাগর-ব্রাহ্মণের কূলে জন্মে এ কি জঘন্য আচরণ তোমার, নরসিঁ? নিজের বাড়ীতে কীর্ত্তন-আসর বসিয়েছো, রাজ্যের যত অস্পৃশ্যদের ডেকে আনছো, এতেও এতকাল আমরা তেমন কিছু বলিনি। মুখ বুজে সব সহ্য ক'রে আসছি। এবার কিন্তু সব সহ্যের সীমা তুমি অতিক্রম করেছো। এ আমরা কিছুতেই চলতে দেবো না। এ রকম করলে নাগর-ব্রাহ্মণদের কেউ কি আর মান্য ক'রবে?

"বেশ তো, আপনাদের কি হুকুম হয়?"

"যে পাপ ক'রেছ, তার তুমি প্রায়শ্চিত্ত ক'র। তার পর সমাজের সবাইর কাছে করজোড়ে ক্ষমা চেয়ে প্রতিজ্ঞা ক'র, আর তুমি দেহাদ-দের সঙ্গে মিশবে না।

"সে কি ক'রে হয়? তারা যে আমার হরির আপন জন—হরিজন। তাদের সঙ্গ কি ক'রে ত্যাগ ক'রবো, বলুন?" —দৃঢ়কণ্ঠে জানাইয়া দেন নরসিঁ মেহতা।

"বেশ, তা হলে তুমি তোমার অচ্ছুৎ বন্ধুদের নিয়েই থাকো। আজ থেকে নাগর ব্রাহ্মণ সমাজে আর তোমার ঠাঁই রইলো না। চিরতরে

হলে তুমি জাতিচ্যুত।”—এই শেষ কথাটি বলিয়া দিয়া ক্রোধোদ্দীপ্ত জ্ঞাতিরা বিদায় নিলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই জুনাগড়ের নাগর ব্রাহ্মণ সমাজের কোন ধনী গৃহে এক বিবাহ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বলা বাহুল্য, এই উৎসবে নরসিঁকে নিমন্ত্রণ ক'রা হয় নাই। একঘরে লোককে ভোজনে আহ্বান জানাইয়া কে আবার বিপদে পড়িতে যাইবে?

বিবাহ সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এবার ভোজনের পর্ব্ব। সমাজের প্রধান ব্যক্তিরা সবাই মিলিয়া পঙ্‌তি ভোজনে বসিয়াছেন। উপাদেয় বহুতর চব্যচোষ্য লেহ্যপেয় পরিবেশন করা হইতেছে। সর্ব্বত্র শোনা যাইতেছে দীয়তাং ভোজ্যতাং রব। হঠাৎ এই আনন্দময় পরিবেশে ঘটিল এক বৃহৎ ছন্দ পতন। ভোজনরত নাগর-ব্রাহ্মণেরা প্রত্যেকেই সবিস্ময়ে দেখিতেছেন—তাঁহার পাশে উপবিষ্ট এক একটি অস্পৃশ্য দেহাদ। এ কি অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য! প্রত্যেকটি নিমন্ত্রিত ব্যক্তিই ইহার প্রত্যক্ষদর্শী। ছ্যুৎ-মার্গী রক্ষণশীলের দল ঘৃণায় বিস্ময়ে শিহরিয়া উঠিয়াছেন। ভোজনপাত্র ত্যাগ করিয়া লজ্জানত নয়নে তাড়াতাড়ি তাঁহারা একযোগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

জল্পনা কল্পনা শুরু হইয়া গেল। ব্যাপার তো বড় সহজ নয়। পঙতি ভোজনে বসিয়া সমাজের এতগুলি লোক একসঙ্গে যে ইন্দ্রজাল প্রত্যক্ষ করিলেন তাহাকে তো হাল্কাভাবে উড়াইয়া দেওয়া যায় না!

সমাজের অন্যতম প্রধান চিন্তিত স্বরে সবাইকে কহেন, “গ্যাখো, আমরা এতগুলো লোক আজ এখানে যে অলৌকিক দৃশ্য দেখলাম, তা সত্যই বিস্ময়কর। তোমরা যে যা-ই ব'ল, আমাদের নরসিঁ মেহতা যে একজন ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ এবং অতি অদ্ভুত ধরণের সিদ্ধাইসমূহ যে তার করায়ত্ত, এ কথা মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। দেশের শত সহস্র লোক আজ তাঁর পায়ে এসে উপুড় হয়ে পড়ছে, তার অঙ্গনে ভিড় জমাচ্ছে—ভেতরে একটা ঐশী শক্তি না থাকলে কি ক'রে এটা একটা সম্ভব হয়?”

"বেশ তো এখন তা হ'লে আমাদের কি করা উচিত, তাই ব'ল।"—অনেকেই সমস্বরে প্রশ্ন করেন।

"তা হলে, চল সবাই মিলে নরসিঁর কুটিরে। তাকে জানিয়ে আসি—আমরা তার উপর বড় অবিচার করেছি। অত্যধিক কঠোর হয়েছি। এজন্য আমরা অনুতপ্ত। আরো বলে আসি—আজ থেকে সে আর জাতিচ্যুত নয়। আমাদের সকল কিছু সামাজিক অনুষ্ঠানে আগের মতই যোগদান ক'রতে পারবে।

সেইদিন হইতেই নরসিঁ মেহতা সসম্মানে নাগর ব্রাহ্মণদের সমাজে আবার গৃহীত হইলেন।

প্রেমানন্দ প্রভৃতি গুজরাটী কবিরা নরসিঁ মেহতার অলৌকিক জীবন সম্পর্কে আরও দুইটি কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন।

নাগর ব্রাহ্মণদের পঙক্তি ভোজনের দিন যে অলৌকিক কাণ্ড ঘটে লোকমুখে দেশের সর্ব্বত্র তাহা ছড়াইয়া পড়ে। ক্রমে জুনাগড়ের রাজা রায় মাণ্ডলিকও এ কাহিনী শুনিতে পান।

কৌতূহলী রাজা একদিন দূত পাঠাইয়া নরসিঁ মেহতাকে তাঁহার প্রাসাদে আমন্ত্রণ জানান এবং নরসিঁও সদলবলে উপস্থিত হন। শুরু হয় তাঁহার সদ্য-রচিত রসমধুর পদের কীর্ত্তন গান। রাজসভায় আনন্দের বান ডাকিয়া উঠে।

কীর্ত্তন সাঙ্গ হইলে রায় মাণ্ডলিক কহেন, "ভক্ত-কবি, আপনার কীর্ত্তন পদ শুনে আমরা খুবই তুষ্ট হয়েছি। কিন্তু আমার নিজের দিক দিয়ে একটা অনুরোধ আছে, সেটা আপনাকে রাখতেই হবে।"

"কি অনুরোধ, বলুন রাজাসাহেব।"

"আজ আমার জন্মদিন। আমার ইচ্ছে এখানে বসেই দ্বারকাধীশ রণছোড়জীর প্রসাদী মালা পেয়ে ধন্য হই। আপনি রণছোড়জীর চিহ্নিত সেবক, ভক্তিসিদ্ধ সাধক। এখনি এখানে বসে আপনি আমায় ঐ মালা এনে দিন্।"

"সে কি রাজাসাহেব ! তা কি ক'রে হয় ? আমি দীনহীন ভক্ত, প্রভুর প্রসাদী মালা দ্বারকা থেকে এখুনি আনাবো, এমন শক্তি আমার কই ?"—করজোড়ে নিবেদন করেন নরসিঁ মেহতা।

রায় মাণ্ডলিক উত্তেজিত হইয়া উঠেন। তীক্ষ্মস্বরে কহেন, "নরসিঁ মেহতা, আপনার সিদ্ধাইর খ্যাতি আমি শুনেছি। নাগর ব্রাহ্মণেরা তাদের বিবাহ সভায় যে অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য দেখেছে, আপনার অলৌকিক শক্তির যে প্রকাশ ঘটেছে, তা তো জুনাগড়ের কারো অবিদিত নয়। আপনি আমায় এড়াতে চেষ্টা করবেন না। মনে রাখবেন, আমি রাজা—আপনি প্রজা। তাছাড়া, রাজার আদেশ বা অনুরোধ না রাখলে দণ্ড পেতে হয়, তা কি আপনার জানা নেই ?"

নরসিঁ প্রমাদ গণিলেন। পরম প্রভুর একান্ত সেবক হয়ে দীনভাবে দিন গুজরাণ করছেন তিনি। সিদ্ধাই বা অলৌকিক শক্তির প্রকাশ দেখাবার মত মনোবৃত্তি তাঁহার কোনদিন হয় নাই। এ কি সঙ্কটে প্রভু রণছোড়জী আজ তাঁহাকে ফেলিলেন ?

যুক্তকরে কহিলেন, "রাজাসাহেব, আমি সত্যি বলছি, আমার তেমন কোন অলৌকিক শক্তি নেই। আর তা থাকবেই বা কেমন ক'রে ? নিজের যা কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা, শক্তি-সামর্থ্য ছিল তা সবই যে নিবেদন ক'রে দিয়েছি আমার ঠাকুরের চরণে। আর তো সে সব ফিরিয়ে আনা যায় না। আমায় আপনি মাপ করুন। এখানে বসে দ্বারকা থেকে রণছোড়জীর প্রসাদী মালা নিয়ে আসা আমার সাধ্য নয় !"

রায় মাণ্ডলিক এবার রোষে গর্জিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "নরসিঁ মেহতা ! রাজ্যের সবাই বলাবলি ক'রে—আপনি ভক্তিসিদ্ধ সাধক। অত্যাশ্চর্য্য বিভূতি নাকি আপনার করায়ত্ত। তা যদি সত্য হয়, তবে আপনি দেশের রাজাকে—আমাকে, এই সিদ্ধাই দেখাতে বাধ্য। আর যদি আপনার সে অলৌকিক ক্ষমতা না থাকে, তবে যারা আপনার সম্বন্ধে এসব কাহিনী রটিয়ে বেড়াচ্ছে তাদের নিরস্ত করছেন না কেন ? কেন জানাচ্ছেন না তীব্র প্রতিবাদ ?"

"লোকে কে কোথায় আমার নামে কি বলছে তা নিয়ে আমার মাথা-ব্যথা যে এতটুকু নেই। রণছোড়জীর দীন ভক্ত আমি—নিজের কুটিরে বসে তাঁর নাম কীর্ত্তন করি, ক্রন্দন করি, আর ফেলি আমার অশ্রুজল। এছাড়া তো আমার আর কোন পরিচয় নেই, রাজাসাহেব!"

"এ সব ভণ্ডামীর কথা শোনবার সময় আমার নেই। আজ রাতের অবশিষ্ট কাল আপনাকে থাকতে হবে কারাগারে। ওখানে বসে নিভৃতে চেষ্টা করুন, রণছোড়জীর প্রসাদী মালা আমায় এনে দিন। নতুবা কাল প্রভাতে আমার আদেশে হবে আপনার মৃত্যুদণ্ড।"

সারা রাজসভা কাঁপিয়া উঠে রায় মাণ্ডলিকের এই দৃপ্ত ঘোষণায়। রাজার আদেশে রক্ষীরা তখনি নরসিঁকে ধরিয়া নিয়া যায়, আটক করিয়া রাখে পার্শ্ববর্ত্তী বন্দীশালায়।

আদেশ রক্ষিত না হইলে প্রাণদণ্ড, ইহাই রাজার নির্দ্দেশ। কিন্তু প্রাণের ভয়ে নরসিঁ ভীত নহেন, ইষ্টদেবের চরণ দুখানি ধ্যান করিতে করিতে প্রশান্ত হৃদয়ে তিনি কারাকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

বিশাল লৌহকপাট সশব্দে বন্ধ হইয়া গেল। করজোড়ে স্মিতহাস্যে নরসিঁ এবার রণছোড়জীর উদ্দেশে কহিলেন, "কারা প্রাচীরের অভ্যন্তরে আমায় পাঠিয়ে দিয়ে ভালোই করেছ প্রভু। এবার তোমার দীনভক্ত নরসিঁর আশে পাশে এমন কেউ নেই যে তাকে বিভ্রান্ত করবে, মায়া-পাশে আবদ্ধ ক'রবে। এবার বন্দীশালায় নির্জ্জন কক্ষে বসে সর্ব্ব মন-প্রাণ দিয়ে তোমারই স্মরণ মনন করবো। করুণাঘনরূপে তুমি আবির্ভূত হবে, আর মুখোমুখি থাকবো শুধু আমরা দুজনে—নরসিঁর প্রাণপ্রভু আর নরসিঁ। তবে প্রভু, একটা প্রার্থনা আমি জানিয়ে রাখি। তোমার ইচ্ছায় রাজ্যের সবাই জেনে গেছে—নরসিঁ তোমার চির শরণাগত, তোমার কৃপাসিদ্ধ ভক্ত। রায় মাণ্ডলিকের কাছে ভক্ত নরসিঁর মান রক্ষা ক'রে তোমার শরণাগতি তত্ত্বের জয় ঘোষণা ক'র প্রভু।"

রাত্রি প্রভাত হইলে পাত্রমিত্রসহ রায় মাণ্ডলিক কারাকক্ষের সম্মুখে

আসিয়া দাঁড়াইলেন। চারিদিকে ভক্তজন ও কৌতূহলী নরনারীর ভীড়। দ্বার খুলিতেই দেখা গেল, ভাবাবিষ্ট নরসিঁ মেহতা ঠাকুরের নাম নিয়া উন্মত্তের মত নর্ত্তন কীর্ত্তন করিতেছেন। আর পরম আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহার দুই হস্তে বিধৃত রহিয়াছে রণছোড়জীর দুইটি সুবৃহৎ মালা।

রাজপুরোহিতেরা আনন্দে অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "এই তো দ্বারকাধীশের প্রসাদী মালা! জয় প্রভু রণছোড়জীর জয়, জয় ভক্ত নরসিঁ মেহতার জয়।" কারাকক্ষের বাহিরে দণ্ডায়মান জনতা তখন আনন্দ কলরবে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে।

কিছুদিন পরের কথা। জুনাগড়ের এক বড় বেনিয়া সেদিন হন্তদন্ত হইয়া নরসিঁ মেহতার কুটীরে আসিয়া উপস্থিত। ব্যগ্রস্বরে কহিল, মেহ্‌তাজী, একটা বড় সঙ্কটে পড়ে আপনার কাছে আজ শরণ নিচ্ছি। আমায় আপনাকে উদ্ধার করতেই হবে।"

"সঙ্কটত্রাতা তো আমি নই, ভাই, ত্রাতা হচ্ছেন আমার ঠাকুর রণছোড়জী। তা আপনি কেন এত চঞ্চল হয়েছেন, বলুন।"

"তবে সব কথা খুলে বলছি। বেট্‌-দ্বারকার বন্দরে একজন বড় শেঠকে আমায় কয়েক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিতে হবে। নির্দ্ধারিত যে সময় রয়েছে, তার আগেই দিতে হবে। কিন্তু এখন রাজ্যের সীমান্তে, বেট্‌-দ্বারকার পথে খুব যুদ্ধ বিগ্রহ চলছে। এসময়ে এতগুলো স্বর্ণমুদ্রা সঙ্গে ক'রে নেওয়া সমীচীন নয়। আমি চাই, এখানে আমি ঐ অর্থ কারুর তহবিলে জমা দিয়ে দিই, আর দ্বারকায় পৌঁছে তার কোন স্থানীয় প্রতিনিধির কাছ থেকে তা গ্রহণ করি। দ্বারকা থেকে বেট্‌-দ্বারকার বন্দর কাছেই, টাকার লেনদেন সহজেই সেরে নিতে পারবো।"

"তা, আমায় দিয়ে তোমার এ কাজে কী সাহায্য হবে?"—প্রশ্ন করেন নরসিঁ।

"আপনিই তো একমাত্র ব্যক্তি যিনি একাজ আমায় ক'রে দিতে পারেন।"

"কিছুই বুঝতে পারছিনা, সব খুলে বলুন।"

"তবে শুনুন, কি ভাবে আমার কার্য্যসিদ্ধি হবে, তা বলছি। নরসিঁ মেহতা, সবাই জানে—দ্বারকাধীশ রণছোড়জী আপনার পরম বন্ধু, আপনার যে কোন প্রার্থনা পূর্ণ করতে তিনি সদাই প্রস্তুত। বলুন, আমার একথা ঠিক কিনা?"

"তা, একথা মিথ্যে নয়, তিনি আমার প্রাণপ্রভু, প্রাণবন্ধু তাতে সন্দেহ কি?"—স্মিত হাস্যে উত্তর দেন ভক্তপ্রবর।

"তা হলেই আমার কাজ অনেকটা সহজ হয়ে গেল। দেখুন, আমি প্রস্তাব করছি কি—আপনার কাছে আমি পাঁচ হাজার স্বর্ণমুদ্রা জমা ক'রে দিচ্ছি। তার বদলে আপনি আমায় একটা চিরকুটে স্বীকৃতিপত্র লিখে দিন যে, আমি দ্বারকায় পৌঁছুলেই আপনার বন্ধু দ্বারকাধীশ বিগ্রহ আমায় ঐ পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে দেবেন। তা হলেই আমার কাজটি সুসম্পন্ন হবে। অন্যথায় আমার ব্যবসায় কিন্তু একেবারে লাটে উ্ঠবে।"

প্রস্তাব শুনিয়া নরসিঁ মেহ্তা তো বিস্ময়ে হতবাক্। এ আবার কি রহস্যের কথা। জগৎ-স্রষ্টা জগৎপতি যিনি, তিনি এসে শেষটায় বেনিয়ার সঙ্গে হাতচিঠা মারফৎ অর্থের লেন-দেন করিবেন?

বেনিয়া কিন্তু নরসিঁকে আর কোন কথা বলার অবকাশ দিলনা। যুক্ত করে কহিল, "মেহতাজী, এ ব্যবস্থা ছাড়া আমার কারবার রক্ষার আর কোন উপায় নেই। আমি আপনার শরণাগত আশ্রিত, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, প্রভু কিষণজী, আপনার মর্য্যাদার খাতিরেই আমার এ অনুরোধ রক্ষা করবেন।"

নরসিঁ কিছু বলার আগেই বণিক নিজের স্বর্ণমুদ্রার থলিটি তাঁহার হাতে গুঁজিয়া দিল, দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল দ্বারকার অভিমুখে।

কথিত আছে, ঐ বণিক দ্বারকায় পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই এক শ্যামল কিশোর তাঁহার সঙ্গে আসিয়া ব্যস্ত সমস্তভাবে সাক্ষাৎ করেন। কহেন, "ভাই তুমি কি আমাদের নরসিঁর বন্ধু? স্বর্ণমুদ্রার থলিটির

জন্যই তো তুমি অপেক্ষা করছো। এই নাও, নরসিঁর কাছে যা দিয়েছিলে, তার সবটা ঠিকমত এখানে রয়েছে।"

জনশ্রুতি আছে, পরম কারুণিক ঠাকুর সেদিন তাঁহার শরণাগতের মান রাখিয়াছিলেন এমনিভাবে, ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ নরসিঁর খ্যাতিকে করিয়াছিলেন সুপ্রতিষ্ঠিত।

গুজরাটের ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে মহাপুরুষ নরসিঁ মেহতা বিরাজিত ছিলেন দীর্ঘকাল এবং এই কালের মধ্যে তাঁহার ধর্ম্মসভা ও কীর্ত্তন-আসরের প্রভাব এবং ভক্তিরসাত্মক পদসমূহ রাজ্যের দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

দীর্ঘ আশী বৎসর কাল নরসিঁ জীবিত ছিলেন এবং শেষ জীবনে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কয়েকটি গুরুতর শোকের আঘাত। পত্নী মানেকবাঈ ও পুত্র শ্যামলের দেহান্ত হইল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এই মর্ম্মভেদী আঘাত বীতরাগভয়ক্রোধ মহাত্মাকে একটুও বিচলিত করিতে পারে নাই। শোকে যাহারা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে আসিত তাহাদেরই বরং তিনি বুঝাইতেন, "জানতো, এই আঘাতের ভিতর দিয়েই ভগবান চান ভক্তের পরীক্ষা—এই আঘাতের মধ্য দিয়েই চূর্ণ হয় অহমিকার প্রাকার—প্রভু আর আশ্রিত হয়ে যায় একাকার।"

সাধ্বী স্ত্রী মানেকবাঈর বিয়োগ ঘটিলে, স্বহস্তে তাঁহাকে চিতায় তুলিয়া দিয়া আসিয়া নরসিঁ মেহতা রচনা করিয়াছিলেন কৃষ্ণস্তুতির এক অপূর্ব্ব পদ। ভক্তগণসহ সারা রাত্রি সেই পদ তিনি গাহিয়াছিলেন কৃষ্ণরসাবেশে উন্মত্ত হইয়া।

অকালে তাঁহার পুত্র শ্যামলের প্রাণবিয়োগ ঘটে এবং তাহার পরই আসে এক বড় দুর্দ্দৈব—কন্যা কুঁয়রবাঈর জীবনে পতিত হয় বৈধব্যের নির্ম্মম আঘাত। পর পর এই প্রচণ্ড আঘাতেও মহাসাধক নরসিঁর মনোলোকে কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যায় নাই।

অন্তরঙ্গ ভক্তেরা একদিন তাঁহাকে প্রশ্ন করেন, "প্রভু, আপনি কৃষ্ণের

একান্ত আপন জন। আপনার ওপর কেন উপর্য্যুপরি দৈবের এমন নিষ্ঠুর আঘাত ?"

"বলেছি তো, আঘাত নয়, এ যে প্রাণপ্রভুর পরীক্ষা গ্রহণ। যাকে দিয়েছেন ভজন সাধন, যাকে দিয়েছেন সিদ্ধি, পরীক্ষা দেবার শক্তি যে শুধু তারই রয়েছে। কৃষ্ণ কৃপা ক'রে এ জীবনে কিছু দিয়েছেন, তাই পরীক্ষাও নিচ্ছেন এমনি ভাবে"—প্রশান্ত কণ্ঠে উত্তর দেন মহাত্মা নরসিঁ মেহতা।

আবার বর্ষিত হয় প্রশ্ন, "কি আশ্চর্য্য! আত্মপরিজনের এই মৃত্যু, এই বিরহ-ব্যথায় আপনার চোখে নেই একবিন্দু শোকাশ্রু। এ কি অদ্ভুত আচরণ আপনার ?"

"ভাই, কৃষ্ণ আমায় যে ভাবে তৈরী করেছেন, তাতে এই আচরণ ছাড়া আমি কি করতে পারি ? কৃষ্ণকৃপায় আমি যে দিনরাত উপলব্ধি করেছি—আমার এই দেহমন প্রাণ, আমার আত্মপরিজন বন্ধু বান্ধব সবাই উদ্ভূত হয়েছে কৃষ্ণ থেকে, আবার মিলিয়ে গেছে সেই কৃষ্ণে। তবে কোথায় আমার ক্ষোভ, কোথায় আমার নিরানন্দ ? আমার জগৎ কৃষ্ণময়—সেখানে কৃষ্ণের বাইরে তো কেউ নেই !"

অশীতিপর বর্ষে সুপরিণত বয়সে নরসিঁ মেহতা একদিন অন্তরঙ্গ ভক্তদের নিকটে আহ্বান করিলেন। কহিলেন, "আমার অপ্রকট হবার নির্দ্দিষ্ট লগ্নটি সমাগত। তোমরা সবাই প্রাণভরে এই শেষ সময়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে গাও—

সুখ সংসারী মিথ্যা করী মানজো,
কৃষ্ণ বিনা বীজুঁ সর্ব কাচুঁ।

—বিশ্ব প্রপঞ্চের স্তরে স্তরে
যত কিছু সুখ আর আনন্দ,
সবই যে অলীক—সবই ছায়াময়।

আমার পরাণ প্রভু কৃষ্ণজী বিনা
আর সবই যে ক্ষণস্থায়ী,—বুদ্বুদেরই মত।"

স্বরচিত পদটির সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে ভাবাবেশে মহাপুরুষের নয়ন দুইটি মুদিত হয়, চিরতরে ধরাধাম তিনি ত্যাগ করেন। ভজনমত্ত অন্তরঙ্গ শিষ্য ও ভক্তদের জীবনে নামিয়া আসে দুঃসহ শোকের কৃষ্ণ-ছায়া।

সিদ্ধ জয়কৃষ্ণ দাস

"বাবাজী, ইয়ে বাঙালী বাবাজী। খানা পীনা ছোড় কর্ প্রাণ কেঁও দে রহে হো? এ ক্যায়সা বাৎ? আরে থোরাসে দুধ্ তো পী লেও। মেরি বাৎ তো স্থনো?" —কাম্যবনের গহন অঞ্চলে, ঝুপড়ির সম্মুখে দাঁড়াইয়া ব্রজমায়ী বারবার অনুনয় করিতে থাকে।

ব্রজমণ্ডলের এই বনে কৃচ্ছ্রব্রতী বৈষ্ণব সাধক জয়কৃষ্ণ কয়েকদিন যাবৎ ধ্যানমগ্ন—নীরব নিস্পন্দ, বাহ্যজ্ঞান বিরহিত। দিনের পর দিন এভাবে কাটিয়া যাইতেছে, এই ডাকাডাকি তাই তাঁহার কাণে পশিল না।

এবার শুরু হয় রমণীর চীৎকার আর সোরগোল। ধ্যান ভাঙ্গিয়া যায়, জয়কৃষ্ণ ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করেন। স্থযোগ পাইয়া রমণী তাঁহার মুখ বিবরে ঢালিয়া দেয় পাত্রস্থিত দুগ্ধরাশি।

সঙ্গে সঙ্গে জয়কৃষ্ণের দুই গণ্ড বাহিয়া নামিয়া আসে অশ্রুর ঢল। ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠেন, "মায়ী, এ তুমি আমার কি করলে! তুচ্ছ এই দেহটা জীইয়ে রাখার জন্য দুর্লভ লীলা-দর্শনে টেনে দিলে ছেদ?"

দৃপ্তভঙ্গীতে ব্রজবাসিনী বলিয়া উঠে, "শোন্ বাবাজী, শ্রীমতীর হুকুম রয়েছে আমার ওপর। এ কাম্যবনে এসে উপবাসী থেকে কোন সাধু যেন দেহপাত না ক'রে। ওরে, দেহের আধারটাকে বাঁচিয়ে রাখলে তবে তো তাতে ধরতে পারবি ভজনসিদ্ধির পরম রস। তুই ভাবিসনে, রাধা কিষণ্‌জীর নিত্যলীলা তুই দর্শন করবি জীবন ভোর। আমি বল্‌ছি—মনস্কামনা তোর পূর্ণ হবে?"

স্বর্গীয় হাসির চমক লাগাইয়া ব্রজময়ী ঝুপড়ি হইতে সরিয়া আসে, অকস্মাৎ গভীর অরণ্যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়।

অনাস্বাদিতপূর্ব্ব, অপ্রাকৃত আনন্দের ঢেউ বারবার দোলা দেয়, সাধক জয়কৃষ্ণের সারা দেহমনে, সারা সত্তায়। ভাবিতে থাকেন, কে এই ব্রজবাসিনী? ইনি তো মানবী নন? তবে কি সিদ্ধ-অধ্যুষিত এই পবিত্র কাম্যবনের অধিষ্ঠাত্রী? না—আর কোন দেবী কৃপা করিয়া সশরীরে হইয়াছেন আবির্ভূত ?

কঠোর সাধনে বড় শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, এবার বিশ্রাম চাই। ঝুপড়ির মেঝেতে জয়কৃষ্ণ দেহটি এলাইয়া দেন, তারপর অল্প সময়ের মধ্যে অভিভূত হইয়া পড়েন গাঢ় নিদ্রায়। এ সময়ে স্বপ্নযোগে দেখেন, জ্যোতির্মণ্ডলের মধ্যবর্ত্তিনী এক দিব্য নারীমূর্ত্তি তাঁহার দিকে তাকাইয়া স্নেহমধুর হাসি হাসিতেছেন।

দেবী তাঁহাকে কহিলেন, "বাবাজী, আমায় তুমি তখন চিনতে পারোনি। আমি বৃন্দাদেবী। যে কথা তোমায় বলে এসেছি, তা সত্য হবেই। মধুর ভজনের যে পরম সাধনায় তুমি ব্রতী, তা সফল হবে। গুরুর আদেশে কৃচ্ছ্রব্রত এতদিন কম করেনি। কাম্যবনে এসে পৌচেছো তোমার বৈষ্ণবীয় সাধনার শেষ স্তরে। এবার রাধারাণীর কৃপা পেতে আর দেরী নেই। তবে, বাছা, তোমার এখনকার সাধনে কঠোরতার আর দরকার হবে না।"

অল্পকালের মধ্যেই সাধক জয়কৃষ্ণ আপ্তকাম হন, রাগানুগা ভজনের সিদ্ধি হয় তাঁহার করায়ত্ত। তারপর ধীরে ধীরে, শুধু কাম্যবনের সাধুদের মধ্যেই নয়, সারা ব্রজমণ্ডলে এই গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সাধনৈশ্বর্য্যের খ্যাতি প্রচারিত হইয়া পড়ে। অতঃপর উচ্চকোটির বৈষ্ণব সাধকেরাও দলে দলে তাঁহার চরণে আসিয়া আশ্রয় নিতে থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—গোবর্দ্ধনের কৃষ্ণদাস, সূর্য্যকুণ্ডের মধুসূদন দাস প্রভৃতি ভক্তিসিদ্ধ বাবাজীগণ।

গুরুর দুইটি আদেশ ছিল সাধক জয়কৃষ্ণের উপর। বলিয়াছিলেন, "বৎস, প্রেম সাধনার শ্রেষ্ঠ ফল পেতে হলে, রাগানুগা ভজনের পরমপ্রাপ্তি লাভ করতে হলে, দেহমনকে আগে থেকে বৈরাগ্যের

আগুনে দগ্ধ করে নিতে হবে। কৃচ্ছ্র সাধন করতে হবে সনাতন গোস্বামীকে আদর্শ ক'রে, সাধন-জীবনের প্রথম পাদে যিনি এক বৃক্ষতলে এক রাত্রির বেশী অতিবাহিত করেননি, যাঁর প্রতিদিনকার আহার—শুক্নো অর্দ্ধদগ্ধ আঙাকড়ি—আজো মদনমোহনের প্রধান ভোগ প্রসাদ বলে গণ্য হয়ে আছে ?" পরমারাধ্য গুরুর অপর নির্দ্দেশ, "জয়কৃষ্ণ, বার বৎসর কৃচ্ছ্র সাধনের পর তুমি কাম্যবনে গিয়ে ধ্যান ভজন ক'রো। বহু সিদ্ধ তপস্বীর তপস্যায় পবিত্রীকৃত এই অঞ্চল। সেখানেই মিলবে তোমার প্রার্থিত পরমবস্তু।"

সাধক জয়কৃষ্ণ অক্ষরে অক্ষরে একথা পালন করিয়াছেন। কঠোর ব্রহ্মচর্য্য এবং দৈন্য ও বৈরাগ্যের সাধন শেষে, এবার আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন ব্রজমণ্ডলের কাম্যবনে। বৈষ্ণবীয় সাধনার পরম সাফল্যের দ্বারে আসিয়া তিনি দাঁড়াইলেন, সিদ্ধদেহে নিত্যলীলা নিত্যদর্শনের বিরল সৌভাগ্য উপস্থিত হইল তাঁহার ত্যাগ-তপস্যাপূত সাধনজীবনে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দুইপাদ ব্যাপিয়া কাম্যবনের সিদ্ধবাবারূপে ব্রজমণ্ডলের বৈষ্ণবসমাজে তিনি সুপরিচিত হইয়া উঠিলেন। আশ্রয় দিলেন অগণিত বৈষ্ণব সাধু ও ভক্ত গৃহস্থকে।

অষ্টাদশ শতকের প্রথম দশকে, পশ্চিম বঙ্গের এক সাধননিষ্ঠ বৈষ্ণব পরিবারে সিদ্ধবাবা জয়কৃষ্ণ দাস ভূমিষ্ঠ হন। সহজাত সাত্ত্বিক সংস্কার এবং নিজ গৃহের ভজন সাধনময় পরিবেশ বাল্যকাল হইতেই তাঁহার জীবনকে করিয়া তুলিয়াছিল কৃষ্ণময়। তারপর উত্তরজীবনে ব্রজমণ্ডলের পরম পবিত্র কাম্যবনে উপনীত হইয়া তিনি ব্রতী হন দুঃসহ কৃচ্ছ্র ও ভজনময় তপস্যায়। সৌভাগ্যক্রমে সদ্‌গুরুর দর্শন লাভ ঘটে এই কাম্যবনেরই এক নিভৃত অরণ্যে এবং এখানে গুরু নির্দেশিত পন্থায় সাধন করিয়া প্রাপ্ত হন ইষ্টদেব ব্রজেন্দ্রনন্দন ও মহাভাবময়ী প্যারিজীর দর্শন।

সে-বার কাম্যবনের বিচেল্লীবাস নামক এক নির্জন স্থানে তিনি ভজনসাধনে রত রহিয়াছেন। বাবাজীর সাধনৈশ্বর্য্যের খ্যাতি শুনিয়া

ঢাকা নগরীর নিত্যানন্দ বংশোদ্ভব এক ভক্ত বৈষ্ণব, নবকিশোর গোস্বামী, তাঁহার কুটিরে আসিয়া উপস্থিত। সঙ্গে তাঁহার উপাস্য বিগ্রহ শ্রীরাধামদনমোহন। কয়েকদিন বাবাজীর সঙ্গসুখ উপভোগ করার পর গোস্বামীজি দেশে ফেরার উদ্যোগ করিতেছেন। হঠাৎ, সেদিন ইষ্ট বিগ্রহ স্বপ্নযোগে বলিলেন, "ওগো গোস্বামী, আমি তোমার এতদিনকার সেবায় খুবই তুষ্ট হয়েছি সন্দেহ নেই। কিন্তু এখান থেকে যে আমার চলে যেতে ইচ্ছে করছে না। স্থির করেছি, জয়কৃষ্ণ বাবাজীর সেবাই আমি কিছুদিন গ্রহণ করবো।"

নবকিশোর চমকিয়া উঠিলেন, হঠাৎ একি নিষ্করুণ বিচ্ছেদের কথা ঠাকুরের মুখে? অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া কহিলেন, "প্রভু, আমার সাধ্যমত তোমার সেবা করেছি এতকাল, এ যে আমার পরম সৌভাগ্য। এখন তুমি আমায় ছেড়ে যেতে চাচ্ছো, যাও। কিন্তু এই নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের কুটিরে, জনমানবহীন এই অরণ্যে তোমার সেবাপূজা কি করে চলবে, তা ভেবে পাচ্ছিনে!"

"ওগো, এই নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব যে আমাকেই তার পরম কাম্য বন বলে এতকাল তপস্যা করে এসেছে। তার সেবায় আমার কষ্ট হবে কেন? এখানকার ব্রজবালারা আমার দেখাশুনা ঠিকই করবে। তাছাড়া, আসল কথাটা কি জানো, আমার সেবাপূজা নিয়ে না থাকলে তোমাদের সিদ্ধ বাবাজীর দেহ থাকবে না। এ দেহ দিয়ে আমার ভক্তদের কাজ আছে। নবকিশোর, তুমি দুঃখ করো না। আমি এবার এখানেই থেকে যাচ্ছি।"

প্রত্যাদেশের কথা শুনিয়া জয়কৃষ্ণ বাবাজীর আনন্দের আর অবধি নাই। পরদিনই মহা উৎসাহে শ্রীবিগ্রহের জন্য এক নূতন কুটির তিনি বাঁধিয়া ফেলিলেন। বন্ধনহীন নিঃসঙ্গ তপস্যাময় জীবনে এবার আসিল ইষ্টসেবা ও জনকল্যাণের পালা। ধীরে ধীরে বাবাজী মহারাজের ব্যক্তিত্ব ও সাধনাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিল নিগূঢ় রাগাত্মিকা ভজনের এক বৈষ্ণবগোষ্ঠী।

কিছুদিন পরের কথা। এক তরুণ বৈষ্ণব সাধক সেদিন বাবাজীর ভজন কুটিরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত। তাঁহার একান্ত বাসনা, সিদ্ধবাবাজীর সেবা পরিচর্য্যায় দিনাতিপাত করিয়া আপন জীবন ধন্য করিবে। ভগবান আজ যেন সুযোগ মিলাইয়া দিলেন—নবলব্ধ বিগ্রহ রাধামদনমোহনের সেবার দায়িত্ব ইঁহার উপর দিয়া বাবাজী মহারাজ এবার নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন। শ্রীবিগ্রহ ও সিদ্ধবাবা—উভয়ের সেবায় তরুণ বৈষ্ণব নিষ্ঠাভরে আত্মনিয়োগ করিলেন। বলা বাহুল্য বাবাজী মহারাজের কৃপালাভে এই একনিষ্ঠ সেবকের বেশী দেরী হইল না।

কিছুদিন পর বাবাজী একদিন প্রসন্ন মধুরকণ্ঠে কহিলেন, "বাবা তুমি নিগূঢ় কৃষ্ণ ভজনের যোগ্য অধিকারী। তোমায় আমি রাগানুগা সাধনের পদ্ধতি শিক্ষা দেবো। কিন্তু তার আগে জানা দরকার, তোমার গুরুপ্রণালী কি? তা তোমার জানা আছে কি?"

তরুণ বৈষ্ণব সবিস্ময়ে উত্তর দিলেন, "প্রভু, এ সম্বন্ধে তো আমি কিছুই জানিনে? আমার গুরুদেবকে একথা কখনো আমি জিজ্ঞেসও করিনি কোনদিন?"

"সাধনার পথে, পরম্পরাক্রমে সিদ্ধ গুরুদের আনুগত্য স্বীকার করতে হয়—কৃপাদত্ত মন্ত্রের সাধন করতে হয়, আর তাঁদেরই প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে সিদ্ধগোপীরূপা মঞ্জরীদেহে সেবা করতে হয়—এই হচ্ছে প্রকৃত রাগাত্মিকা ভজনের পথ। বাবা, তুমি একবার দেশে চলে যাও। তোমার গুরুদেবের কাছ থেকে গুরু প্রণালী আনয়ন কর। নতুবা শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেম-সেবার অধিকারী হওয়া তোমার পক্ষে কঠিন হবে।"

সেবক-বৈষ্ণব বাবাজীকে ছাড়িয়া যাইতে একেবারেই অনিচ্ছুক। কিন্তু কোন উপায় নাই। বাবাজীর চাপে পড়িয়া অগত্যা তাঁহাকে দেশের দিকে রওনা হইতে হইল।

তখনকার দিনে মথুরায় রেল লাইন প্রবর্ত্তিত হয় নাই। বাংলায়

আসিতে হইলে হাথ্‌রাসে গিয়া যাত্রীদের গাড়ী ধরিতে হইত। বৈষ্ণবটি পদব্রজে ষ্টেশনের দিকে আগাইয়া চলিলেন বটে কিন্তু বাবাজী মহারাজকে ছাড়িয়া যাইতে তাঁহার প্রাণ যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

পথ চলিতে চলিতে সাশ্রুনয়নে রাধারাণী ও বৃন্দাদেবীর চরণে মিনতি জানাইলেন, গাড়ী আসিয়া পৌঁছানোর আগেই যেন তাঁহার মর জীবনের অবসান ঘটে।

পথে নানা কারণে অনেকটা দেরী হইয়া গেল এবং ষ্টেশনে আসিয়া শুনিলেন, গাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছে। বুক হইতে তাঁহার পাষাণভার যেন নামিয়া গেল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া আবার তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিলেন কাম্যবনে।

এদিকে বাবাজী মহারাজ তাঁহার ভজন কুটিরের সম্মুখে চঞ্চল চরণে পদচারণা করিতেছেন, সেবক বৈষ্ণবটির প্রত্যাগমনের আশায় ব্যাকুলভাবে রহিয়াছেন প্রতীক্ষমান।

ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর এবং পথশ্রান্ত সেবকটি ধীরে ধীরে কুটির প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়ান। অন্তরে উৎকণ্ঠা আর ভয়ের অবধি নাই। আশঙ্কা—সিদ্ধ বাবাজী ক্রোধভরে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ হয়তো তাড়াইয়া দিবেন। কিন্তু হঠাৎ এক বিচিত্র কাণ্ড সেখানে ঘটিয়া গেল। বাবাজী ছুটিয়া আসিয়া পরম স্নেহভরে তাহাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন, বারবার জানাইতে লাগিলেন অন্তরের আশীর্ব্বাদ।

খানিক বাদে বাবাজীর মুখে সমস্ত কাহিনীটি শুনিয়া তরুণ সেবকের বিস্ময় ও আনন্দের সীমা রহিলনা। গতরাত্রে বৃন্দাদেবী বাবাজীকে স্বপ্নযোগে দর্শন দিয়াছেন, আর তীব্রভাবে করিয়াছেন তিরস্কার,—"তুই কেন ওকে নিষ্ঠুরভাবে দূরে পাঠিয়েছিস? ওর গুরুপ্রণালী তো তোর শ্রীবিগ্রহের সিংহাসনের নীচেই রাখা আছে। যা—তাড়াতাড়ি ছাখ্‌না সেখানে খুঁজে?"

বাবাজী মহারাজ হন্তদন্ত হইয়া ঠাকুরের আসনের দিকে তখনি ছুটিয়া গেলেন। সবিস্ময়ে দেখিলেন, স্বপ্নাদেশমত তাঁহার ঐ সেবকটির

গুরুপ্রণালীর পত্রটি ঠিকই সেখানে রহিয়াছে। এই অলৌকিক কৃপা দর্শনে তাঁহার দুই নয়নে অশ্রু নামিয়া আসিল। বৃন্দাদেবীর চরণে মিনতি জানাইতে লাগিলেন—"ওগো কৃপাময়ী, আমার 'সেবক শিষ্যকে শিগ্‌গীর ফিরিয়ে এনে দাও।"

তারপরই হাথরাস ষ্টেশনে গাড়ী ধরার গোলযোগ। তরুণ বৈষ্ণবটি তাই সানন্দে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সিদ্ধবাবার বিচ্ছেদ তাঁহাকে সহিতে হইল না, ইহাই তাঁহার পরম আনন্দ।

অচিরে এই ঘটনার কথা ব্রজমণ্ডলের সাধুসন্ত মহলে ছড়াইয়া পড়ে। ইহার পর হইতেই জয়কৃষ্ণদাস বাবাজীর 'সিদ্ধ' নাম সর্ব্বত্র বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়া পড়ে।

বাবাজী মহারাজ কাম্যবনের বিমলাকুণ্ডের তীরে বসিয়া ভজন সাধন করিয়া চলিয়াছেন, আর মুমুক্ষু সাধক ও দর্শনার্থীরা দল বাঁধিয়া আসিতেছে এই সমর্থ মহাবৈষ্ণবকে দর্শন করিতে। তাঁহার সস্নেহ আশীর্ব্বাদ ও উপদেশবাণী শুনিয়া সবাই হইতেছে কৃতকৃতার্থ।

গোবর্দ্ধনের বিখ্যাত ভজনসিদ্ধ বৈষ্ণব ছিলেন। কৃষ্ণদাস বাবাজী। সাধনজীবনের গোড়ার দিকে তিনি প্রবীণ সাধক জয়কৃষ্ণদাস বাবাজীর উপদেশ লাভে অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণদাসজী তখন জয়পুরে অবস্থান করিতেছেন এবং জাগ্রত বিগ্রহ গোবিন্দজীর সেবা পূজায় নিষ্ঠাভরে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। একদিন মহাসমারোহে জয়পুররাজের এক বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হইল, ভোগ প্রসাদের ব্যবস্থা হইল ঢালাও ভাবে। পূজা শেষে কৃষ্ণদাসজী অন্যান্য সেবকদের সঙ্গে বসিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

কিন্তু অচিরেই তাঁহার দেহে মনে শুরু হইল এক মহা উপদ্রব। কামের প্রচণ্ড বেগ বারবার আসিতে লাগিল তাঁহার ভজননিষ্ঠ দেহে। সাধক কৃষ্ণদাস বাবাজী বড় ভীতি-বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। এ বিপদে কি করিবেন, কাহার কাছে যাইবেন, কিছুই ভাবিয়া পান না। হঠাৎ মনে

পড়িল কাম্যবনের সিদ্ধ বাবাজীর কথা। তাড়াতাড়ি জয়পুর হইতে ছুটিয়া আসিলেন তাঁহার চরণতলে।

আর্ত্তিভরে সিদ্ধ জয়কৃষ্ণদাসের কাছে নিবেদন করিলেন, "বাবাজী দীর্ঘকাল গুরুর নির্দ্দেশ অনুযায়ী সাধন করেছি, জ্ঞানতঃ কোন অনাচার কোনদিন করিনি, তবে কেন আজ আমার এই দুর্ভোগ? প্রসাদ গ্রহণ করার পরও কেন আমার চিত্তে কামরিপুর এই জঘন্য উৎপাত? তবে কি বুঝতে হবে আমার সাধনায় কোথাও গুরুতর ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটেছে? তাছাড়া, আমার মনে আর একটা প্রশ্নও জেগেছে। শুনেছি, মহাপ্রসাদ চিন্ময় বস্তু। কিন্তু তা গ্রহণ করার পরও আমার এই দুরবস্থা কেন? তবে কি আমার মত অভাজনের ক্ষেত্রে মহাপ্রসাদের চিন্ময়ত্বের ব্যতিক্রম ঘটলো?"

স্নেহমাখা স্বরে সিদ্ধ বাবাজী উত্তর দিলেন, "জানতো বাবা, জীব বিষয়ের ক্লেদ আর পঙ্কে ডুবে আছে চিরদিন। ভক্তির আগুনে সে কি সহজে জ্বলে উঠতে চায়? সাধককে আগে কঠোর সংযম ও তপস্যার মধ্য দিয়ে দেহ মনকে শুকিয়ে নিতে হবে, তবে দেখা যাবে আগুনের ক্রিয়া। মহাপ্রভু নিজেই তো কৃচ্ছ্র ব্রত সাধনের মধ্য দিয়ে জীবকে এ তত্ত্ব শিখিয়ে গিয়েছেন। তিনবার শীতে স্নান, ভূতলে শয়ন—এই ছিল তার সন্ন্যাস জীবনের চিরাচরিত অভ্যাস। তোমার এ বয়সে সাধন-কঠোরতায় একটু ঢিল দিলেই যে সর্ব্বনাশ। রাজার প্রদত্ত ভোগ—মহাপ্রসাদ, তা ঠিকই। কিন্তু তা তুমি উদরপূর্ত্তি ক'রে খেলে কেন, বাবা? বিষয়ীর নিবেদিত প্রসাদ যদি খেতেই হয়, তা খাবে কণিকামাত্র এবং তুলসী মঞ্জরী দিয়ে স্পর্শ ক'রে।"

"কিন্তু বাবাজী, মহাপ্রসাদ তো চিন্ময়, তা খেয়ে এমন অনর্থ হোল কেন?"

"মহাপ্রসাদ চিন্ময় তাতে সন্দেহ কি? কিন্তু এই চিন্ময়কে তার স্বরূপে গ্রহণ করার সামর্থ্য তোমার জন্মেছে কি? বাবা, জৈব দেহের খোরাক

হিসেবে মহাপ্রসাদ কখনো গ্রহণ করবে না, তাতে পাপ হবে, আর দেহের দুর্ভোগও ঠেকানো যাবে না।"

কৃষ্ণদাস তাঁহার চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। নবীন সাধককে সস্নেহে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া জয়কৃষ্ণবাবা কহিলেন "বাছা, তুমি আর জয়পুরের হট্টগোলে, বিষয়ীদের মধ্যে ফিরে যেয়ো না। এখানে দোমন-বনে বসে এবার ভজন শুরু কর, অচিরে পাবে মহাপ্রভুর কৃপা সম্পদ।"

সিদ্ধবাবাজীর আশীষ ও উপদেশে উত্তরকালে এই কৃষ্ণদাস বাবাজী এক ভক্তিসিদ্ধ সাধকে পরিণত হন, গোবর্দ্ধনের সন্নিকটে নিজ ভজনাসন স্থাপন করিয়া আশ্রয় দেন বহু মুমুক্ষুকে।

জয়কৃষ্ণদাস বাবাজীর প্রেমভক্তির সিদ্ধাই সম্পর্কে ব্রজমণ্ডলে নানা জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাধক ও আচার্য্যেরা মাঝে মাঝে কাম্যবনে আসিয়া এই মহাত্মার কাছে রাগানুগা সাধনের দিগ্-দর্শন নিয়া যাইতেন, বৈষ্ণবশাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বসমূহের মর্ম্ম তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করিতেন। এই সময়ে প্রেমতত্ত্বের ব্যাখ্যান শুরু হইলেই সকলে সবিস্ময়ে দেখিতেন—সিদ্ধবাবাজীর শুধু গাত্ররোমই নয়, মস্তকের কেশরাশিও প্রেমবিকারের ফলে সজারুর কাটার মত শূন্যে উত্থিত হইয়াছে। ভক্ত ও অভ্যাগতেরা নির্নিমেষে চাহিয়া থাকিত এই অলৌকিক প্রেমবিকারের দৃশ্যের দিকে।

সে-বার এক বিশেষ উৎসব উপলক্ষে বৃন্দাবনের একদল উচ্চকোটির বৈষ্ণব সাধু ও আচার্য্য সিদ্ধবাবার কুটিরের কাছে সমবেত হইয়াছেন। সাধু ও আচার্য্যেরা ভজনকুটিরে ঢুকিয়া মহাত্মার সহিত তত্ত্বালোচনায় রত, আর অঙ্গনে অবিরাম চলিয়াছে উচ্চকণ্ঠের নামকীর্ত্তন। কিছুক্ষণ নাম শ্রবণের পরই সিদ্ধবাবা দিব্যভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠিলেন, প্রেমপ্রমত্ত হইয়া ছাড়িলেন এক প্রচণ্ড হুঙ্কার। উপস্থিত সকলে সবিস্ময়ে দেখিলেন, কুটিরের ছপ্পরটি সেই হুঙ্কারে সশব্দে বিদীর্ণ হইয়া গেল।

একান্তচারী বাবাজী মহারাজ কিন্তু লোকের আনাগোনা, বিশেষ করিয়া বিষয়ীর সংস্পর্শ মোটেই পছন্দ করিতেন না। সনাতনের বৈরাগ্যসাধন তিনি দীর্ঘকাল অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন, তাই বিত্তবান ব্যক্তি অথবা রাজরাজড়াদের এড়াইয়া চলাই ছিল তাঁহার বরাবরের অভ্যাস।

একবার কিন্তু বড় গোল বাধিল। বাবাজী মহারাজের সাধনস্থল কাম্যবন ছিল ভরতপুরের মহারাজার অধিকারভুক্ত। এই রাজা বড় বৈষ্ণবসেবাপরায়ণ। এত বড় একজন সিদ্ধ বৈষ্ণব তাঁহার রাজ্যে বসবাস করিতেছেন, অথচ তিনি তাঁহার দর্শন ও আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে পারিতেছেন না, এ বড় খেদের কথা। প্রথমে বাবাজীকে প্রাসাদে আনয়ন করার সকল কিছু চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তারপর ভরতপুররাজ দৈন্যভরে আবেদন জানাইলেন, তিনি নিজেই বাবাজীর কুটিরে গিয়া তাঁহার কৃপা মাগিবেন। কিন্তু এ আবেদনও অগ্রাহ্য হইয়া গেল। নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব সাধক বিষয়ী রাজার সংস্পর্শ হইতে সর্ব্বদা নিজেকে সতর্কভাবে দূরে রাখিতে চাহিতেছেন।

একদিন জয়কৃষ্ণ বাবাজী ভিক্ষার জন্য নিকটবর্ত্তী গ্রামে গিয়াছেন, ইতিমধ্যে ভরতপুররাজ এক বৈষ্ণব ভিখারীর ছদ্মবেশে তাঁহার ভজন কুটিরের মধ্যে ঢুকিয়া এক কোণে চুপচাপ বসিয়া পড়িলেন। উদ্দেশ্য, বাবাজী মহারাজ যখন প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন তখন তাঁহার চরণ ধরিয়া মিনতি করিবেন, আর করিবেন কৃপা ভিক্ষা।

রাজার এ মনোভাব কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ বৈষ্ণব মহাত্মার অজানা রহিল না। ভিক্ষাপাত্র নিয়া রাজা সেদিন বনে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এক চতুরতার আশ্রয় নিলেন—উচ্চ স্বরে গ্রামবাসীদের জানাইতে লাগিলেন কাতর আহ্বান।

সবাইকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভাইসব, শোন, আমার ভজন্ কুটিরে আগুন লেগেছে, তোমরা সবাই সেখানে ছুটে যাও, দয়া ক'রে আগুন নেভাও।"

গ্রামের বহু লোক ত্রস্তেব্যস্তে বাবাজীর আশ্রমে গিয়া উপস্থিত। কিন্তু একি কাণ্ড! আগুনের চিহ্নমাত্র তো কোথাও নাই। সবিস্ময়ে তাঁহারা দেখে, বাবাজীর কুটিরে ভরতপুরের রাজা দীন বেশে উপবিষ্ট। কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না—সিদ্ধ জয়কৃষ্ণদাসজী একটা ছল করিয়া রাজ সংস্পর্শ এড়াইয়া যাইতে চাহিতেছেন। শুধু তাহাই নয়, সর্ব্বজন সমক্ষে রাজাবাহাদুরকে অপদস্থ করিয়া তাঁহার ভক্তিনিষ্ঠাও এভাবে তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন।

ভরতপুর-রাজ ভক্ত মানুষ, বৈষ্ণব সেবাপরায়ণ। তাই সিদ্ধবাবাজীর সেদিনকার এ ছলনায় নিজেকে তিনি অপমানিত মনে করেন নাই। রাজসম্পদ ও প্রতিষ্ঠার জন্য এই মহাবৈষ্ণবের কাছে তিনি অপাংক্তেয়— এই চিন্তাই বরং সেদিন তাঁহার অন্তরের দৈন্য ও আর্ত্তি আরো বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। আরও কিছুকাল পরে এই রাজা সিদ্ধবাবাজীর আশীর্ব্বাদ পাইয়া ধন্য হন।

জীবনের শেষপাদে বাবাজী বাহিরের সর্ব্ব সংস্পর্শ ত্যাগ করিলেন, নিমজ্জিত হইলেন নিগূঢ় প্রেমসাধনার গভীরতম স্তরে। এই সময়ে একদল গোপবালক প্রায়ই তাঁহার ভজন কুটিরের সম্মুখে কোলাহল ও উপদ্রব করিত। নির্জ্জনতাপ্রিয় বাবাজী তাই এ স্থান ত্যাগ করিলেন। গ্রামবাসীরা সবাই মিলিয়া তাঁহাকে গভীর অরণ্যে, আরো নিভৃত স্থানে, ভজনের সুবিধার্থ এক নূতন কুটির বাঁধিয়া দেয়। এ স্থানে একান্তে অবস্থিত হইয়া তাঁহার সাধন ভজন চলিতে থাকে।

একদিন বাবাজী অন্তরঙ্গ সেবা ও লীলা আস্বাদনে মত্ত রহিয়াছেন, হঠাৎ কোথা হইতে একদল গোপবালক তাহার কুটির প্রাঙ্গনে আসিয়া চীৎকার শুরু করিয়া দিল। বালকদের এ উপদ্রব তাঁহার অজানা নয়। তাই আপন মনে নিজ সাধনায়ই তিনি রত রহিলেন। কিন্তু শান্তিতে থাকিবার উপায় কই? বালকদল চেঁচাইতে থাকে, "বাবাজী, ও বাবাজী, পিপাসায় আমাদের ছাতি ফেটে যাচ্ছে। একটু জল দাও না শিগ্গীর করে।" ভজন কুটিরের ভিতর হইতে তবুও সাড়া শব্দ মিলিতেছে না।

সিদ্ধবাবা মহারাজ তখন অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায়। একমনে তিনি লীলারস সম্ভোগ করিতেছেন।

গোপবালকেরা ছাড়িবার পাত্র নয়। গালাগাল দিয়া বলিতে থাকে, "বাঙালী বাবাজী, তুমি কেমন ভজন করছো তা আমাদের জানা আছে। দয়াহীন ভজনকারীকে কশাই ছাড়া আর কি বলা যায়? তুমি কুটির থেকে এখনি বেরিয়ে এসো। ঠাণ্ডা জল দিয়ে আমার প্রাণ বাঁচাও।"

বালকদের চেঁচামেচিতে বিরক্ত হইয়া জয়কৃষ্ণদাসজীকে ভজন কুটিরের দরজা খুলিয়া বাহির হইতে হইল।

দেখিলেন, দিব্যকান্তিযুক্ত একদল চঞ্চলমতি গোপবালক তাঁহার সম্মুখে দুষ্টামী আর হুটোপুটি করিতেছে। সারা অঙ্গন একেবারে তোলপাড়। কি জানি কেন ইহাদের উপর দৃষ্টি পড়া মাত্রই বাবাজীর মন বড় শান্ত ও প্রসন্ন হইয়া উঠিল।

সস্নেহে প্রশ্ন করিলেন, "লালা, তোমরা কোথা থেকে এখানে এলে? কোথায় থাক? কি তোমাদের নাম, বলতো?"

শ্যামকান্তি একটি বালক আগাইয়া আসিয়া কহিল,—তাহার নাম কাহ্নাইয়া, আর পার্শ্বে দণ্ডায়মান সঙ্গীর নাম বলদেও।

বাবাজীকে আর কোন কিছু বলিবার অবসর না দিয়া বালকের দল কলরব করিয়া উঠিল, "বাবাজী, আগে জল দিয়ে আমাদের প্রাণ তো বাঁচাও, তারপর অন্য কথা?"

সিদ্ধবাবা করঙ্গ আনিয়া শীতল জল ঢালিয়া দিলেন, করপুটে তাহা পান করিয়া গোপ নন্দনেরা শান্ত হইল।

যাইবার সময় তাহারা সহাস্যে বলিয়া গেল "দ্যাখো, বাবাজী, তুমি তো ঘরের ভেতর মালা টপ্‌কাও আর দু'চোখ বুজে বসে থাকো। এদিকে আমাদের হয় বিপদ। রোজ আমরা ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে এখান থেকে চলে যাই। কাল থেকে কিছু শীতল জল আর বালভোগ আমাদের জন্য রেখে দিতে যেন ভুলো না।"

গোপবালকেরা নাচিতে নাচিতে বনমধ্যে তখনি অন্তর্হিত হইয়া গেল।

জয়কৃষ্ণদাসজী প্রসন্নমনে আবার ভজন কুটিরে প্রবেশ করিলেন। হঠাৎ তাঁহার হুঁস হইল।:এ বালকের দল তো বড় বিচিত্র! কি অপরূপ সুঠাম ইহাদের চেহারা, কি গতিচ্ছন্দ, কি মধুময় বুলি। এরা যেন এ ধূলার ধরণীর নয়, কোন দিব্যলোকের অধিবাসী। তাইতো, এতক্ষণ তিনি যে অদ্ভুত বিস্মৃতির মধ্যে ছিলেন। ইহারা সত্য সত্যই কি গোপবালক— না আর কেউ? তবে কি সাধনার ধন আপনি যাচিয়া কাছে আসিয়া আবার লুকাইয়া পড়িল?

ত্রস্তপদে তখনি ছুটিয়া গৃহের বাহির হইলেন। অঙ্গনে আসিয়া দেখিলেন,—বালকেরা আর নাই। আশ্চর্য্য! মুহূর্ত্ত মধ্যে দুষ্ট বালকদের এমনি একটা বড় দল কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল? ধ্যানস্থ হইয়া উপলব্ধি করিলেন, কৃপাময় কৃষ্ণ বলরাম আজ এই ছলনার মধ্য দিয়া তাঁহাকে চকিতে দর্শন দিয়া গেলেন। হায় হায়—কেন তিনি তাঁহার ইষ্টকে চিনিতে পারিলেন না! দুই চোখ বাহিয়া নামিয়া আসিল অশ্রুর প্লাবন। পরম দৈন্য ও আর্ত্তিতে ভূমিতলে পড়িয়া তিনি গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন।

অকস্মাৎ কাণে আসিল দৈববাণী। সিদ্ধবাবাজী দুই চোখ মুছিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন। শুনিলেন, নটবরবেশ মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁহাকে ডাকিয়া কহিতেছেন, "জয়কৃষ্ণ, তুমি মনে খেদ রেখোনা। ধৈর্য্য ধর। আগামী কালই আমি উপস্থিত হবো তোমার কুটির দ্বারে— দীর্ঘদিন নেবো তোমার স্বহস্তের সেবাপূজা।"

পরদিন প্রাতঃকালে ভজনকুটিরের দ্বারে এক ব্রজমায়ী আসিয়া উপস্থিত। হস্তে তাঁহার পরম মনোহর এক শ্রীগোপালমূর্ত্তি। তিনি কহিলেন, "বাবাজী এই বিগ্রহ আমি তোমাকেই দিতে এসেছি। আমি প্রাচীনা, অশক্ত হয়ে পড়েছি। প্রভুর সেবা পরিচর্য্যা আমার দ্বারা আর চলে না; এবার থেকে তুমিই এঁর সব ভার নাও।"

মহাজাগ্রত, দিব্যমধুর শ্রীবিগ্রহ! বাবাজী শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, "মায়ী, প্রভুর উপযুক্ত সেবা করবো, সে সামর্থ্য আমার কই?

গোপালের দধি দুগ্ধ ছানা রোজ চাই, এ কাঙালের কুটিরে তা কোথায় মিলবে ?

উত্তর হইল, "ওগো, সেজন্য তোমার চিন্তা কি ? সেবার দ্রব্য তো জুটিয়ে দেব আমি।"

আনন্দবিহ্বল জয়কৃষ্ণ শ্রীবিগ্রহকে কুটিরের অভ্যন্তরে নিয়া গেলেন। সেই রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন, বিগ্রহ হস্তে যে বৃদ্ধামায়ী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, তিনি আর কেহ নয়—স্বয়ং বৃন্দাজী।

তারপর দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে সিদ্ধবাবাজীর মরলীলা সমাপনের লগ্নটির আর বেশী দেরী নাই। এবার নিত্যলীলায় প্রবেশের পালা। সেদিন ছিল চৈত্র মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথি। বসন্তের শ্রী ও আনন্দের হাতছানি প্রেমসিদ্ধ মহাসাধকের হৃদয় সাগর উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছে। রাগানুগা ভজনের সিদ্ধ সাধক তাঁহার পরমপ্রাপ্তির আনন্দে হইয়াছেন দিশাহারা।

ভক্তমণ্ডলী ও সমর্থ বৈষ্ণব সাধকগণ চারিদিকে দণ্ডায়মান। বাবাজী মহারাজের সারা দেহ অলৌকিক আনন্দের আবেশে থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। অষ্ট সাত্ত্বিক বিকারের চিহ্নসমূহ প্রকাশিত হইতেছে বারবার। দর্শন করিয়া সবাই বিস্ময়ে আনন্দে হতবাক্। ব্যাকুল কণ্ঠে বাবাজী মাঝে মাঝে প্রশ্ন করিতেছেন, "ওগো আমার ঘাঘ্‌রী কোথায়, ওড়না কোথায়, কোথায় আমার কাঁচুলি ?"

চতুষ্পার্শ্বস্থিত ভক্তজনের নয়ন অশ্রুসজল হইয়া উঠে। কাহারও বুঝিতে বাকী নাই, রাগানুগা ভজনের সার্থক সাধক, ব্রজমণ্ডলের দুর্লভ-পুরুষ আজ খুঁজিয়া পাইয়াছেন তাঁহার দিব্য পরিণতি। প্রিয় মিলনের পরম লগ্ন সমুপস্থিত। অভিসার-প্রস্তুতির কথা কহিতে কহিতে, প্রেমাশ্রুর ঢল বহাইয়া সিদ্ধ বাবাজী তাঁহার পরম অভিসারের পথেই সেদিন চিরতরে চলিয়া গেলেন।

হরিহর-বাবা

শীর্ণদেহ, উলঙ্গ পাগল কাশীর পথে ঘাটে আপন মনে ঘুরিয়া বেড়ায়। দুষ্ট ছেলের দল প্রায়ই তাহাকে ঘিরিয়া ধরে, কখনো টিটকারী দেয়, কখনো বা করে নানা লাঞ্ছনা।

সে দিন রাজঘাট অঞ্চলে, এক প্রশস্ত গলির মোড়ে তাঁহাকে নিয়া ছেলেদের ভীড় জমিয়া যায়। কেহ ঠাট্টা বিদ্রূপ করে, কেহবা গায়ে নিক্ষেপ করে ঢিল। পাগলের কিন্তু কোনই ভ্রুক্ষেপ নাই। এক একটি ঢিল গায়ে আসিয়া পড়ে, আর সোল্লাসে বলিয়া উঠে—জয় রাম, জয় রাম, জয় সীতারাম।

অদূরস্থিত একটি গৃহে ঠিক এ সময়ে ধর্ম্মসভা অনুষ্ঠিত হইতেছিল। কাশীর প্রখ্যাত আচার্য্য, সাধকপ্রবর শিবরামকিঙ্কর সেখানে তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। হঠাৎ বাতায়ন পথে বাহিরে তাকাইলেন, রাস্তায় ঐ উন্মাদের দিকে তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল। আচার্য্য চমকিয়া উঠিলেন। এ কি! ইনি তো সাধারণ মানুষ নন! সিদ্ধকাম, যোগ-বিভূতি সম্পন্ন মহাপুরুষের সমস্ত লক্ষণ ইঁহার দেহে বর্ত্তমান, অপরূপ অলৌকিক আলোকচ্ছটায় সারা মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত। চপলমতি বালকেরা এ কি কাণ্ড করিতেছে? এ যে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি নিয়া খেলা করার মতই মূঢ়তা!

ধর্ম্ম ব্যাখ্যা থামাইয়া আচার্য্য ত্রস্তপদে রাস্তায় নামিয়া আসিলেন। ভক্তমণ্ডলী কৌতূহলী হইয়া তাঁহাকে অনুসরণ করিল।

বালকদের প্রতিনিবৃত্ত করিয়া আচার্য্য শিবরামকিঙ্কর পরম শ্রদ্ধাভরে

ঐ উন্মাদকে প্রণাম করিলেন। তারপর সঙ্গীয় শিষ্য ভক্তদের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "তোমরা সবাই এঁকে চিনে রাখো। উন্মাদের ছদ্মবেশে থাক্‌লেও ইনি এক শক্তিধর মহাত্মা। মানব-হিতের জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন। অচিরে কাশীর সাধক সমাজে এঁর তপঃসিদ্ধির আলোক আচরে ছড়িয়ে পড়বে। তোমরা সদাই লক্ষ্য রাখবে, কেউ যেন এঁকে বিব্রত না ক'রে, এঁর কোন ক্ষতি সাধন না ক'রে।"

সেদিনকার এই উন্মাদই কাশীধামের বহুখ্যাত সাধক হরিহর বাবা। এই মহাত্মার অধ্যাত্মসাধনার অমৃতধারা প্রায় অর্দ্ধ-শতাব্দীকাল ব্যাপিয়া জনসমাজের উপর বর্ষিত হয়, রামনাম-সাধনার মূর্ত্ত বিগ্রহরূপে সারা উত্তর ভারতে তিনি কীর্ত্তিত হইয়া উঠেন।

বিহারের ছাপরা জেলায় জাফরপুর নামে এক গ্রাম আছে, আনুমানিক ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে হরিহর বাবা সেখানে ভূমিষ্ঠ হন। তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের নাম—সেনাপতি। পিতা ছিলেন সরযূপারীয় তেওয়ারী ব্রাহ্মণ। স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত তাঁহাদের পরিবার, গৃহে অর্থের অভাব অনটন কখনো তেমন কিছু দেখা যায় নাই।

কিন্তু হঠাৎ একদিন এই সুখের সংসারে দৈবের নির্ম্মম আঘাত নামিয়া আসে। নিতান্ত অল্প বয়সেই সেনাপতি তাঁহার পিতা মাতা উভয়কে হারান। আশ্রয় নাই, অভিভাবক নাই, এই দুঃসময়ে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের দ্বারা তাঁহারা কয়টি ভাই প্রতিপালিত হইতে থাকেন।

যৌবনে পা দিতে না দিতেই সেনাপতির পরিবারে আবার নামিয়া আসে শোকের করুণ ছায়া। এক অনুজ ভ্রাতা সকলকে শোকসাগরে ভাসাইয়া অকালে লোকান্তরে চলিয়া যায়। সেদিনকার শোকের নির্ম্মম আঘাত সেনাপতির হৃদয়ে শেলের মত বিদ্ধ হয়। তরুণ হৃদয়ে জাগিয়া উঠে নির্ব্বেদ ও বৈরাগ্যের জ্বালা। মন তাঁহার সংসার ছাড়িয়া অন্য কোথাও উধাও হইতে চায়।

ছোটবেলা হইতেই এক সাত্ত্বিক সংস্কার নিয়া তিনি জন্মিয়াছেন। এতকাল মন্দিরে মন্দিরে বিগ্রহ দর্শন করিয়া বেড়ানো ছিল তাঁহার এক

বড় কাজ। যে কোন স্থানে ধর্ম্মসভা দেখিলেই উৎসাহের সীমা থাকিত না। মগ্‌নীরাম নামে এক তপস্যাপরায়ণ ব্রহ্মচারীর বাস ছিল জাফরপুর গ্রামে। সেনাপতি তাঁহার প্রতি বড় আকৃষ্ট ছিলেন, সময় পাইলেই তাঁহার পদপ্রান্তে আসিয়া চুপ করিয়া তিনি বসিয়া থাকিতেন। এই সাধকের পুণ্যময় স্পর্শ মুমুষু তরুণের জীবনে এ সময়ে দূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

সংসারের নানা দুঃখ তাপে তাঁহার জন্মগত সংস্কার ক্রমে উদ্দীপিত হইয়া উঠিতে থাকে। ধীরে ধীরে অন্তরের গভীরে জাগিয়া উঠে তীব্র আলোড়ন। সন্ন্যাসজীবন গ্রহণের জন্য, ঈশ্বর দর্শনের জন্য, তিনি বড় ব্যাকুল হইয়া পড়েন।

অচিরে সেনাপতি স্থির করিয়া ফেলেন জীবনের মূখ্য উদ্দেশ্য। যে-ভাবে হোক্ ভগবৎ দর্শন তাঁহাকে করিতেই হইবে। এজন্য চরম আত্মত্যাগের জন্য সর্ব্বতোভাবে তিনি প্রস্তুত। কিন্তু অধ্যাত্মজীবনের পথসন্ধান তো তাঁহার জানা নাই। এজন্য প্রয়োজন যে অনেক কিছুর। প্রথমেই চাই গুরুকরণ। তাই এখন হইতে দিনের পর দিন তিনি খুঁজিতে থাকেন এমনি এক সমর্থ সাধককে যিনি গুরুরূপে তাঁহার জীবনতরীটি ওপারে পৌঁছাইয়া দিতে সমর্থ।

গোধূলির গৈরিক আলো সেদিন আকাশে আর মাঠে ঘাটে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, গ্রামের প্রান্তে এক বৃক্ষতলে সেনাপতি একাকী আপন মনে বসিয়া আছেন। হঠাৎ দৃষ্টি পড়িল এক পথচারী সন্ন্যাসীর উপর। পরণে কৌপীন, শিরে জটার ভার, পরিব্রাজক সাধক পরমানন্দে অদূরস্থিত বনপথ দিয়া আগাইয়া চলিয়াছেন।

কি জানি কেন সেনাপতি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া তাঁহার কাছে ছুটিয়া গেলেন। ভক্তিভরে প্রণাম নিবেদনের পর কহিলেন, "বাবা, আমি বড় দুর্ভাগা। এই ভবসাগরে কূলের কোন সন্ধান পাচ্ছিনে, দিশাহারা হয়ে কেবলই এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছি। আপনার দর্শনমাত্রই আমার মনে হচ্ছে, আপনারই মত কৌপীন সম্বল করে পথে বেরিয়ে

পড়ি। কৃপা ক'রে যদি অনুমতি দেন তো আজ এক্ষুণি, এখান থেকেই করি আপনার অনুসরণ।

"সে কি বেটা, হঠাৎ তুমি এভাবে আমার সঙ্গে কোথায় চলে যেতে চাও? তাছাড়া, এই তরুণ বয়সে, খেয়ালের ঝোঁকে চিরতরে গৃহত্যাগ করাটা কি ভালো হবে?"

"বাবা, মনের দিক দিয়ে ঘর আমি ছেড়েছি অনেক দিন। এবার চাই সত্যকার আশ্রয়। আপনি দয়া ক'রে আমায় তা দিন।

"শোন বেটা, আমি কখনো কাউকে শিষ্য করিনে। এপথে আমি যাচ্ছি শোনপুরে, হরিহর ছত্রের মেলায়। জানো বোধ হয়, সেখানে বহু সমর্থ সাধক এসে হাজির হন। কোন কোন ভাগ্যবান তাঁদের কৃপা লাভ ক'রে ধন্য হয়। বেটা, তুমি যদি একান্তই গৃহত্যাগ কবতে ইচ্ছুক হয়ে থাকো, ছত্রের মেলায় এসো, সেখানে হয়তো ভাগ্যবলে কারুর কৃপা মিলে যেতেও পারে।"

সেইক্ষণেই এক বস্ত্রে সেনাপতি ঐ সন্ন্যাসীর সঙ্গী হন। আত্মপরিজন কাহাকেও কিছু না জানাইয়া চিরতরে করেন সংসার ত্যাগ। তখন তাঁহার বয়স মাত্র আঠারো বৎসর।

মেলাক্ষেত্রে পোঁছিয়া হরিহর নাথের মন্দিরের নিকটে মুমুক্ষু তরুণ এক মহাপুরুষের সান্নিধ্য লাভ করেন। এই মহাত্মার নিকট হইতে রামমন্ত্রে তিনি দীক্ষা নেন, যোগ ও তন্ত্রের নানা গূঢ় সাধন উপদেশও এ সময়ে প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হন।

অল্প কিছুদিনের মধ্যে ছত্রের মেলা ভাঙ্গিয়া গেল। মহাত্মা এবার তাঁহার তরুণ শিষ্যকে ডাকিয়া কহিলেন, "বেটা, তুমি অগৌণে অযোধ্যায় চলে যাও। সেখানে সরযূর তীরে বসে, একনিষ্ঠ হয়ে, শুরু ক'র নির্দ্দিষ্ট সাধন ভজন। আর একটা কথা সদাই স্মরণ রেখো, ভাগ্যবলে যে মানব দেহ পেয়েছো, তা হচ্ছে প্রভু হরিহরের পীঠস্থান। সাধন বলে এই পীঠকে জাগ্রত করে তুলতে হবে, তারপর হরিহরময় হয়ে গিয়ে তোমায় লাভ করতে হবে পরমাত্মাকে।"

মহাত্মার এই উপদেশটি সেনাপতি এক দিনের তরেও বিস্মৃত হন নাই। পরম নিষ্ঠা, বৈরাগ্য ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়া নিজের অধ্যাত্ম-জীবনকে দিনের পর দিন তিনি সমৃদ্ধতর করিতে থাকেন'। আপন ব্যক্তি-সত্তা ভুলিয়া গিয়া সবাইকে নিজের পরিচয় জ্ঞাপন করিতে থাকেন 'হরিহর'-ভাইয়া নামে।

অযোধ্যায় পৌঁছিয়া হরিহর ভাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া যান। এই সেই পুণ্যভূমি যেখানে পরমপুরুষ রঘুনাথজী আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার পাদস্পর্শে এখানকার প্রতিটি ধূলিকণা পবিত্র, লীলাস্থানসমূহ তাঁহার স্মৃতিতে ভরপুর। পরম উৎসাহে দর্শনীয় স্থানগুলি তিনি দেখিয়া বেড়ান। দিনরাত করেন প্রভুজীর স্মরণ, মনন, অনুধ্যান।

কিছুদিন পরে সরযূর তীরে কঠোর তপস্যা শুরু হয়। শীত গ্রীষ্মের বোধ নাই, আহার নিদ্রা নাই, তরুণ সাধক একমনে সাধন ভজন করিয়া চলিয়াছেন। এই সময়ে তাঁহার কৃচ্ছ্রব্রত অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। সারা দিন রাত নদীতীরস্থ বৃক্ষতলে বসিয়া তিনি কাটাইয়া দিতেন আর দুই চারদিন পর এক মুষ্টি ছাতু গলাধঃকরণ করিয়া কোনক্রমে করিতেন জীবন রক্ষা।

জাফরপুর গ্রামের একদল লোক সেবার অযোধ্যায় তীর্থ করিতে আসিয়াছে। সরযূ নদীতে স্নান তর্পণ করার কালে ডোরকৌপীন-পরা কৃচ্ছ্রব্রতী তরুণ তাপসের দিকে তাহাদের দৃষ্টি পড়িল। চিনিতে দেরী হইল না, এ তাহাদেরই গ্রামবাসী সেনাপতি তেওয়ারী। কবে এক সাধুর সঙ্গে সে উধাও হইয়া গিয়াছে, এ যাবৎ আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

সকলে মিলিয়া হরিহর ভাইয়াকে টানাটানি শুরু করিয়া দিল। কহিল, "বাপু হে, ঢের হয়েছে এবার গ্রামে ফিরে চল। সাধু হবার মত বয়স তোমার তো এখনো হয়নি। শুধু শুধু কেন এভাবে নিজের জীবনকে ব্যর্থ করবে, বলতো? গৃহস্থীতে থেকে কি ধর্ম্মকর্ম্ম হয় না? রাজ্যশুদ্ধ লোক তো তাই করে যাচ্ছে।"

দৃঢ়স্বরে হরিহর ভাইয়া উত্তর দিলেন, "আপনারা আমার শুভানুধ্যায়ী, আপনাদের দিক থেকে ঠিক কথাই হয়তো আপনারা বলেছেন। কিন্তু আমার পক্ষে ঘরে ফেরা একেবারেই সম্ভব নয়।"

"কেন সম্ভব নয়, খুলে বল।"

"শুনুন তবে। আমার এই আঠারো বৎসর বয়সেই সংসারের অসারত্ব আমি উপলব্ধি করেছি। মা, বাবা আর ছোট ভাই-এর মৃত্যুর ভেতর দিয়ে দেখেছি—মানুষ কত অসহায়, আর কত ভঙ্গুর তার জীবন। তাইতো ঘর ছেড়ে পালিয়ে এসেছি। অযোধ্যার পুণ্যভূমিতে এই সরযূ-তীরে আমি আমার ইষ্টদেব রামজীর সাধনায় ব্রতী। হয় তাঁকে লাভ করবো, নয়তো করবো এই দেহপাত। জেনে রাখবেন, প্রাণ থাকতে আমি আমার এ পথ ত্যাগ করবো না।"

অগত্যা গ্রামের লোকদের প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয়। বিষণ্ণ বদনে তাহারা বিদায় গ্রহণ করে।

কিছুদিন পরে হরিহর ভাইয়ার কৃচ্ছ্র ব্রত ও সাধনার ফল কিছুটা ফলিল। দৈবযোগে প্রাপ্ত হইলেন চিহ্নিত গুরুর সন্ধান।

সেদিন অতি প্রত্যূষে অযোধ্যা পরিক্রমা শেষ করিয়া তরুণ সাধক লছমন্ গড়হির দিকে আসিতেছেন, হঠাৎ নদীতীর হইতে ভাসিয়া আসে মনোহর ভজন সঙ্গীত। মন্ত্রমুগ্ধবৎ সেই সঙ্গীতধ্বনি লক্ষ্য করিয়া তিনি ছুটিয়া যান। দেখেন—উচ্চতটের নিম্নভাগে, লোকচক্ষুর অন্তরালে, অবস্থিত এক মৃত্তিকা গোফা। জটাজুট সমন্বিত এক প্রাচীন বৈষ্ণব সেখানে বসিয়া আপন মনে ভজন করিতেছেন।

হরিহর ভাইয়া সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র মহাত্মা ভজন থামাইলেন। তারপর যে কথা কয়টি কহিলেন, তাহাতে নবীন সাধকের বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

তিনি কহিলেন, "বেটা, তুমি এসে গিয়েছো। বেশ বেশ। তোমার জন্যই যে এতদিন আমি এখানে প্রতীক্ষা করছি। তোমার প্রার্থিত ধন এবার মিলবে। পরম প্রভু রামচন্দ্রজীর আদেশে আমি তোমায় দীক্ষামন্ত্র

দান করবো। শুভলগ্নের আর দেরী নেই। এখনি তুমি সরযূর পুণ্য সলিলে স্নান ক'রে এসো।"

দীক্ষার অনুষ্ঠান শেষ হইয়া গেল। এবার হরিহর ভাইয়ার সাধন জীবনে আসিল নূতন জোয়ার। সারা দেহ মন প্রাণ তিনি গুরুনির্দ্দিষ্ট সাধনায় উৎসর্গীত করিয়া দিলেন।

হরিহর ভাইয়ার গুরুজীর নাম জানা যায় না, এ নাম তিনি চিরদিন গোপন করিয়া গিয়াছেন। অন্তরঙ্গ মহলে মাঝে মাঝে শুধু কহিতেন, "আমার গুরুদেব ছিলেন মহাশক্তিধর। যোগ, তন্ত্র ও বৈষ্ণবীয় সাধন-পন্থা সব কিছুতেই ছিল তাঁহার অবাধ সঞ্চরণ।"

ভজন সাধনের কতকগুলি উচ্চতর পদ্ধতি হরিহর ভাইয়াকে আয়ত্ত করাইয়া গুরুজী একদিন কহিলেন, "বেটা, আমার প্রাথমিক কাজ শেষ হয়েছে, এবার বিদায়ের পালা। তুমি আমার এই গোফার অভ্যন্তরে বসেই ভজন সাধন কর। ইষ্টদেব রামচন্দ্রজীর কৃপা অচিরেই মিলবে। তারপর সরযূতীর ত্যাগ ক'রে বেরিয়ে পড়বে পরিব্রাজনে। পরিব্রাজন শেষে স্থায়ীভাবে বাস ক'রো বারাণসীতে। সেইখানেই মিলবে তোমার সাধনার চরম সাফল্য।"

সাশ্রুনয়নে গুরুদেবকে বিদায় দিয়া হরিহর ভাইয়া ব্রতী হন তীব্রতর তপস্যায়। কয়েক বৎসরের মধ্যে এ তপস্যা ফলবতী হইয়া উঠে এবং ইষ্ট দর্শনের পরম সৌভাগ্য তিনি প্রাপ্ত হন।

অতঃপর প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের নির্দ্দেশ হরিহর ভাইয়াকে ঠেলিয়া দিল অধ্যাত্মজীবনের বৃহত্তর উপলব্ধির পথে। প্রভুজী কহিলেন, "বৎস, যে নামে তুমি পরিচিত হয়ে উঠেছ—সেই হরিহর নামকে জীবন্ত ক'রে তোল তোমার জীবনে। হরি ও হর একীভূত হয়ে মূর্ত্ত হয়ে উঠুক তোমার সাধনসত্তায়—অযোধ্যা ও বিশ্বেশ্বর-ধাম কাশীকে গ্রথিত ক'র এক সূত্রে। আশীর্ব্বাদ করি, সাধনা তোমার অচিরে পূর্ণাঙ্গ হোক, জয়যুক্ত হোক। তবে, তার আগে দেশের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব, শৈব ও তান্ত্রিক তীর্থ-গুলোর পরিব্রাজন শেষ করতে ভুলো না।"

সরযূতীরের গোফায় কয়েক বৎসর সাধন ভজন ক'রার পর হরিহর ভাইয়া সারা ভারত পরিব্রাজনে বহির্গত হন।

প্রথমে ইষ্টদেব রামচন্দ্রজীর লীলাস্থানগুলি দর্শনের ইচ্ছা তাঁহার প্রবল হইয়া উঠে। এই সময়ে চিত্রকূট, দণ্ডকারণ্য, নাসিক, রামেশ্বর প্রভৃতি স্থানে তিনি গমন করেন এবং এই সব পুণ্যভূমিতে বসিয়া গভীর তপস্থায় মগ্ন হন। অতঃপর দেশের দিকে দিকে ছড়ানো শৈব ও বৈষ্ণবীয় তীর্থসমূহে তিনি পরিব্রাজন করিয়া বেড়ান। সর্ব্বশেষে উপনীত হন কাশীধামে। এই মহাপুণ্যময় শিবভূমির প্রতিই বিশেষ করিয়া হরিহর-ভাইয়ার মনপ্রাণ একান্তভাবে আকৃষ্ট হয় এবং দীর্ঘ জীবনের অবশিষ্ট কাল এখানেই তিনি কাটাইয়া যান।

গোড়ার দিকে প্রধানতঃ কাশীর দক্ষিণস্থ বনাঞ্চলে তিনি অবস্থান করিতেন। তখনো বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় জন্ম লাভ ক'রে নাই, নাগোয়া ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ ছিল গভীর জঙ্গলে পরিবৃত। ঐ দুরধিগম্য অঞ্চলে হরিহর ভাইয়া একান্ত নিষ্ঠায় তাঁহার তপস্থার অনুষ্ঠান করিয়া চলিলেন।

এসময়কার সাধন জীবনে ত্যাগ তিতিক্ষা ছিল অসাধারণ। প্রচণ্ড শীতেও গায়ে এক টুকরা কাপড় থাকিত না। ক্ষুধা তৃষ্ণার বালাই নাই, তাই আহারের জন্য কখনো তাঁহাকে সময়ের অপব্যয় করিতে দেখা যায় নাই। কেদারঘাটে রাজারাম চৌবে নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। সৎ, সাধননিষ্ঠ ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। এই চৌবেজীর সাথে হরিহর ভাইয়ার কি করিয়া যোগাযোগ হয় এবং ইহার পর হইতে চৌবেজী মাঝে মাঝে নাগোয়ার জঙ্গলে ঢুকিয়া সাধককে খুঁজিয়া বাহির করিতেন। এ সময়ে গামছায় বাঁধিয়া যৎকিঞ্চিৎ ফলমূল তিনি নিয়া যাইতেন এবং তাহা দিয়াই কোনক্রমে হরিহর ভাইয়ার জীবনরক্ষা হইত।

ক্ষুন্নিবৃত্তির পরই দৃঢ়ব্রত সাধক আবার নিমজ্জিত হইয়া পড়িতেন আপন সাধনার গভীরে।

প্রায় সময়েই হরিহর ভাইয়ার জীবন কঠোরতর তপস্যার মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইত। মাসের পর মাস দেখা যাইত, তিনি বিবস্ত্র দেহে গঙ্গার চড়ার উপর দণ্ডায়মান। খরকরবর্ষী সূর্য্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিয়াছেন ধ্যানস্থ।

আচার্য্য বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী এবং বীতরাগ-বাবার সান্নিধ্য এই সময়ে হরিহর ভাইয়ার সাধন জীবনে এক নূতন জোয়ার আনিয়া দেয়। এই দুই মহাত্মার সংস্পর্শে আসিয়া একদিকে বেদ বেদান্ত অধ্যয়নের সুযোগ যেমন তিনি প্রাপ্ত হন, তেমনি লাভ করেন অধ্যাত্মসাধনার উচ্চতর নানা পদ্ধতির দিক্‌নির্দ্দেশ।[১]

হরিহর ভাইয়ার বিশেষ সঙ্কল্প ছিল—পবিত্র পঞ্চক্রোশী কাশীধামে, বিশ্বনাথের নিজ পুরীতে, তিনি কখনো মূত্র পুরীষাদি ত্যাগ করিবেন না। প্রতিদিন শেষ রাত্রে সন্তরণে গঙ্গার ওপারে চলিয়া যাইতেন, প্রাতঃ-কৃত্যাদি সেখানে সারিয়া আবার করিতেন প্রত্যাবর্ত্তন। বর্ষার ঝড় জল, স্রোতাবর্ত্ত বা উত্তাল তরঙ্গ কোন কিছুতেই তাঁহার এই বিশেষ দিনচর্য্যাটি কোন দিন ব্যাহত হয় নাই।

পুণ্যতোয়া গঙ্গা ছিল তাঁহার পরম প্রিয়। স্বেচ্ছাবিহারী সাধক মাঝে মাঝে বেগবতী গঙ্গামায়ীর বক্ষে ঝাঁপ দিতেন, কখনো বা পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া পরমানন্দে ভাসিয়া চলিতেন।

পরবর্ত্তীকালে হরিহর ভাইয়া তুলসীঘাটে অবস্থান করিতে থাকেন। এখানে আসার পর হইতেই বৈরাগ্যের মূর্ত্ত বিগ্রহ কৃচ্ছ্রব্রতী এই

---

[১] কেহ কেহ মনে করেন, বীতরাগ বাবাই হরিহর বাবার গুরুদেব, কিন্তু তাহা যথার্থ নয়। মহাত্মা বীতরাগ বাবা কয়েক বৎসর আগেও স্বদেহে অবস্থিত ছিলেন। কাশীর পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে, বনপুরওয়াতে সেইদিনও ১২৫ বৎসর বয়স্ক নগ্নদেহ এই মহাত্মা এক জনবিরল বাগিচায় বাস করিতেন। ১৯৬০ সালে বীতরাগজী লেখককে নিজমুখে বলিয়াছেন, "হরিহর বাবাকো মন্ত্র দীক্ষা নেহি দিয়া। লেকিন ইয়ে বাৎ ঠিক হ্যায়, উহ হমারা কুঠিয়ামে কুছ সাল ঠ্যরতে থে।"

মহাসাধকের নিভৃত জীবনের গতিধারা কিছুটা পরিবর্ত্তিত হয়। এখন হইতে ভক্ত ও মুমুক্ষু নরনারী মাঝে মাঝে তাঁহার সান্নিধ্যে আসিতে থাকে। ভক্তেরা তাঁহাকে শ্রদ্ধাপূর্ণ স্বরে ডাকিতে শুরু করে হরিহর-বাবা নামে। এই ভাবে হরিহর-ভাইয়ার উত্তরণ ঘটে হরিহর-বাবায়।

একান্তচারী সাধক এবার জনজীবনের সমক্ষে আসিয়া দাঁড়ান পরম মঙ্গলকামী আচার্য্যরূপে। এই আচার্য্য জীবন কিন্তু কোনদিনই হরিহর-বাবার কাছে তেমন প্রীতিপ্রদ হইয়া উঠে নাই। স্বল্পসংখ্যক ভক্ত শিষ্য ও দর্শনার্থীর বাহিরে আপন মহিমা ও মাহাত্ম্যকে কোনদিনই তিনি সহজে বিস্তারিত হইতে দেন নাই।

নগ্ন সন্ন্যাসী হরিহর বাবা এ সময়ে এক একদিন কাশীর জন-জীবনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়া বসিতেন। মহাত্মা ত্রৈলঙ্গস্বামীর উলঙ্গত্ব নিয়া ইতিপূর্ব্বে মাঝে মাঝে যেমনতর সমস্যার উদ্ভব ঘটিত, হরিহর বাবাকে নিয়াও দেখা দিত তেমনি নানা আলোড়ন। রাজঘাটের কাছে আচার্য্য শিবরাম কিঙ্করের ধর্ম্মসভার নিকটে সেদিনকার ঘটনাটি কেন্দ্র করিয়া এমনিতর এক আলোড়নই দেখা গিয়াছিল।

মাঝে মাঝে কৌতূহলী পথচারীরা এই দিগম্বর সন্ন্যাসীকে ঘিরিয়া দাঁড়াইত, বর্ষণ করিত প্রশ্নবাণ।

তাহারা বলিত, "সাধু, কোথায় তোমার আস্তানা? আমাদের আজ তা ঠিক ক'রে বলতে হবে।"

উত্তর হইত, "হরিহর ভাইয়া যেখানে যেদিন থাকেন।"

"আচ্ছা, তোমার প্রকৃত সাধন পথ কি, একটু খুলে বল।"

"রাম নাম।"

"কি তোমার পরিচয়?"

"পতিতপাবন রামচন্দ্রজীর চরণ কমলের দাস আমি। তাছাড়া, আর কিছু পরিচয় আমার তো নেই।"

"হরিহর ভাইয়া, আমাদের সংসার জ্বালা ও শোক-তাপময় জীবনের কিছু ঔষধ বাৎলে দাও।"

"রামজীই শক্তি, রামজীই বন্ধু, রামজীই বৈদ্য। ব্যাকুল হয়ে নিষ্ঠাভরে জপে যাও শুধু রাম-নাম।"

বহুজন-মান্য এই উচ্চকোটির সন্ন্যাসী একেবারে উলঙ্গ থাকেন, কোন কোন ভক্তের তাহা তেমন ভাল লাগিত না। দিগম্বরত্ব ঘুচানোর জন্য তাঁহারা মাঝে মাঝে ব্যগ্র হইয়া পড়িতেন।

জোর করিয়া কাপড় পরাইয়া দেওয়া হইত, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই আবার ঐ দিগম্বর অবস্থা। 'কাপড় কোথায় গেল ?' —প্রশ্ন করিলে উত্তর—'যিনি দিয়েছিলেন তিনিই খুলে নিয়েছেন'।

"সেবার একজন একখানি মুল্যবান বস্ত্রে দৃঢ়ভাবে গ্রন্থি দিয়ে তাঁকে সভ্য ভব্য সাজিয়ে নিজেকে কৃতার্থ মনে করেন। কিন্তু আশ্চর্য্য হয়ে অল্পক্ষণ পরেই দেখেন—দিগম্বর অবস্থায় তিনি কোথা থেকে ফিরে আসছেন। বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে ভক্তটি জবাব-দিহির জন্য অপেক্ষা করছেন। কিন্তু ঐ লোকটির কাছে আসা মাত্রই শিশুর মত সরল হাস্যে বাবা বললেন, "দ্যাখো, আজ আমি আমার যথাসর্ব্বস্ব দান করেছি।"

"আপনার আবার যথাসর্ব্বস্ব কি ?"

"তিনি বললেন, 'মনিকর্ণিকায় স্নান করে দেখি, একজন বস্ত্রহীন হয়ে শীতে কষ্ট পাচ্ছে, আর আমার দিকে তাকিয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে আমার যথাসর্ব্বস্ব, তোমার দেওয়া ঐ ভালো কাপড়টি তাকে দিয়ে দিলাম।'

"ঐ লোকটি হাসবে না কাঁদবে ঠিক করতে পারলো না।"[১]

হরিহর বাবার শরীরে শীত বা গ্রীষ্মের কোনই বোধ ছিল না। খেয়াল খুসীমত মাঘের তীব্র শীতে, উলঙ্গ অবস্থায়, গঙ্গার উন্মুক্ত ঘাটে প্রহরের পর প্রহর তিনি অতিবাহিত করিতেন। এ দৃশ্য দেখিয়া সেবার একটি ধনী ভক্তের হৃদয় বড় ব্যথিত হয়। তখনি ছুটিয়া গিয়া চক

[১]বারাণসীর হরিহরবাবা আশ্রম হইতে প্রাপ্ত বিশ্বনাথ-বাবার জীবনী-পাণ্ডুলিপি হইতে উদ্ধৃত।

হইতে তাড়াতাড়ি একটি দামী কম্বল তিনি কিনিয়া আনেন। সযত্নে উহা দ্বারা বাবার দেহ ঢাকিয়া দেন।

পূর্ব্ব অভ্যাস মত রোজই শেষ রাত্রে হরিহর বাবা গঙ্গায় ঝাঁপ দিতেন এবং দীর্ঘ সময় জলে ভাসিয়া বেড়াইতেন। ভক্তের দেওয়া ঐ মূল্যবান কম্বলটি তখন ঘাটেই গড়াগড়ি যাইত। স্নান-সন্তরণের শেষে বাবা তাঁহার খেয়াল খুশীমত অপর ঘাটে গিয়া উঠিতেন, পূর্ব্ববৎ থাকিতেন বিবস্ত্র।

ভক্তটি একদিন কহিলেন "বাবা, আপনি স্নান-তর্পণ করতে গঙ্গায় নামবার আগে দামী নতুন কম্বলটা কারুর জিম্মায় রেখে যান না কেন, তা হলে ওটা আর হারাবার ভয় থাকে না।"

বৈরাগ্যবান সন্ন্যাসী চটপট উত্তর দিলেন, "আমার এত হিসাব, এত সতর্কতায় কি প্রয়োজন? যদি প্রয়োজন মনে ক'র, তোমার ঐ দামী কম্বল, ঠিক সময়ে এসে তুমি নিজেই তুলে রেখে যেয়ো। রামই আমার কম্বলের ব্যবস্থা করেছেন, দরকার হলে রাম নিজেই তা কোথাও তুলে রাখবেন। আমার তা শুধু শুধু নিয়ে মাথা ব্যথা হবে কেন, বলতো?"

সেবার কাশীতে শুরু হইয়াছে দারুণ গ্রীষ্মের তাণ্ডব। জ্যৈষ্ঠের তীব্র দহনে পথে ঘাটে কাহারো টি঑কিবার উপায় নাই—অনেক পথচারী লু'র উত্তাপে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছে। এমন সময়ে দেখা গেল, উলঙ্গ অবস্থায় গঙ্গার ঘাটে এক পাথরের উপর মহাত্মা হরিহর বাবা ধ্যানস্থ হইয়া আছেন। বাবার ভক্ত বিজয়ানন্দ ত্রিপাঠী এ সময়ে তাঁর খোঁজ করিতে আসিয়াছিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার বিস্ময় ও আতঙ্কের সীমা রহিল না।

ত্রিপাঠীজী নিকটে গিয়া ব্যগ্রস্বরে প্রশ্ন করিলেন, "বাবা, এই অসহ্য গ্রীষ্মে, আগুনের মত গরম এই প্রস্তরখণ্ডে আপনি কি ক'রে বসে আছেন? আর শুধু শুধু এতো কষ্ট করাই বা কেন?"

সমাহিতচিত্ত হরিহর বাবা নয়ন উন্মীলন করিলেন। ত্রিপাঠীজী

আবার তাঁহার প্রশ্নটি আবৃত্তি করিতেই বাবার আনন কৌতুকোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সহাস্যে কহিলেন, "বেটা, তুমি তো বুঝতে পারছো না, এতে আমার কত সুবিধা। গ্রীষ্ম দিয়ে সহ্যশক্তি বাড়াতে পারলে শীতের দিনে আর কোন কষ্টই অনুভব করবো না।"

ত্রিপাঠীজীর এবার মনে পড়িল, কৃচ্ছ্রব্রতী সন্ন্যাসীরা এরকমই করেন বটে। সাধারণতঃ প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাস হইতেই তাঁহাদের তিতিক্ষাময় তপস্যা শুরু হয়।

সেদিন দ্বিপ্রহরে স্নান সমাপন করিয়া হরিহর বাবা গঙ্গার ঘাটে বসিয়া আছেন। এই উলঙ্গ সন্ন্যাসীকে অনেকেই ভালবাসে এবং শ্রদ্ধা করে। কেহ কেহ পাতার ঠোঙ্গায় করিয়া তাঁহাকে খাবার খাওয়াইয়াও যায়। একদল দুরন্ত বখাটে ছেলে অদূরে দাঁড়াইয়া তাঁহার এই ভোজন পর্ব্ব লক্ষ্য করিতেছিল। ঘাটটি জনবিরল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই কুচক্রী তরুণেরা আগাইয়া আসিল। হরিহর বাবা তখন অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায়। দুষ্টেরা ঠোঙ্গায় করিয়া কিছুটা কাকবিষ্ঠা আনিয়া তাঁহার মুখের সম্মুখে ধরিলে অম্লান বদনে তিনি তাহার সবটা খাইয়া ফেলিলেন। সেই দিনই রাত্রে দেখা গেল ঐ ছেলের দল মারাত্মক ভেদবমি ও কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছে।

এবার তাহাদের মনে জাগিল প্রবল আতঙ্ক। তবে কি গঙ্গার ঘাটের ঐ সাধুর প্রতি যে অসদাচরণ তাহারা করিয়াছে, সেজন্যই এই প্রাণান্তকর রোগের আক্রমণ ?

আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা শুনিয়া ছেলেদের অভিভাবকেরা তখনি আপনভোলা উলঙ্গ সন্ন্যাসীর কাছে ছুটিয়া আসিলেন। পদতলে পড়িয়া কহিলেন, "বাবা, অবোধ ছেলেরা আপনার মাহাত্ম্য কি বুঝবে? এবারকার মত আপনি ওদের ক্ষমা করুন।"

উত্তরে তিনি কহিলেন, "আমার কাছে তো ওরা কোন অন্যায় করেনি, করেছে প্রভু রামজীর কাছে। যে যা ভোজনের জন্য এগিয়ে

দেয়, এই দেহে থেকে রামজীই তা গ্রহণ করেন। তাই তোমরা ওদের জন্য তাঁরই কৃপা ভিক্ষা ক'র। রাম নাম কীর্ত্তন ক'র। প্রভু আমার পরম দয়ালু, নিশ্চয় অবোধ বাচ্চাদের নিরাময় করে তুলবেন।

মহাসাধকের নির্দ্দেশিত রাম নাম কীর্ত্তনের ফলে ঐ ছেলের দল সেইদিনই সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়।

হরিহর বাবার যোগ বিভূতি ও লোকোত্তর জীবনের খ্যাতি এই সময়ে ধীরে ধীরে প্রচারিত হইতে থাকে। বহু সংখ্যক ভক্ত ও মুমুক্ষু অতঃপর এই সর্ব্বত্যাগী, শক্তিধর সন্ন্যাসীর সান্নিধ্যে আসিয়া উপস্থিত হন, অধ্যাত্ম-জীবনের পথপ্রদর্শকরূপে ভক্তিভরে তাঁহাকে বরণ করেন।

হরিহর বাবার আচার্য্য জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য—অগণিত নরনারীকে রাম নামের উদ্দীপনা তিনি জোগাইয়াছেন, পরম পথের সন্ধান দিয়াছেন, কিন্তু কখনো কাহাকেও দীক্ষামন্ত্র দান করেন নাই। রাম নামের মহিমা প্রচারের মধ্য দিয়াই এক বৃহৎ ভক্তগোষ্ঠী তিনি তৈরী করিয়া গিয়াছেন, কাশীধামের অধ্যাত্মজীবনে সঞ্চারিত করিয়াছেন নূতন ভাবতরঙ্গ ও নূতন অনুপ্রেরণা।

হরিহর বাবার শরীর ক্রমে প্রাচীন ও অপটু হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া বিশিষ্ট ভক্তেরা উদ্বিগ্ন হইলেন। সকলে মিলিয়া স্থির করিলেন, আর তাঁহাকে শৌচের জন্য সন্তরণযোগে গঙ্গায় পারাপার করিতে দেওয়া হইবে না। এবার হইতে তাঁহার জন্য ব্যবস্থা করা হইল এক বৃহদাকার বজরা।

এখন হইতে বাবা আশ্রয় নিলেন ভক্তদের প্রদত্ত ঐ বজরার নূতন আশ্রমে। নাগোয়ায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্নিকটে এই বজরায় তিনি দিন যাপন করিতেন, সঙ্গে অবস্থান করিত কয়েকটি অন্তরঙ্গ ভক্ত ও সেবক। প্রত্যূষে উঠিয়া একবার করিয়া হরিহর বাবা নৌকাযোগে গঙ্গার ওপারে যাইতেন, নিজের প্রাত্যকৃত্যাদি সরিয়া আসিতেন।

---

* 'সন্মার্গ' হরিহরবাবা-অঙ্ক সংখ্যা, ১৭ই জুলাই, ১৯৪৯ খৃঃ।

এই বজরার আশ্রমটি ছিল পবিত্র রাম নামের এক উৎস স্থল। সারা দিনরাত ভজন, কীর্ত্তন ও রামধুন গানে এটি মুখরিত থাকিত। রামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠ ও ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যায় ও ভাষণে সেখানে প্রবাহিত হইত অধ্যাত্মরসের অপূর্ব্ব প্রবাহ।

হরিহর বাবার ভাসমান আশ্রম ঐ বজরাটি কেন্দ্র করিয়া সে দিন নাগোয়াতে আলোড়নের সৃষ্টি হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি চঞ্চলমতি ছাত্র হঠাৎ আসিয়া নৌকায় উপদ্রব শুরু করে, বাবার সেবক ভক্তদেক সাথে বচসা শুরু করিয়া দেয়, তারপর প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া কয়েকজনকে আহতও ক'রে।

হরিহর বাবা তো মহা ক্রুদ্ধ। আদেশ দিলেন, "আর এক মুহূর্ত্তও এখানে থাকা নয়। আরো উত্তরে, অসিঘাটে গিয়ে নোঙর কর।"

বাবার আদেশ প্রতিপালিত হইতে দেরী হইল না।

এ ঘটনার সংবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য মদনমোহন মালবীয়জীর কাণে গেল। ছাত্রদের অশোভন আচরণের কথা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন।

তখনি মালবীয়জী হরিহর বাবার বজরায় উপনীত হইলেন। সঙ্গে কয়েকজন অধ্যাপক ও কাশীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। প্রণাম নিবেদন করিয়া মালবীয়জী যুক্তকরে কহিলেন "ছেলেরা অবোধ। আপনার মাহাত্ম্য তারা জানবে কি করে? যে অপরাধ তারা করেছে সে জন্য আমরা আপনার চরণে ক্ষমা ভিক্ষা করছি। আপনি আবার কৃপা ক'রে নাগোয়ার ঘাটে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে, নৌকা ফিরিয়ে নিন।"

বাবা স্মিতহাস্যে কহিলেন, "দুরন্ত বালকদের রামজী আগেই ক্ষমা করেছেন—আমার মনে তা নিয়ে কোন চাঞ্চল্য নেই। কিন্তু আমার মনে প্রশ্ন উঠেছে, তরুণদের মতিগতি যদি এমনি নিম্নস্তরের হয় তবে তাদের জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা কেন? এত অর্থ সামর্থ্য ব্যয় ক'রে কোন্ ধরনের শিক্ষাই বা তাদের দেওয়া হচ্ছে?"

মালবীয়জী মহামনা, উন্নত আদর্শ ও চরিত্রের নেতা। তৎক্ষণাৎ

সবিনয়ে মহাত্মার কথা মানিয়া নিলেন। কহিলেন, "আমরা আমাদের সাধ্যমত শিক্ষার আয়োজন করেছি। যে ত্রুটির কথা বললেন, তা অবশ্যই সংশোধন করতে চেষ্টা করবো। ভগবৎ কৃপা ও আপনাদের আশীর্ব্বাদ থাকলে তা হবে। কিন্তু বাবা, আমাদের অনুরোধ রক্ষা করতেই হবে, আপনি বজ্‌রা আবার পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে চলুন।"

"তা হয় না বেটা, এখন থেকে আমি এই পবিত্র অসিঘাটেই থাকবো। "ছাখো, প্রভু রামচন্দ্রজীর কি অদ্ভুত কৌশল! ঐ শিবরূপী ছাত্রদের দিয়ে আমার নৌকাটিকে পঞ্চক্রোশী কাশীর সীমারেখার ভেতরে কেমন ঠেলে দিলেন।"

ইহার পর মালবীয়জী আরো কয়েকদিন বাবাকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে আসেন। তাঁহার মনে একান্ত ইচ্ছা জাগে, হরিহর বাবার সেবা যত্নের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা তিনি করিবেন। এজন্য একদিন পীড়াপীড়ি করিলে বাবা বলিলেন, "বেটা, প্রভুজীর দীনতম সেবকরূপে তাঁর চরণতলে আমি পড়ে আছি। আমার সেবার তো কোন প্রয়োজন নেই! তুমি যদি এজন্য সত্য সত্যই ব্যগ্র হয়ে থাকো তবে বরং এই তুলসী-ঘাটের সংস্কার সাধন ক'রে দাও। শ্রীরামচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ ভক্ত, তুলসীদাস-গোস্বামীজীর এই সাধনপূত স্থান আজ জীর্ণ দশায় পড়েছে, ছাখো। এর কিছু একটা বিহিত ক'র।"

বাবার এই নির্দ্দেশ পালিত হইতে দেরী হয় নাই। শেঠদের সাহায্যে মালবীয়জী তুলসীঘাট ও আশ্রমের সংস্কার করাইয়া দেন।

হরিহর বাবার খ্যাতি ধীরে ধীরে চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হয়। তাঁহার বজরাটি এখন হইতে পরিণত হয় এক পবিত্র পীঠস্থানরূপে। শুধু কাশী অঞ্চলের ভক্ত সাধকগণই নয়, দেশ দেশান্তর হইতে মুমুক্ষু ও আধ্যাত্মরস-পিপাসুরা এখানে এই শক্তিধর মহাত্মার কাছে জড়ো হইতে থাকেন।

হরিহর বাবা ছিলেন স্বল্পভাষী, তাছাড়া, প্রায়ই রামরসে বিভোর হইয়া অন্তর্ম্মুখীন থাকিতেন। কিন্তু দর্শনার্থী ভক্তের দল বিস্মিত হইয়া লক্ষ্য করিতেন, শুধু মহাত্মার ক্ষণিকের দর্শন ও স্পর্শনে মানুষের অন্তরে

ঘটিত অপরূপ রূপান্তর। শক্তিধর মহাপুরুষ মুহূর্ত্তের মধ্যে নূতন নূতন আধারে বপন করিতেন অধ্যাত্মসাধনার অমোঘ বীজ। কৃপাবলে উন্মোচিত হইত শত শত মানুষের লোকোত্তর জীবনের দ্বার।

হরিহর বাবার ভাসমান আশ্রমটি ছিল নিরাশ্রয়ের এক পরমাশ্রয়। রোগ-শোক-দুঃখ নিপীড়িত মানুষ যেমন এখানে দলে দলে হাজির হইত, তেমনি আসিত মুক্তিকামী সাধকের দল। এই সিদ্ধ মহাত্মার একটি কথায়, একটি গানের দোঁহায়, কেহ পাইত শান্তির প্রলেপ, কাহারো বা জীবনে জ্বলিয়া উঠিত মুমুক্ষার আগুন।

সাধারণ কাশীবাসী ভক্তদের জন্য তাঁহার উপদেশ ছিল বড় সহজ সরল। সদাই তাহাদের হৃদয়ে উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগাইয়া মহাত্মা কহিতেন, "তোমাদের আবার ভয় কি? তোমরা রয়েছ খাস শিব-পুরীতে —জ্যোতির্ম্ময় মহাধামে। এই মহাধামে বসে রাম নাম নিরন্তর জপে যাও, সংসার চক্রের আবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে এ নামকে কষে ধরে থাকো। সর্ব্ব অভাব ঘুচে গিয়ে জীবনে ফুটে উঠবে অমৃত জ্যোতি।"

ধ্যাননিমীলিত মহাত্মার মৃদু মধুর কণ্ঠে সঙ্গীয় ভক্তদের জন্য প্রায়ই উচ্চারিত হইত:

অসারে খলু সংসারে সারমেতৎ চতুষ্টয়ম্।
কাশ্যাং বাসঃ সতাং সঙ্গঃ গঙ্গাম্ভঃ শম্ভু পূজনম্।

ধনী নির্ধন সকলেরই ছিল অবারিত দ্বার হরিহর বাবার কাছে। সে-বার নেপালের মহারাণা কাশীতে আসিয়াছেন। লোকমুখে জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ হরিহর বাবার খ্যাতি শুনিয়া তাঁহার অসিঘাটের বজরায় উপস্থিত হইলেন। বাবাকে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, "বাবা, সারা জীবন রাজসিক মনোবৃত্তি নিয়ে তো কাটালাম। এবার ডাক পড়েছে ওপারের, ব্যাকুল হয়ে উঠেছি পারের কড়ির জন্য। ভক্তিধনের জন্য আমি কাঙাল। কিন্তু সংসারের জালে জড়িয়ে আছি, কি ভাবে তা লাভ ক'রা যায়? কৃপা ক'রে বলুন।"

"মহারাজ, রামনাম ছাড়া পরমবস্তু পাবার আর কোন সহজ পন্থা

আমার জানা নেই ! বাল্মিকী বল্মীকস্তুপের ভেতর থেকে এই নামসাধন দেখিয়ে গেছেন। আপনার সংসার-বল্মীকও সাধনপথে বাধা হবে না, আপনি এ নামরসে মত্ত হয়ে পড়ন।" —স্নেহপুর্ণ কণ্ঠে হরিহর বাবা বলিয়া উঠিলেন।

"কিন্তু বাবা, আমার যে মস্ত অসুবিধা রয়েছে রাম নাম গ্রহণে। পুরুষানুক্রমে আমরা শৈব, এবার শিব ছেড়ে রামকে কি করে ইষ্ট ব'লে ধ'রবো ? তাছাড়া, শিবোপাসনা ছেড়ে রাম নামে সহজে মতি আসবেই বা কি ক'রে ?"

"হরিহর ভাইয়ার কাছে শিব আর রামে কোন ভেদ নেই। জানেন তো, শিবস্য হৃদয়ং বিষ্ণুঃ, বিষ্ণুস্য হৃদয়ং শিবঃ। একই পরম সত্তা সর্ব্বত্র ওতপ্রোত রয়েছেন মঙ্গলময় শিবরূপে এবং মর্য্যাদা-পুরুষোত্তম শ্রীরাম-রূপে। এই সৃষ্টির সর্ব্বত্র সর্ব্ব বস্তুতে যিনি সদা রমণ করেন সেই রামসত্তা সবারই বুকে রসের ঢেউ দিয়ে যাচ্ছেন। একটু ব্যাকুল হলে, একটু ভক্তিপ্রেম দিয়ে ডাকলে সহজে তাঁর জবাব মিলে। আপনি এই সহজ পথ ধরেই এগিয়ে যান !"

বাবার বজরার সম্মুখে সেদিন কোন এক খ্যাতনামা শেঠের সুসজ্জিত পাল্‌কি আসিয়া থামিল, ভিতর হইতে বাহির হইলেন এক শীর্ণদেহ, রোগজর্জ্জর বর্ষীয়ান ব্যক্তি। সবাই ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে বাবার সম্মুখে নিয়া বসাইয়া দিল।

এক নজরে রোগীটির দিকে একবার চাহিয়া নিয়া হরিহরবাবা কহিলেন, "একে এত কষ্ট দিয়ে কেন এখানে টেনে এনেছো ? তোমরা তো জান, রাম নামের দাওয়াই ছাড়া আমার কাছে আর কিছু নেই। তাই একে জপ করতে বলো।"

রোগীর আত্মীয় স্বজনেরা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া জানাইলেন, "বাবা, সে দাওয়াই প্রয়োগ করতে আমরা ত্রুটি করিনি। রাম নাম কীর্ত্তন রোগীর সামনে অনেক করা হয়েছে, রোগী নিজেও নাম জপ করেছে। কিন্তু কোন ফল হয়নি। বাবা, আপনার কৃপাদৃষ্টি ছাড়া উপায় নেই।"

বাবার চোখ দুটি মুহূর্তে জ্বলিয়া উঠিল। বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ওরে কে আছিস্, একে আমার সমুখ থেকে সরিয়ে দে। যে রাম নাম অমোঘ—যে নাম আমার একমাত্র সম্বল, তাতেই নাকি এর দুঃখ যন্ত্রণার লাঘব কিছু হয়নি। তবে তো এর মত হতভাগ্য দুনিয়ায় আর কেউ নেই। আমার সাধ্য কি যে এর কোন উপকার করি? শিগ্‌গীর একে এখান থেকে বাইরে নিয়ে যা।"

শেঠের সঙ্গীরা হতাশ হইয়া তাহাকে ফিরাইয়া নিয়া যান। হৃদয়ে তাহাদের জ্বলিতে থাকে অনুশোচনার জ্বালা। রামনামসিদ্ধ মহাপুরুষের কাছে 'রাম নামে কাজ হয়নি' বলাটা যে আদৌ শোভন ও যুক্তিযুক্ত হয় নাই, একথা ভাবিয়া তাঁহাদের খেদের সীমা রহিল না।

খ্যাতনামা আচার্য্য, দেশনেতা ও রাজরাজড়াগণ বাবার কাছে আসা যাওয়া করিতেন, নিজেদের দুঃখে কষ্টে নানা সমস্যার সমাধানে তাঁহারা অলৌকিক শক্তির সহায়তা প্রার্থনা করিতেন। অনুরূপ সমস্যা নিয়া দীনহীন কাঙাল ও অন্ত্যজেরাও এই সমদর্শী মহাপুরুষের কাছে কম আনাগোনা করিত না। মৎস্যজীবী মংলু ছিল বাবার এমনি এক দীন দরিদ্র ভক্ত। একদিন গভীর রাত্রে চুপি চুপি সে অসিঘাটের বজরায় আসিয়া উপস্থিত। বাবার সাথে তাহার এক গুরুতর পরামর্শ আছে। তাঁহার সাহায্য ছাড়া এ বিপদে নাকি মংলুর উদ্ধার পাওয়া কঠিন।

রামনাম কীর্ত্তন সবে মাত্র শেষ হইয়াছে। সারা দিনের ভীড় ও কোলাহলের পরে হরিহর বাবা শয্যায় শয়ন করিতে যাইবেন, এমন সময় বাবার এই ধীবর ভক্ত বিষণ্ণ হৃদয়ে আসিয়া উপস্থিত।

একান্তে ডাকিয়া নিয়া, সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বাবা মংলুর দিকে চাহিলেন। সরল বিশ্বাসে সে তাহার দুঃখের কথা নিবেদন করিল, "বাবা, কিছু দেনার দায়ে পড়েছি। পাওনাদারেরা বড় উৎপাত করছে। ভেবেছিলাম কয়েকটা দিন গঙ্গায় সারা রাত জাল বাইবো, বড় মাছ কতগুলো ধরা পড়লে দেনাটা শোধ হয়ে যাবে।"

"তা কি রকম হচ্ছে টচ্ছে"—বাবা অন্তরঙ্গ স্বরে ধীবর ভক্তকে প্রশ্ন করিলেন।

হতাশ কণ্ঠে মংলু উত্তর দিল, "না বাবা—সেই জন্যেই তো আপনার কাছে আজ ছুটে আসা। গত কয়েকদিন যাবৎ জালে একটাও বড় মাছ পড়ছে না। গঙ্গা মায়ী এ অভাগার প্রতি একেবারে বিরূপ। বাবা, এবার আপনি একটু বলে না দিলে যে গোষ্ঠীশুদ্ধ না খেয়ে মরবো, দেনা শোধ করা তো দূরের কথা।"

মংলুর সমস্যার কথা শুনিয়া হরিহর বাবা মহা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তাইতো, এ বিপদ হইতে পরিত্রাণের উপায় কি ?

কিছুক্ষণ চুপচাপ কি ভাবিয়া নিয়া অনুচ্চ কণ্ঠে কহিলেন, "শোন্ বেটা। তোর কোন ভয় নেই। রামনাম জপ করিস তো ? বেশ, তেমনি করে যাবি। আর আগামী কাল রাতে গঙ্গায় জাল ফেলবার আগে গঙ্গামায়ীর দোহাই দিবি, অনুনয় বিনয় করবি। গঙ্গামায়ী সকলেরই মাতা,—পাপী তাপী, দীন দুঃখীর জন্য তাঁর করুণার অন্ত নেই। তোর প্রার্থনা তিনি নিশ্চয় শুনবেন। দেখবি, কাল থেকেই জালে অনেক মাছ ধরা পড়বে।"

কয়েকদিন পরে ধীবর হরিহর বাবার সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত। মন তাহার উল্লাসে ভরিয়া উঠিয়াছে। যুক্ত করে নিবেদন করিল, "বাবা, আপনার কৃপায় সব ঠিক হয়ে গিয়েছে, গঙ্গামায়ী আমার প্রার্থনা শুনেছেন। আজকাল জালে রোজ একগাদা করে বড় মাছ ধরা পড়ছে। আমার দেনা প্রায় শোধ হয়ে এলে বলে।"

বাবা তো মহা প্রসন্ন। সহাস্যে কহিতে লাগিলেন, "দ্যাখ্ মংলু, রামনাম আর গঙ্গামায়ী—এ দুয়ের কি কৃপা আর অপূর্ব্ব মহিমা! দারিদ্র্য, দেহরোগ থেকে শুরু ক'রে সর্ব্ব ভবরোগ এঁরা নাশ করেন। সাবধান, কখনো যেন এ দুটো আশ্রয় ছাড়বিনে।"

অন্তরঙ্গ ভক্ত শিষ্যদের কাছে হরিহর বাবার এই কৃপালীলা ছিল পরম বিস্ময়। উচ্চকোটির সাধকদের মুমুক্ষার দ্বার যে শক্তিধর মহাত্মার

কৃপায় মুহূর্তে উন্মুক্ত হইত, দরিদ্র মংলু জেলের মৎস্যাভাব সমস্যার সমাধানেও তাহা নামিয়া আসিতে দেরী করিত না। সমদর্শী ব্রহ্মবিদ্‌ মহাপুরুষের পক্ষেই ইহা ছিল সম্ভবপর।

সিদ্ধপুরুষ হরিহর বাবার দীর্ঘ জীবনে যোগবিভূতির বিস্ময়কর লীলা বহুবারই দেখা গিয়াছে। বিশিষ্ট ভক্ত ও অনুরাগী সাধকদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ দর্শনের মধ্যে ইহার নানা বিবরণ পাওয়া যায়।

সেবার হরিহর বাবা কাশীর উপান্তে বীতরাগ বাবার সাধনকুটিরে অবস্থান করিতেছেন। চরম কৃচ্ছ্র ও একাগ্র সাধনায় দিন অতিবাহিত হইতেছে। প্রতিদিন শেষ রাত্রে উঠিয়া তিনি গঙ্গাস্নান সমাপন করেন, তারপর ডুবিয়া যান তপস্যার গভীরে। সেদিন স্নানের সময় হঠাৎ এক দুর্ঘটনা ঘটে। ভাবতন্ময় সাধক পা পিছলাইয়া পড়িয়া যান এক নাগফণি কাঁটার ঝোঁপের উপর। সঙ্গীরা তাড়াতাড়ি তাঁহাকে টানিয়া আনিয়া শুশ্রূষা করিতে থাকেন।

একটু সুস্থ হওয়ার পর হরিহর বাবা শুনিতে পান, প্রবীণ মহাত্মা বীতরাগ বাবাও কিছুদিন আগে নদী তীরের এই কাঁটাগাছে আহত হইয়াছেন। রক্তপাতও নাকি বেশ কিছুটা হইয়াছে। এই সংবাদ শোনা মাত্র বাবা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, "দ্যাখো, যে কাঁটাগাছ বীতরাগ-বাবার মত মহাপুরুষের রক্তপাত ঘটায় কাশীর গঙ্গাতীরে তার থাকবার কোন অধিকার নেই। নাগফণি গাছ এখন থেকে আর যেন এখানে না দেখা যায়।"

বাক্‌সিদ্ধ সাধকের এই বাক্য অচিরে সিদ্ধ হইয়া উঠে। সবিস্ময়ে সকলে লক্ষ্য করেন, কণ্টকাকীর্ণ নাগফণি গাছ আর কাশীর গঙ্গাতীরে জন্মাইতেছে না।

কয়েক বৎসর পরের কথা। হরিহর বাবা তখন তুলসীঘাটে বসিয়া কঠোর তপস্যা করিতেছেন। ইতিমধ্যে চারিদিকে তাঁহার যোগবিভূতির

খ্যাতিও কিছু কিছু রটিয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে আর্ত্ত ও মুমুক্ষু নরনারী তাঁহার চরণতলে আসিয়া শরণ নেয়, দুঃখ দহনের হাত হইতে মাগে তাহারা নিষ্কৃতি।

একদিন গভীর রাত্রে বৃক্ষতলে আসন বিছাইয়া হরিহর বাবা শয়ন করিয়া আছেন। অকস্মাৎ এক আর্ত্ত চীৎকারে তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল।

সেই মহল্লার এক বৃদ্ধা ভক্ত প্রায়ই ভক্তিভরে তাঁহার কাছে যাওয়া আসা ক'রিত। হঠাৎ সে হরিহর বাবার আসনের সম্মুখে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়ে। হতাশ হইয়া বলিতে থাকে, "বাবা; মহাসঙ্কটে পড়ে আমি এসেছি। আপনার কৃপা ছাড়া উদ্ধারের আর উপায় নেই। আমার ছেলে কল'কাতায় চাকুরী ক'রে। এইমাত্র সেখান থেকে তার এসেছে, সে কলেরায় মরণাপন্ন। বাবা, আমি বিধবা, দীন দরিদ্রা। এই ছেলেই আমার একমাত্র সম্বল। আপনি কৃপা ক'রে তার প্রাণ ভিক্ষা দিন।"

"মায়ী কেন তুমি এতো উতলা হচ্ছো? সর্ব্ব বিঘ্নহর রামনাম জপ করতে থাকো, তাতে সব বিপদ কেটে যাবে।"—শান্তস্বরে উত্তর দেন হরিহর বাবা।

"না বাবা, আমার মুখের নাম জপে কোন কাজ হবেনা। বিপদে পড়লেই তো তা জপ করি, কিন্তু বিপদ কাটে কই? বাবা, আপনি নিজের হাতে আমায় একটা ওষুধ দিন ছেলের জন্য, তাই নিয়ে আমি আজই কলকাতায় রওনা হই।"

কোন সান্ত্বনা, কোন আশ্বাস বাক্যই স্ত্রীলোকটি শুনিতে চায়না, দুই চোখে কেবলই অবিরল ঝরিতে থাকে অশ্রুধারা। আর যুক্তকরে বার বার সে মিনতি জানায়।

অসহায়া নারীর ক্রন্দন মহাপুরুষের হৃদয় গলাইয়া দিল। প্রশান্ত কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "মা তুমি আর এমন করে কেঁদো না, শান্ত হও। সামনেই রাস্তার ধারে ঐ মুদি দোকান রয়েছে। ওখান থেকে আমার নাম ক'রে একটা সোহরা ফল তুমি নিয়ে এসো। আমি তোমার ছেলের রোগমুক্তির জন্য ওষুধ দিয়ে দিচ্ছি।"

বৃদ্ধা তখনি ছুটিয়া গিয়া সোহরা সংগ্রহ করিয়া আনে।

ফলটি হাতে নিয়া মহাপুরুষ কিছুক্ষণ উহা নাড়াচাড়া করেন। তারপর অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠেন—জয় রাম জয় রাম। সঙ্গে সঙ্গে এটি নিক্ষেপ করেন গঙ্গাগর্ভে।

এবার করুণাঘন দৃষ্টিতে বৃদ্ধার দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "যা বেটি, কলকাতায় আর তোর যাবার দরকার নেই। ছেলের অসুখ ভালো হয়ে গিয়েছে! কালই তুই খবর পাবি। যা, এখন ঘরে গিয়ে পরমানন্দে রাম-নাম জপ্‌তে লেগে যা।"

পরদিনই কলিকাতা হইতে বৃদ্ধার গৃহে আর এক জরুরী তার আসিয়া উপস্থিত—রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে, তাহার মায়ের আর আসার কোন দরকার নাই।

এই বৃদ্ধা যে কয় বৎসর বাঁচিয়া ছিল, প্রতিদিন প্রভাতে আসিয়া হরিহর বাবাকে দর্শন করিত, শিবজ্ঞানে করিত তাঁহার স্তবস্তুতি।

সে-বার এক মন্দিরের উচ্চ সিঁড়ি হইতে পতিত হইয়া হরিহর বাবা গুরুতররূপে আহত হন। আঘাতের ফলে পায়ের একটি হাড় ভাঙ্গিয়া যায়। ভক্তেরা তো মহা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, তাড়াতাড়ি তাঁহাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইল।

অভিজ্ঞ সার্জনদের সন্দেহ, হরিহর বাবার পায়ের অস্থি দুই তিন টুক্‌রা হইয়া গিয়াছে। তখনি ক্লোরোফর্ম প্রয়োগ করিয়া ভগ্ন পদে অস্ত্রোপচার করা হইল। অস্থি পুনঃসংস্থাপনের শেষে ডাক্তারেরা সবেমাত্র ক্যাবিনের বাহিরে আসিয়াছেন এমন সময় ভারপ্রাপ্তা নার্স ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া চেঁচাইয়া উঠে, "একি! রোগী কোথায়? এই তো তাকে আমি বিছানায় শোয়া দেখলুম, এরই ভেতর কোথায় সে অদৃশ্য হলো?"

ডাক্তারেরা সবাই ত্রস্তপদে আবার ক্যাবিনে ঢুকিলেন। সত্যই তো রোগীর শয্যা খালি পড়িয়া রহিয়াছে। ক্লোরোফর্ম্ম দ্বারা বেহুঁস রোগী

কি করিয়া এতটুকু সময়ের ব্যবধানে বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া পায় এবং স্থান ত্যাগ করিতে সক্ষম হয়? এই রহস্য ভেদ ক'রা তাঁহাদের কাহারো পক্ষে সেদিন সম্ভব হইল না।

ভক্তেরা সবাই তখনি ছুটিয়া গেলেন হরিহর বাবার আস্তানায়। সবিস্ময়ে দেখিলেন, বাবা পরমানন্দে বসিয়া ভজন অনুষ্ঠান করিতেছেন! কে বলিবে যে তাঁহার পায়ের অস্থি ভগ্ন এবং কিছুক্ষণ আগেই অস্ত্রোপচার করা হইয়াছে?

একটি ভক্ত অনুযোগের সুরে কহিলেন, "বাবা, এটা কি ভালো হলো? পায়ের হাড় আপনার ভেঙ্গেছে, বিচক্ষণ সার্জন দিয়ে অপারেশনও করিয়েছেন, তারপর এভাবে সবাইকে ব্যস্তসমস্ত ক'রে হাসপাতাল থেকে চলে এলেন কেন?"

মহাপুরুষ হাসিয়া কহিলেন, "ছ্যাখো, প্রারব্ধ বড় বলবান। তাকে জায়গা ছেড়ে দিতে হবে, তাই নিজের পা ভেঙ্গেছি, তারপর ডাক্তার দিয়ে কাটাছেঁড়া করানোও বাদ দিইনি। এতেই হয়ে গিয়েছে প্রারব্ধের ক্ষয়। তাই তো হাসপাতালের বদ্ধ ঘরে চুপ করে শুয়ে থাকা আর পোষায়নি। সটান স্বস্থানে ফিরে এসেছি।"

হরিহর বাবার সেদিনকার এই কাণ্ড দেখিয়া ডাক্তার ও ভক্তদের বিস্ময়ের অন্ত রহিল না।

বিশ্বনাথ বাবা ছিলেন হরিহর বাবার স্নেহধন্য এবং অন্তরঙ্গ শিষ্য। একাদিক্রমে প্রায় পঁচিশ বৎসর কাল একনিষ্ঠ এই বাঙ্গালী সাধক তাঁহার গুরুর রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছেন, একান্ত সেবকরূপে চিহ্নিত হইয়া গিয়াছেন। শক্তিধর গুরুর নানা কৃপালীলা ও বিভূতি লীলা তিনি স্বচক্ষে দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছেন। গুরু মাহাত্ম্য বর্ণনার কালে বিশ্বনাথ-বাবা মাঝে মাঝে এই সব নিগূঢ় তথ্য অন্তরঙ্গ ভক্তদের কাছে পরিবেশন করিতেন। তাঁহার একবারকার প্রত্যক্ষ দর্শনের কাহিনী এখানে আমরা বিবৃত করিব।

সেবার গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দহনে বারাণসীর নরনারী অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। দিনের পর দিন আকুল আগ্রহে সবাই প্রতীক্ষা করিতেছে বর্ষা সমাগমের। অসিঘাটের বজরায় সেদিন সান্ধ্য পূজা ও আরতি শেষ হইয়া গেল। বিশ্বনাথবাবা গুরু মহারাজকে নিবেদন করিলেন, "বাবা, আপনার শরীরটে তেমন ভালো নেই, এদিকে সারাদিনই আজ লু'র দাপট গিয়েছে। ভাবছি এ সময়ে একবার আপনাকে গঙ্গাবক্ষে বেড়িয়ে আনবো। শরীরটে একটু ঠাণ্ডা হবে!"

বাবার অনুমতি মিলিল। কয়েকটি অন্তরঙ্গ ভক্তসহ শুরু হইল নৌবিহার। গঙ্গায় কিছুক্ষণ ঘোরা ফেরার পর দেখা গেল, আকাশের কোণে জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘ। ক্ষণকাল মধ্যে শুরু হইল এক প্রচণ্ড ঝটিকা।

বিশ্বনাথ বাবা মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। অন্তরে অনুতাপও দেখা দিল। তাইতো, গুরু মহারাজ নিজে ভ্রমণে বাহির হইতে চান নাই, শেষটায় তিনিই নিজে তাঁহাকে এই বিপদের মুখে টানিয়া আনিলেন!

তাড়াতাড়ি বজরার মাঝিদের ডাকিয়া কহিলেন, "এক্ষুনি সব পাল গুটিয়ে ফেল। সাবধান! ঝড়ের হাওয়ার ঝাপ্‌টায় বজরা যেন উল্‌টে না যায়।"

হরিহর বাবা এতক্ষণ ধ্যানস্তিমিত নেত্রে বজরার ভিতরকার কক্ষে উপবিষ্ট ছিলেন। শিষ্যকে ঘাবড়াইতে দেখিয়া এবার মুখ খুলিলেন। প্রশান্ত কণ্ঠে কহিলেন, "বেটা, এতো দুশ্চিন্তা করে মরছো কেন? আমি যে স্থানে আসন ক'রে বসে আছি, রাম নামের দিব্য শক্তি দিয়ে ঘেরা যে স্থান, সেখানে এই নৈসর্গিক উৎপাত কি করবে, বলতো? ভয় নেই। যে ঝড় এগিয়ে আসছে, তা আমাদের এই বজরার আশ্রমকে এড়িয়ে যাবে। এখানকার কোন ক্ষতিই তা করবে না!"

বিশ্বনাথ বাবার নয়ন সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত হইল এক অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য। দেখিলেন, ঐরাবতের মত গর্জ্জন করিয়া আসিয়া ঝড়ঝঞ্ঝা কি যেন এক দৈবী প্রেরণায় বজরাকে পাশ কাটাইয়া যাইতে লাগিল। হরিহর বাবা

তখন নীরব নিশ্চল, ধ্যানস্থ। প্রকৃতির দুর্যোগকে নিয়ন্ত্রণের যে অদ্ভুত ঐশ্বর্য্য মহারাজ সেদিন প্রদর্শন করিলেন দীর্ঘকাল তাহা বিশ্বনাথ বাবার স্মৃতিপট হইতে মুছিতে পারে নাই!

মনুষ্যেতর প্রাণীর উপরও হরিহর বাবার যোগৈশ্বর্য্যের প্রভাব ছিল অমোঘ। বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অযোধ্যা সিং ইহার এক মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়াছেন—

সেদিন নাগোয়া অঞ্চলে মহা সোরগোল পড়িয়া যায়। কাশী-নরেশের একটি বৃদ্ধ হাতী ক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে। রামনগরের চারিদিক লণ্ডভণ্ড করার পর সেদিন এই হস্তী পুঙ্গবের মাথায় খেয়াল চাপে, গঙ্গা পার হইয়া সে বারাণসী শহর তোলপাড় করিবে। উত্তেজিত অবস্থায় বৃংহন-নাদে চারিদিক উচ্চকিত করিয়া উহা গঙ্গাগর্ভে ঝাঁপ দেয়, সন্তরণ শুরু ক'রে অসির তুলসীঘাট লক্ষ্য করিয়া।

এই ঘাটেরই এক কোণে, বৃক্ষ ছায়ায়, হরিহর বাবা তাঁহার ইষ্ট ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন। চক্ষু দুইটি নিষ্পলক, বাহ্যজ্ঞান নাই। উন্মত্ত হস্তী এবার বিরাট চীৎকার করিতে করিতে বাবার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। প্রাঙ্গণের নরনারী সবাই আগে হইতেই ভয় পাইয়া বহু দূরে সরিয়া গিয়াছে। ভীতি মিশ্রিত দৃষ্টিতে তাহারা চাহিয়া আছে ঐ দুর্দ্ধর্ষ মারমুখী হস্তী আর আত্মসমাহিত সাধুর দিকে। এই মুহূর্ত্তেই বুঝি বা পদতলে পিষ্ট হইয়া হরিহর বাবার ভবলীলা সাঙ্গ হয়!

কিন্তু একি অবিশ্বাস্য দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত তাহাদের সমক্ষে! হরিহর বাবার দিকে কিছুটা আগাইয়া গিয়াই হাতীটি কোন্ এক ইন্দ্রজাল বলে মুহূর্তমধ্যে শান্ত হইয়া যায়। শুঁড়টি নীচু করিয়া আজ্ঞাবহ ভৃত্যের মত থাকে দণ্ডায়মান। উলঙ্গ সাধকের প্রেমের নিগড়ে সে যেন চিরতরে বন্দী হইয়াছে, নিজস্ব কোন সত্তা আর নাই।

উন্মত্ত হস্তীর এই অত্যাশ্চর্য্য রূপান্তরের স্মৃতি দীর্ঘদিন কাশীর জনমানসে জাগরূক ছিল।[১]

দীর্ঘদিনের কৃচ্ছ্র ও কঠোর তপস্যার ফলে হরিহর বাবার শরীর অপটু হইয়া পড়িতে থাকে। বয়সও ক্রমে পৌঁছে শতকের কোঠায়। এই সময়ে মাঝে মাঝে তিনি অন্তরঙ্গ ভক্ত শিষ্যদের কাছে লীলা সংবরণের আভাষ দিতেন।

একদিন ভক্তেরা বলেন, "বাবা, আপনি ইচ্ছাময়, স্বতন্ত্র ও ঈশ্বর-স্বরূপ। আপনি ইচ্ছে করলেই তো আরো বহু বৎসর আমাদের মধ্যে কল্যাণের উৎস-রূপে বিরাজ ক'রতে পারেন।"

"তা কি করে হয় বেটা, রামজীর চরণে যে সব ইচ্ছে আমার নিবেদন করে দিয়েছি। তা কি আর ফেরানো যায়?"—স্নিগ্ধ মধুর কণ্ঠে মহাত্মা উত্তর দেন।

"বাবা, আপনার আশ্রয়ে থেকে আমরা পরম শান্তিতে আছি, একটা নিরাপত্তার বোধ নিয়ে আছি। আপনি যেন ছেড়ে যাবেন না।"

"বেটা, জীব সত্তার কথা ছেড়ে রামজীর পরম স্বরূপের কথা ভাবো। তিনি রয়েছেন সারা সৃষ্টিতে ওতপ্রোত হয়। সেখানে তোমাদের আর আমার বিচ্ছেদ নেই কোনকালে।"

একদিন একান্ত সেবকদের ডাকিয়া বলিলেন "গাছ বড়ো জীর্ণ ও পুরাতন হয়ে গেছে। আর একে রাখা ঠিক নয়।"

পরদিন হইতেই সমস্ত খাদ্য পরিত্যক্ত হইল। দেহরক্ষার জন্য নিজেই ব্যবস্থা করিলেন—শুধু এক কমণ্ডলু পবিত্র গঙ্গাবারি। সবাই বুঝিলেন, ইহা বাবার মহা প্রয়াণের উদ্যোগ পর্ব্ব।

[১]ডক্টর অযোধ্যা সিং, 'দি গ্লোরি অব হরিহর বাবা : পৃঃ ১৭

অবশেষে ১৯৪৯ সালের পহেলা জুলাই তারিখে প্রতীক্ষিত লগ্নটি আসিয়া যায়। বাবার ইচ্ছানুসারে অগণিত ভক্ত, শিষ্য ও অনুরাগীদের দর্শনদানের জন্য তাঁহার কক্ষদ্বার উন্মুক্ত করা হয়। তারপর বেলা এগারোটায় তাঁহার শেষ আরতি সাঙ্গ হইবার পর চিরতরে তিনি ত্যাগ করেন শেষ নিঃশ্বাস।

লীলা সংবরণের সংবাদ তখনই দাবানলের মত সারা বারাণসী ও সন্নিহিত অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে। সহস্র সহস্র নরনারী আসিয়া ঘিরিয়া দাঁড়ায় হরিহর বাবার পবিত্র আশ্রমটিকে। সাশ্রুনয়নে নিবেদন ক'রে তাহাদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণের অর্ঘ্য!

চন্দন-চর্চ্চিত, পুষ্পমাল্য বিভূষিত, মরদেহটি স্থাপন করা হয় একটি প্রস্তর-পেটিকায়। সুসজ্জিত তরণীতে চাপাইয়া ভক্তগণ উহা মণিকর্ণিকার ঘাটে লইয়া যান। তারপর বেদমন্ত্র ও রামধুন সঙ্গীত গাহিয়া পেটিকাটি নিক্ষেপ করা হয় কল্লোলিনী গঙ্গার অভ্যন্তরে।

বারাণসীর অধ্যাত্মপুরীতে হরিহরের যে মিলিত সত্তাকে মহাসাধক হরিহর বাবা আপন সাধনায় মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, আজো তাহার জন্য সাধকজনের আকুতির সীমা নাই।

তিব্বতী-বাবা

শিবচতুর্দ্দশীর পুণ্যতিথি। পূজার উপচার সংগ্রহ করার জন্য গৃহের সবাই আজ অত্যন্ত ব্যস্ত। বালক নবীনচন্দ্রেরও এতটুক অবসর নাই, সারাদিন জননীর পিছে পিছে ঘুর্‌ঘুর্‌ করিয়াছেন আর নানা ফুট্‌-ফরমায়েস খাটিয়াছেন। সন্ধ্যার পর জননী কহিলেন, "বাবা নবীন, পূজোর তো সময় হয়ে এলো, পুরুৎঠাকুর এসে পড়লেন বলে। এই অবসরে চট্‌ ক'রে আমি খিড়কীর পুকুর থেকে একটা ডুব দিয়ে আসি। তুই ততক্ষণে ঠাকুর ঘরে বসে পাহারা দে। লক্ষ্য রাখবি, আমার এত সব আয়োজন যেন নষ্ট না হয়।"

জননী স্নানে গিয়াছেন। নবীন চুপচাপ পূজার কক্ষে একাকী উপবিষ্ট। সারাদিন ছুটাছুটির ফলে ক্লান্তি আসিয়াছে, খানিক বাদেই একপাশে মেঝেতে সে শরীর এলাইয়া দিল। ঘুম আসিতেও দেরী হইল না।

জননী ইতিমধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছেন। পূজার উপচারের দিকে তাকাইতেই চমকিয়া উঠিলেন। এ কি কাণ্ড! কয়েকটা ইঁদুর যে নৈবেদ্যের থালার উপর চড়িয়া চাল-কলা খাওয়া শুরু করিয়া দিয়াছে। তাড়া করিতেই সেগুলি লিঙ্গ-বিগ্রহের মাথার উপর দিয়া লাফাইয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

ক্রুদ্ধা জননী বালক নবীনকে জাগাইয়া তুলিলেন। ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, "কি কুক্ষণে তোকে এখানে পাহারা দিতে রেখে আমি চান্‌ করতে গিয়েছি। তুই ঘুমোবার আর সময় পেলিনে? দ্যাখ্‌ তো, ইঁদুর-গুলো সবটা নৈবেদ্য উচ্ছিষ্ট করে গেল। আবার আমায় নূতন করে থালা সাজাতে হবে। হ্যারে, এত অপদার্থ তুই!"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া দৃপ্তভঙ্গীতে বালক উত্তর দিল, "আচ্ছা মা, যে ঠাকুর নিজের ভোগের চাল-কলা রক্ষা করতে পারে না, তার পূজোয় কি ফল, তা আমায় বলতে পারো ?"

"সে কি রে, এ কি অলক্ষুণে কথা বলছিস্? তুমি কি শেষটায় নাস্তিক হবি নাকি ?"

"না মা—নাস্তিক নয়। এ হচ্ছে আস্তিকেরই কথা। ঈশ্বরকে এই কুঠ্রীতে বসিয়ে রাখতে, চাল-কলা ফুল-বেলপাতা দিয়ে ঘিরে রাখতে, আমার মন চায় না। আমার মন ব'লে—জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, অনন্তকোটি গ্রহ তারায় তিনি ছড়িয়ে আছেন। হ্যাঁ—মা, সেই ঈশ্বরের কথাই আমি ভাবি।"

"এ বয়সে এত পাকা পাকা কথা বলতেও শিখেছিস্"—মা সহাস্যে বলিয়া উঠেন।

পুরোহিত স্মৃতিরত্ন মহাশয় ইতিমধ্যে ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিয়াছেন। এতক্ষণ একপাশে দাঁড়াইয়া মাতাপুত্রের কথা শুনিতেছিলেন। আগাইয়া আসিয়া নবীনের মাকে কহিলেন, "না মা, পাকামো নয়, তোমার ছেলে তার সংস্কার অনুযায়ীই কথা বলছে। অপূর্ব্ব সাত্ত্বিক চিহ্ন ওর সারাদেহে বর্ত্তমান। নিশ্চয় পূর্ব্ব জন্মের ত্যাগ বৈরাগ্যময় সাধন-সংস্কার নিয়ে এ ছেলে জন্মেছে। আমি ব'লে রাখ্ছি, বড় হয়ে এ বংশ উজ্জ্বল করবে।"

বালক নবীন কিন্তু ততক্ষণে পূজার ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। জননী ধীর প্রশান্ত কণ্ঠে এবার কহিলেন, "স্মৃতিরত্ন মশাই, ভাব্ছি, আপনার কথা হয়তো ঠিকই। অনেকদিন আগের কথা। এক পরিব্রাজক সন্ন্যাসী সে-বার আমাদের বাড়ীতে এসে হাজির। জ্যোতিষ-বিদ্যায় তাঁর খুব অধিকার। আমার হস্তরেখা দেখে তিনি বলেছিলেন,—মা, তোমার ষষ্ঠ গর্ভে এক পুত্র সন্তান হবে এবং সে সন্তান হবে সংসারত্যাগী মহাত্মা। নবীন আমার সেই সন্তান, সত্যিই আমি বড় ভয়ে ভয়ে থাকি, কবে বা সেই অভ্যাগত সন্ন্যাসীর ভবিষ্যদ্বাণী ফলে যায়।"

মায়ের এ আশঙ্কা কিন্তু সত্যে পরিণত হয়। দুই বৎসরের মধ্যেই নবীন পিতামাতা ও আত্ম-পরিজনের মায়া অনায়াসে কাটাইয়া বাহির হইয়া পড়ে আধ্যাত্ম জীবনের পথে। উত্তরকালে পরিণত হয় সে এক মহাশক্তিধর ও সার্থকনামা মহাপুরুষরূপে। দিগ্‌বিদিকে প্রসিদ্ধি লাভ ক'রে তিব্বতী বাবা নামে।

অধুনা পাকিস্থানের অন্তর্গত, সিলেট শহরের অদূরে, এক গণ্ডগ্রামে আনুমানিক ১৮২০ সালে তিব্বতী বাবা জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রাজচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ছিলেন দশ হাজার টাকা আয়ের একটি ক্ষুদ্র জমিদারীর অধিকারী। দান, ধ্যান এবং জনকল্যাণকর কর্ম্মের জন্য এই অঞ্চলে চক্রবর্ত্তীদের তখন বেশ সুনাম ছিল। রাজচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী ছিলেন পরম ভক্তিমতী। অতিথি সেবা, গৃহদেবতার পূজা ও পাল-পার্ব্বণের কাজ কর্ম্মে তাঁহার নিষ্ঠা ও উৎসাহের অন্ত ছিল না।

পুত্র নবীনচন্দ্র তখন স্থানীয় স্কুলে বিদ্যাভ্যাস করেন, বয়স প্রায় পনের বৎসর। আর পাঁচটি ছেলের মত তাঁহার স্বভাব নয়। খেলা-ধূলায় যেমন মন বসে না, তেমনি নাই কোন উৎসাহ স্কুলের লেখাপড়ায়। সংসার বিরাগ দিনের পর দিন কেবল বাড়িয়াই চলিয়াছে। একদিন জননীকে ডাকিয়া কহিলেন, "ত্যাখো মা, বেশ কিছুদিন যাবৎ কতকগুলো প্রশ্ন আমার মনে তোলপাড় করছে, কোন উত্তরই আমি খুঁজে পাচ্ছিনে। কোথা থেকে মানুষ আসে, কোথায়ই বা চলে যায়? এই সৃষ্টির মূলে কে রয়েছেন? কি তাঁর স্বরূপ? কি জানি কেন এই প্রশ্নগুলো আমায় ভূতের মত পেয়ে বসেছে। আমি এও বুঝতে পেরেছি, সংসারের সব কিছু ত্যাগ ক'রে না বেড়িয়ে পড়লে আমার জীবনের এই জিজ্ঞাসার উত্তর কোনদিনই মিলবে না।"

"এ সব তুই কি বলছিস্ পাগলের মত? ঘরে বসে কি ধর্ম্ম হয় না? শাস্ত্র পাঠ ক'র্, সাধন ভজন ক'র্, তবেই মিলবে পরম বস্তু।"—জননী করুণ সুরে বলেন।

"না মা, তা হয় না। আমি সিদ্ধান্ত স্থির ক'রে ফেলেছি। আজ রাত্রেই বেরিয়ে পড়বো আমার নূতন জীবনের যাত্রা পথে।

জননী কিছুক্ষণ বজ্রাহতের মত চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর প্রশান্ত কণ্ঠে কহিলেন, "বাবা, আমি বুঝতে পেরেছি, ভবিতব্য খণ্ডানো যায় না। তোর মুখে এই কথা শুনবো, এ আশঙ্কায়ই এতদিন ছিলাম। এবার বুঝলাম, তোর জন্মের আগে অতিথি সন্ন্যাসী যা বলে গিয়েছিলেন তা-ই ফলতে যাচ্ছে। মনে ভয় ছিল, কিন্তু এই সঙ্গে মনকে বুঝিয়ে কিছুটা স্থিরও ক'রে রেখেছিলাম। ঈশ্বরের সন্ধানে যাচ্ছিস্—আমি এতে বাধা দেবো না। আশীর্ব্বাদ করি, কুল পবিত্র ও উজ্জ্বল ক'র্।"

"মা, তোমার এতদিনের দেবপূজা সার্থক। সত্যই তুমি মহিয়সী"—এ কথা বলিয়া নবীন মায়ের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম নিবেদন ক'রে।

পিতা ও অন্যান্য আত্ম-পরিজনের কাছে বিদায় নিয়া সেই রাতেই মুমুক্ষু কিশোর ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যায়।

এই সর্ব্বত্যাগী কিশোরই উত্তর কালের শক্তিধর মহাপুরুষ তিব্বতী-বাবা। যোগ ও তন্ত্র সাধনায় সিদ্ধকাম হইয়া শত শত আর্ত্ত ও মুমুক্ষুর পরমাশ্রয় রূপে উত্তর ভারত ও তিব্বতের সর্ব্বত্র তিনি কীর্ত্তিত হইয়া গিয়াছেন।

যাত্রার প্রাক্কালে জননী কহিলেন, "বাবা, নিয়তির আহ্বানে ঘর ছেড়ে তুই চলে যাচ্ছিস্, বরণ করে নিয়েছিস্ ত্যাগ তিতিক্ষার জীবন। এ পথে দুঃখ কষ্ট অনেক কিছু হয়তো তোর সইতে হবে। কিন্তু আমি তোর কাঙাল জীবনের কথা ভাবতে পারিনে। আস্তাবলে ছোট একটা টাট্টু ঘোড়া আছে, নিয়ে যা। তার পিঠে চড়ে পরিব্রাজন কর্। আর এই নে কিছু টাকা, এ দিয়ে কিছুদিন তোর গ্রাসাচ্ছাদন চলবে। আর একটা কথা পালন করিস্। গৃহস্থের অন্ন কখনো ভিক্ষা করবি না, তাতে হীনমন্য হয়ে যেতে হয়। ভিক্ষা যদি গ্রহণ ক'রতেই হয়, ক'রবি মঠ মন্দির বা আখ্‌ড়ায়।"

মাতার অনুরোধ রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়া পুত্র চিরতরে সেদিন তাঁহার কাছে বিদায় গ্রহণ করেন।

নবীনচন্দ্রের গম্যস্থান আপাতত গঙ্গাতীরের সিদ্ধপীঠ কালীঘাট। পিতার অতিথিশালায় অনেক সময় পরিব্রাজক সাধু সন্ন্যাসীর আগমন ঘটিত। ইঁহাদের মুখে তিনি শুনিয়াছেন—উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের সব বড় বড় মহাত্মারাই এই সিদ্ধপীঠ দর্শন করিতে আসেন। নবীন মনে ভাবিলেন, প্রথমে সেখানে গিয়া উপযুক্ত গুরুর সন্ধান করিবেন। যদি না মিলে, অগ্রসর হইবেন আরো পশ্চিমের দিকে।

কলিকাতা নগরী তখনো দানা বাঁধিয়া উঠে নাই, আর ভবানীপুর ছিল অরণ্যবেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র জনবিরল গ্রামমাত্র। এই গ্রামেরই এক প্রান্তে, ভাগীরথীর তীরে জাগ্রত সিদ্ধপীঠ কালীঘাট। দূর দূরান্ত হইতে বহু সাধু সন্ন্যাসী এই সাধনক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হন। দেবী দর্শন করিয়া কেহ সন্নিহিত নির্জ্জন বনভূমিতে সাধন ভজন করেন, কেহ বা আগাইয়া চলেন সাগরদ্বীপ এবং কামাখ্যা পাহাড়ের পথে।

কিছুদিন এ অঞ্চলে ঘোরাঘুরি করার পর নবীন গয়ায় আসিয়া উপস্থিত হন। দীনদয়াল উপাধ্যায় গয়ার এক শীর্ষস্থানীয় কবিরাজ, শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত বলিয়াও শহরে খুব নাম ডাক। তরুণ পরিব্রাজক নবীনচন্দ্র হঠাৎ একদিন তাঁহার নজরে পড়িয়া যান। উপাধ্যায়জী বলেন, "বেটা তোমার চোখে মুখে প্রতিভার দীপ্তি রয়েছে, ভবিষ্যতে তুমি কৃতী পুরুষ বলে সর্ব্বত্র সম্মানিত হবে। এভাবে অযথা ঘোরাফেরা ক'রে অমূল্য জীবন নষ্ট ক'রছো কেন? আমার কুঠিতে এসে বাস ক'র। দর্শন আর বৈদ্যশাস্ত্র শিক্ষা ক'র। এতে আমার মঙ্গল হবে।"

"কিন্তু আমি তো বসে বসে আপনার অন্ন ধ্বংস করতে পারবো না। গৃহস্থের অন্ন ভিক্ষা গ্রহণ করতে আমার জননীর নিষেধ আছে।"—উত্তরে জানান নবীনচন্দ্র।

"মাতৃ আজ্ঞা তুমি পালন ক'রে চল বেটা, তাই তো আমি চাই! বেশ তো, তুমি উপার্জ্জন করেই নিজের গ্রাসাচ্ছাদন চালাও। আমার

কবরেজ-খানায় সাহায্যকারী কর্ম্মীর দরকার আছে। তুমি সেই কাজ ক'র, তার পরিবর্ত্তে আমার গৃহে দু'বেলা আহার ক'র। এতে তো তোমার আপত্তি হবার কথা নয়? এই সুযোগে, তুমি কবিরাজী শাস্ত্র হাতে কলমে শিক্ষার সুযোগ পাবে। তুমি যখন পরের অন্ন গ্রহণে ইচ্ছুক নও, তখন এমনি একটা অর্থকরী বৃত্তি তোমার শিখে নেওয়া ভাল নয় কি?"

নবীন রাজী হইয়া গেলেন। মনে ভাবিলেন, জননীর দেওয়া টাকা ইতিমধ্যে নিঃশেষ প্রায়। থলিয়া হইতে কিছু চুরি গিয়াছে, বাকিটা ব্যয়িত হইয়াছে এ কয় মাসে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে। টাট্টু ঘোড়াটিও গঙ্গা পার হওয়ার আগে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। এবার কবিরাজী বিদ্যাটা মোটামুটিভাবে আয়ত্ত করিয়া নিলে সুবিধাই হয়। পরিব্রাজক জীবনে লোকের চিকিৎসায় ব্রতী হইলে পরোপকার করা যেমন হইবে, তেমনি হইবে জীবিকার একটা ব্যবস্থা। ভিক্ষার জন্য কাহারো কাছে হাত পাতিতে হইবে না।

গয়ায় উপাধ্যায়জীর আশ্রয়ে একে একে তিন বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। এবার নবীন বড় ভাবিত হইয়া পড়িলেন। বৈদ্যশাস্ত্রের মোটামুটি একটা ধারণা তাঁহার হইয়াছে, ঔষধপত্র দিবার রীতিপদ্ধতিও কিছুটা আয়ত্ত করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহের পথ হয়তো কিছুটা সুগম হইবে। কিন্তু মুমুক্ষার যে আকাঙ্ক্ষা নিয়া গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, তাহার তো কিছুই হইল না। এভাবে সময় নষ্ট ক'রা তো আর চলে না। পরের দিনই সবার অলক্ষ্যে সরিয়া পড়িলেন, পা বাড়াইলেন বারাণসীর পথে।

পরিব্রাজন ও উপযুক্ত গুরু অন্বেষণের নেশা নবীনকে এখন পাইয়া বসিয়াছে। বারাণসীতে বিশ্বনাথ দর্শনের পর সাধুদের মঠ ও আখ্‌ড়ায় কিছুকাল ঘুরিয়া বেড়াইলেন। তারপর একদল তীর্থযাত্রীর সঙ্গে পদব্রজে উপনীত হইলেন বৃন্দাবন ধামে।

কুঞ্জে কুঞ্জে, মঠে মন্দিরে, অলিতে গলিতে সর্ব্বত্র কেবল 'জয় রাধে'

ধ্বনি। কৃষ্ণ-রাধারাণীর সেবা পূজা আর লীলা-অনুধ্যানে এখানকার সাধু সমাজ বিভোর। ভক্তিরসে রসায়িত বৃন্দাবন ধাম। কিন্তু কি জানি কেন এই পরিবেশ নবীনের তেমন মনঃপূত হইল না। স্থির করিলেন, কয়েকদিনের মধ্যেই কাশ্মীর যাত্রা করিবেন।

যমুনার ঘাটে বেড়াইতে গিয়া সেদিন তাঁহার এক বন্ধু জুটিয়া গেল। যুবকের নাম জগন্নাথ চৌধুরী, এখানকার এক প্রতাপশালী জমিদারের তনয়। নবীনের চেহারা ও হাবভাবে আকৃষ্ট হইয়া চৌধুরী তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়া ফেলিলেন। নবীনের মত তাঁহারও ঘর সংসারে নিরাসক্তি আসিয়া গিয়াছে। কোন শক্তিমান গুরুর কাছে দীক্ষা নিতে হইয়াছেন কৃতসঙ্কল্প।

কথা প্রসঙ্গে চৌধুরী একদিন কহিলেন, "ভাই, তোমার ও আমার জীবনের উদ্দেশ্য প্রায় এক—তাই তোমায় একটা গোপন খবর খুলে বলি। কয়েকদিন হয়, আমি একটি কাপালিক মহাত্মার সংস্পর্শে এসেছি। শক্তিসাধনায় ইনি সিদ্ধ, শুধু তাই নয়, মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চারও করতে পারেন। আমি বলি কি, চল আমরা দুজনে তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করি। শক্তিসাধনার পথে মোক্ষ লাভ নাকি খুব তাড়াতাড়ি হয়। যাবে আমার সঙ্গে সেই মহাপুরুষকে দর্শন করতে?"

নবীন তৎক্ষণাৎ রাজী হইলেন। ভাবিলেন, এ কয় বৎসর তো বৃথা ঘোরাঘুরিতে নষ্ট হইয়া গেল। সত্যকার শক্তিমান সাধকের দর্শন তাঁহার ভাগ্যে হইয়া উঠিল না। চৌধুরী যাহা বলিতেছেন, তাহা সত্য হইলে এই মহাপুরুষের আশ্রয়ই তিনি গ্রহণ করিবেন।

প্রশ্ন করিয়া জানিলেন, শক্তিসাধকটি অবস্থান ক'রেন বৃন্দাবনের উল্টাদিকে, যমুনার অপর পারে ধারোয়ার নিবিড় অরণ্যে। এখানকার এক প্রাচীন মন্দিরে, নির্জ্জন পরিবেশে, তিনি কি এক সঙ্কল্প নিয়া তপস্যা করিতেছেন। মহাত্মার অনুমতি পাইয়া সুযোগ মত চৌধুরী একদিন নবীনকে নিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন।

কৃষ্ণবর্ণ, আজানুলম্বিত বাহু, ভীমকায় মহাপুরুষ। মাথায় রুক্ষ

জটার ভার, রক্তবর্ণ দুই চোখ ভাঁটার মত জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে। স্বয়ং কাল ভৈরব যেন এই নির্জ্জন বনে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

ভীতি-সম্ভ্রম মিশ্রিত অন্তরে নবীন এই মহাপুরুষকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। সেদিন বেশী কিছু কথাবার্ত্তা হইল না, সত্বর উভয়কে বিদায় নিতে হইল।

কাপালিককে দর্শন করিয়া নবীন মহা উৎসাহিত। মিন্‌মিনে ভক্তির পথ কোনদিনই পছন্দ তাঁহার নয়। ভাবিলেন, এই শক্তিধর মহাপুরুষের আশ্রয় পাইলে কৃতার্থ হওয়া যায়।

কয়েকদিন পরের কথা। চৌধুরী হন্তদন্ত হইয়া নবীনের কাছে আসিয়া উপস্থিত। সোৎসাহে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, "মস্ত বড় সুযোগ এসেছে আমাদের দুজনের জীবনে। মহাত্মার সঙ্গে এইমাত্র দেখা করে এলাম। তিনি বললেন,—পরশুদিন রাত্রে, অমানিশার মধ্য যামে, শক্তি সাধনার একটা বিশেষ ক্রিয়া সম্পন্ন করবেন। তারপর শবদেহে জীবন সঞ্চার ক'রে এই অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হবে। ঐ সময়ে আমাদের দুজনকেই তিনি উপস্থিত থাকতে অনুমতি দিয়েছেন। আরো নির্দ্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন যমুনায় স্নান ক'রে নববস্ত্র পরে' সেখানে যাই। কি জানি, হয়তো বা আমাদের দুজনকে কৃপা ক'রে দীক্ষা ও সাধন তখনি দান করবেন।"

নির্দ্ধারিত সময়ের কিছুটা আগে যমুনা অতিক্রম করিয়া উভয়ে ধারোয়া'র জঙ্গলস্থিত মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। মশালের আলোকে ভিতরকার কক্ষটি আলোকিত। ভীমকান্তি মহাপুরুষের চেহারা আজ যেন আরো উগ্র, আরো ভয়ঙ্কর। গলায় হাড়ের মালা প্রলম্বিত, ললাটে বৃহৎ রক্তচন্দনের টীকা। কারণবারি পান করার ফলে আয়ত নয়ন দুইটি আরো রক্তিম হইয়া উঠিয়াছে। উপুড় হইয়া পিছন ফিরিয়া একটি মৃৎপাত্রে ক্রিয়া সাধনের উপচার সাজাইতে ব্যস্ত। তরুণ ভক্তদ্বয় কক্ষে ঢুকিতেই গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, "তোমরা এসে গিয়েছ—উত্তম। পাশাপাশি যে আসন দুটি রাখা আছে, তাতে উপবেশন ক'র।"

নবীন ও চৌধুরী দুজনেই বাক্য ব্যয় না করিয়া যন্ত্রচালিতবৎ আসন পরিগ্রহ করিলেন।

এক পার্শ্বে একটি বৃহদাকার মৃন্ময় দীপাধারে প্রদীপ জ্বলিতেছে। হস্তস্থিত একটি ভাণ্ড নবীনের হাতে আগাইয়া দিয়া কাপালিক কহিলেন, সতর্ক থেকো, আর লক্ষ্য রেখো—দীপ যেন নিভে না যায়, স্তিমিত হয়ে এলেই এই ভাণ্ডের দাহ্য তরলবস্তু সলতেয় ঢেলে দেবে।"

ভাণ্ডটি হাতে নেওয়া মাত্র একটা বিকট দুর্গন্ধে নবীন আঁৎকিয়া উঠিলেন। নাকে কাপড় চাপা দিতে হইল।

মহাপুরুষ নির্বিবকারভাবে কহিলেন, "আঁৎকে ওঠ্‌বার কিছু নেই। ওটা মৃতের মাথার ঘিলু, কিছুদিন আগে সংগৃহীত, তাই একটু দুর্গন্ধ হয়ে থাক্‌বে। উপায় নেই, এ অনুষ্ঠানে তৈল-ঘৃত একেবারে নিষিদ্ধ, এই বস্তুই ব্যবহার করতে হবে।"

সল্‌তেটিকে চাঙ্গা করিয়া নবীন নিজ আসনে স্থির হইয়া বসিলেন। এবার দৃষ্টি পড়িল সম্মুখের দিকে। মন্দির-গর্ভ হইতে টানা-দেওয়া একজোড়া মোটা রজ্জু তাহাদের আসনের একপাশে দেওয়ালে আসিয়া ঠেকিয়াছে। রজ্জু দুইটিতে ঘন ব্যবধানে রক্ত জবার মালা জড়ানো। ইতিমধ্যে কাপালিকের প্রস্তুতি পর্ব্ব শেষ হইয়াছে। অনুষ্ঠানের উপচার একটি ডালায় সাজাইয়া নিয়া তাহার উপর একটি খড়্গ রাখিয়া উভয়ের সম্মুখে রাখিলেন।

দুই বন্ধুই কিন্তু ঐ রজ্জুর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছেন। লক্ষ্য করিয়া কাপালিক কহিলেন, "বৎসগণ, এই রজ্জুর তাৎপর্য্য শীঘ্রই বুঝতে পারবে। উচ্চ মন্দিরগর্ভ থেকে সিঁড়ির মত এটি নেমে এসেছে। মন্ত্রদ্বারা সঞ্জীবিত একটি শব এখনই এই রজ্জু বেয়ে ধীরে ধীরে অবতরণ করবে। তোমাদের কাছেই আসবে। চঞ্চল হয়ো না। যার যার আসনে স্থির হয়ে বসে থাকো।"

এবার কাপালিক মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার গম্ভীরকণ্ঠে কিছুক্ষণ মন্ত্র-উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ক্ষণপরেই মন্দিরের বিস্তৃত

কক্ষে উদ্‌ঘাটিত হইল এক অভাবনীয় দৃশ্য। দেখা গেল, দুইটি সমান্তরাল রজ্জুর উপর ভর করিয়া অপর প্রান্ত হইতে একটি সিঁদুর চর্চ্চিত কৃষ্ণকায় মানুষের শব সামনের দিকে আগাইয়া আসিতেছে। শুধু তাহাই নয়, এই শব সাময়িকভাবে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। হস্তে তাহার দুইটি বৃহদাকার খড়্গ। সঞ্জীবিত মৃতদেহ উত্তেজিত ভাবে বিকট কিড়মিড়্ আওয়াজ করিতেছে আর খড়্গ দুইটি বারবার করিতেছে আন্দোলিত।

নবীন ও চৌধুরী ততক্ষণে আতঙ্কে অস্থির! শরীরের লোম খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। নয়ন দুইটি বিস্ফারিত, হৃদপিণ্ডে যেন বারবার পড়িতেছে হাতুড়ির ঘা।

ভীমকান্তি জীবন্ত শব এবার প্রায় তাহাদের আসনের সম্মুখে। নাঃ—আর এক মুহূর্ত্ত দেরী করা নয়। এখনি এই শব যে তাহাদের দুই বন্ধুকেও শব বানাইয়া ছাড়িবে।

জগন্নাথ চৌধুরী বলবান ও সাহসী পাঞ্জাবী যুবক। নিমেষ মধ্যে নিজ কর্ত্তব্য সে স্থির করিয়া ফেলে। ডালার উপর রক্ষিত শাণিত খড়্গটি তুলিয়া নিয়া রজ্জু দুইটির ওপর সজোরে সে এক কোপ বসাইয়া দেয়—মৃতদেহটি সবেগে কক্ষের মেঝেতে ছিট্‌কাইয়া পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে দুই বন্ধু তড়িৎবেগে লাফাইয়া মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হন, অন্ধকারময় অরণ্যের মধ্য দিয়া ছুটিয়া চলিতে থাকেন উর্দ্ধশ্বাসে।

ক্রোধে উত্তেজনায় কাপালিক উন্মত্ত। মশাল হাতে নিয়া হুকার দিতে দিতে উভয় তরুণের অনুসরণ করেন। অবশেষে ভগ্নমনোরথ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হন।

দুই বন্ধু ছুটিতে ছুটিতে ধারোয়া'র জঙ্গলের শেষ প্রান্তে আসিয়া পড়িয়াছেন। এবার ওপারে যাইতে হইবে। এতরাত্রে নদী পার হওয়া বিপজ্জনক। কিন্তু এত ভাবনা-চিন্তার তখন আর অবসর কোথায়? দুই বন্ধু ইষ্টনাম স্মরণ করিয়া নদীতে দিলেন ঝাঁপ।

অতিকষ্টে যখন ওপারে বৃন্দাবনের তটে পৌঁছিলেন তখন সারা দেহ

ক্লান্তিতে একেবারে অসাড়। সামনেই এবং বৈষ্ণব সাধুর ছোট কুপাড়, উহার আঙিনায় দুজনে দেহ এলাইয়া দিলেন।

কিছুক্ষণ বাদে ঝুপড়ির ঝাঁপ উন্মুক্ত হইল। রাত্রি তখন প্রায় শেষ, ঠাকুরের ভজন গাহিতে গাহিতে বাহিরে আসিলেন এক প্রবীণ সাধক। আঙিনায় শায়িত নবীন ও চৌধুরীকে দেখিয়া স্নেহভরা কণ্ঠে কহিলেন, "তোমরা কে গো বাছা? এই শেষ রাত্রে, এখানে ঠাণ্ডা মাটিতে এমন ক'রে শুয়ে কেন?"

তরুণদ্বয়ের ক্লান্তি এতক্ষণে কিছুটা দূর হইয়াছে। ভূমিশয্যা ছাড়িয়া সৌম্যমূর্ত্তি বাবাজীকে তাঁহারা প্রণাম নিবেদন করিলেন। সংক্ষেপে বর্ণনা করিলেন নিজেদের গত রাত্রের অত্যদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা।

বাবাজী ধীর কণ্ঠে কহিলেন, "বাবা, তোমাদের ভাগ্য ভাল, নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছো। যে শক্তি-সাধকটির কথা বলছো তার খবর আমি সব জানি,—সে হচ্ছে এক নরঘাতক কাপালিক। সঙ্কল্প করেছে—নয়টি মানবমুণ্ড সে সংগ্রহ করবে আর নবমুণ্ডী আসনে তপস্যা ক'রে হবে সিদ্ধকাম। সাতটি মুণ্ড ইতিমধ্যেই সে সংগ্রহ করেছে। এবার তোমাদের মুণ্ড দুটি পেলেই তার এতদিনের মনস্কামনা চরিতার্থ হতো। কাপালিকটির সিদ্ধাই আছে, তাছাড়া শবদেহ নিয়ে নানা ভেল্‌কী দেখিয়েও নিজের কুকার্য্য সিদ্ধি ক'রে।"

দুই বন্ধুর পরিচয় গ্রহণের পর নবীনের দিকে তাকাইয়া বৈষ্ণব তাপস কহিলেন, "বাবা, গুরু অন্বেষণের জন্য তুমি এত উতল হচ্ছো কেন? এই অল্প বয়সে ত্যাগ-তিতিক্ষায় তুমি পশ্চাদ্‌পদ নও—এ বড় আনন্দের কথা। আমি বল্‌ছি, তোমার হবে। সদ্‌গুরু তোমায় কৃপা করবেন।"

পুত্রের মুখে পরের দিন কাপালিকের সব কথা শুনিয়া জগন্নাথ চৌধুরীর বাবা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। বৃন্দাবনের তিনি অন্যতম প্রভাবশালী জমিদার। ধনবল ও জনবল দুয়েরই অধিকারী। তখান একদল লোক সঙ্গে নিয়া ধারোয়ার জঙ্গলে তিনি প্রবেশ করিলেন ঐ

নরঘাতকের সন্ধানে। একবার ধরিতে পারিলে উত্তম মধ্যম দিয়া তাহার নরমুণ্ড সংগ্রহের বাসনা চিরকালের তরে ঘুচাইয়া দিবেন। কিন্তু কাপালিকের সন্ধান পাওয়া গেল না। প্রাচীন মন্দিরটিতে ঢুকিয়া দেখা গেল, কক্ষমধ্যে গত রাত্রের উপচারসমূহ রহিয়াছে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। কাপালিক কোথায় উধাও হইয়া গিয়াছে, বন মধ্যে অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়াও তাহাকে ধরা সম্ভব হইল না।

বৃন্দাবনে আরো কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া নবীনচন্দ্র আবার শুরু করিলেন তাঁহার পরিব্রাজন। কুরুক্ষেত্র, পুষ্কর, জ্বালামুখী প্রভৃতির পরিক্রমা শেষ করিয়া উপস্থিত হইলেন কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ তুষারতীর্থ অমরনাথে।

অমরনাথ হইতে ফিরিবার পথে ভাগ্যক্রমে সাক্ষাৎ ঘটে এক শক্তিধর যোগীর সঙ্গে। যোগীবরের কৃপাদৃষ্টি পতিত হয় নবীনের উপর। মুমুক্ষু তরুণকে কিছুদিন নিজের কাছে রাখিয়া যোগসাধনার কতকগুলি প্রক্রিয়া তাঁহাকে তিনি দেখাইয়া দেন। এভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হয়।

অতঃপর যোগীবর একদিন নবীনকে ডাকিয়া স্নেহভরে কহিলেন, "বেটা, আমি এখানকার ডেরাডাণ্ডা উঠাবো, তোমাকেও এবার আমার সঙ্গ ত্যাগ কর'তে হবে।"

নবীনের মাথায় যেন পতিত হইল বজ্রাঘাত। কাতরকণ্ঠে কহিলেন, "প্রভু, কিঞ্চিৎ কৃপা ভিক্ষা দান করার পরই আমার প্রতি এমন বিরূপ হচ্ছেন কেন? অনুমতি দিন, আপনার সেবায় আমার এই নগণ্য জীবন উৎসর্গ ক'রে আমি ধন্য হই।"

"তা হয় না বেটা। আমি তোমার গুরু নই, তোমার আন্তরিকতা দেখে, তোমার আধারটি ভাল দেখে, আমি সাময়িক কিছুটা সাহায্য করেছি মাত্র। তোমার গুরু রয়েছেন তিব্বতে। তুমি এবার সেইদিকে পরিব্রাজন শুরু কর। হ্যাঁ, আর একটা কথা। তিব্বতে প্রবেশ ক'রা বড় কঠিন, বড় বিপজ্জনক। তুমি প্রথমে নেপালে যাও। সেখানকার

প্রধান মন্ত্রী আমার অন্যতম ভক্ত। আমার নাম উল্লেখ ক'রে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা ক'রো, তবেই তোমার তিব্বত অঞ্চলে প্রবেশ অনেকটা সহজ হয়ে উঠবে।"

বিষাদখিন্ন হৃদয়ে নবীনচন্দ্র কাশ্মীর হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তারপর ঘুরিতে ঘুরিতে উপস্থিত হইলেন নেপাল দরবারে। এখানকার প্রধান মন্ত্রীর সহযোগিতা পাইতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া নেপালের প্রাচীন মন্দির ও সাধনপীঠসমূহ দর্শন করার পর স্থানীয় রাজপুরুষদের ব্যবস্থাপনায় একদল ব্যবসায়ীর সঙ্গে তিনি তিব্বতের অভ্যন্তরে গিয়া উপস্থিত হন।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটি সুখবর পাইলেন। অদূরস্থিত পর্ব্বতের ক্রোড়ে রহিয়াছে ভরতগুহা। এখানে শৈবতান্ত্রিক এক প্রাচীন শক্তিমান সাধক অবস্থান করেন। দুরারোহ চড়াই অতিক্রম করিয়া নবীনচন্দ্র সেদিন এই সাধকের নিকট উপস্থিত হইলেন।

পরমানন্দ ঠক্কর নামে সাধক সমাজে ইনি পরিচিত। উচ্চ স্তরের লামা সাধুরাও ইঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করিয়া থাকেন। যোগবল ও তান্ত্রিক সিদ্ধাইর ইনি অধিকারী এবং এই দিব্যশক্তি সাহায্যে কয়েক শত বৎসর ইনি জীবিত রহিয়াছেন। এই ঠক্কর বাবার কাছেই নবীনচন্দ্র দীক্ষালাভ করেন, দীর্ঘকাল কঠোর সাধনার পর যোগ ও তন্ত্রে লাভ করেন অসামান্য পারদর্শিতা। সাধনা ও সিদ্ধির আলোকে উদ্‌ভাসিত তরুণ সাধক অল্পকাল মধ্যে পরিচিত হইয়া উঠেন তিব্বতীবাবা নামে।

পরবর্ত্তীকালে কলিকাতার এক ভক্তগৃহে বসিয়া তিব্বতীবাবা তাঁহার গুরু পরমানন্দ ঠক্করের সাধন-ঐশ্বর্য্য এবং দীর্ঘ আয়ুষ্কালের কথা বর্ণনা করিতেছিলেন। ঠক্কর বাবার বয়স কয়েক শত বৎসর অতিক্রম করিয়াছে, একথা শুনিয়া তার্কিক গোছের একটি ভক্ত মন্তব্য করেন, "বাবা, কোন মানুষের বয়স কয়েক শ'বছর পেরিয়ে গেছে, একথা বললে আজকের দিনের শিক্ষিত ও বিচারশীল মানুষেরা কিন্তু বিশ্বাস ক'রবে না।

শুধু তাই নয়, তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে আমাদের বলবে—এ সব যে ঠাকুর মা'র ঝুলির কথা।"

তিব্বতীবাবা রোষে গর্জ্জিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "ছাখ, যারা একথা বলবে, তারা তোদেরই মত গণ্ডমূর্খ ছাড়া আর কি? তা হলে শুনে রাখ্—নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের নামই হচ্ছে জীবন। এ দুটো ক্রিয়া বন্ধ করার কৌশল যে জানে সে-ই পারে জীবনের গতিকে স্তম্ভন করতে, সে-ই পারে শত শত বৎসর জীবিত থাকতে। এতে তো আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই! সমর্থ যোগীপুরুষদের অনেকেই এভাবে আয়ুষ্কাল বাড়াতে পারেন। আপন-ভোলা নিরসক্ত মনে হঠাৎ একটা সঙ্কল্প যদি কখনো জেগে ওঠে, শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া যায় নিরুদ্ধ হয়ে, জীবনের পরিধিও হয় বিস্তৃততর। আমার গুরুদেবের শক্তির পরিমাপ তোরা শালারা কি বুঝবি? বিপুল আধ্যাত্মিক শক্তির আধার হয়ে অবস্থান করেছিলেন শত শত বৎসর।"

এই সময়ে বাবার মুখে তিব্বতের উচ্চকোটির সাধকদের যোগশক্তির কথা এবং কয়েকটি নিগূঢ় যৌগিক ক্রিয়ার ব্যাখ্যা শুনিয়া ভক্ত শ্রোতারা নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন।

তিব্বতীবাবার গুরুর কর-ধৃত ছিল যোগ এবং তন্ত্রের যুগ্মরশ্মি। নবাগত তরুণ শিষ্যকে তিনি এই দুই সাধনায়ই পারঙ্গম করিয়া তুলিতে থাকেন। পূর্ব্ব জন্মের সাত্ত্বিক সংস্কারের দৃঢ় ভিত্তি রহিয়াছে শিষ্যের সাধনজীবনের মূলে। তদুপরি রহিয়াছে সাধনায় তাঁহার অখণ্ড নিষ্ঠা। তাই শুদ্ধসত্ত্ব ও শক্তিমান এই তরুণের আধারে অকৃপণ করে তিনি নিজের সাধন ঐশ্বর্য্য ঢালিয়া দিতে লাগিলেন।

ক্রমাগত সাত বৎসরের কৃচ্ছ্র ও অক্লান্ত সাধনার শেষে ঠক্কর বাবা কহিলেন, "বৎস, তোমায় আমি প্রাণভরে আশীর্ব্বাদ করছি, এতদিন পরে তুমি আপ্তকাম হয়েছ। ভরত-গুহায় থেকে সাধন করার প্রয়োজন তোমার এবার ফুরিয়েছে। অতঃপর তুমি তিব্বতের জাগ্রত দেবস্থান ও সাধনপীঠগুলিতে বসে তপস্যা ক'র, পূর্ণ আত্মজ্ঞান ক'র করায়ত্ত।"

এই পরিব্রাজনের সময় স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে তিব্বতীবাবার সাধন-ঐশ্বর্য্যের খ্যাতি প্রচারিত হইয়া পড়ে। উচ্চস্তরের লামাদের মতই হয় তাঁহার প্রভাব প্রতিপত্তি। শুধু এই সময়েই 'নয়, বহু বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পরও তিব্বতের জনমানসে এই বাঙ্গালী মহাত্মার পবিত্র স্মৃতি এতটুক ম্লান হয় নাই।

স্বনামধন্য পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় একবার তিব্বত পরিব্রাজনে গিয়াছিলেন। সেখানকার গিরিশৃঙ্গের এক মঠাধীশ তাঁহাকে প্রসঙ্গক্রমে তিব্বতীবাবার কথা জিজ্ঞাসা করেন। বাংলাদেশে তখনো তিব্বতীবাবা সুপরিচিত হইয়া উঠেন নাই, তাই শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার সম্পর্কে তেমন কিছু বলিতে সক্ষম হইলেন না।

মঠাধীশ লামাটি তখন এই মহাপুরুষ সম্বন্ধে তাঁহার প্রত্যক্ষ ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিলেন। পরে মন্তব্য করিলেন, "পণ্ডিতজী, আমি খুব বিস্মিত হলাম যে, এমন একজন শক্তিমান মহাত্মার কথা আপনার দেশের লোক এখনো তেমন অবগত নয়।"

প্রফুল্লচন্দ্র গুহ নামক এক বিশিষ্ট সরকারী কর্ম্মচারীর সহিত একবার দার্জ্জিলিঙ ঘুম-এ সিকিম মহারাজের লামাগুরুর সাক্ষাৎ ঘটে। গুহ মহাশয় লক্ষ্য করেন, লামাগুরুর পূজা-বেদীতে স্থাপিত রহিয়াছে তিব্বতী বাবার মালা-চন্দনযুক্ত একখানি চিত্রপট। সবিস্ময়ে তিনি প্রশ্ন করেন, "একি! এ যে আমাদের তিব্বতী বাবার ছবি। আপনারা এঁকে পূজা করেন নাকি?"

ঐ চিত্রপটটি তাড়াতাড়ি ভক্তিভরে মাথায় ঠেকাইয়া লামাগুরু বলেন, "হ্যাঁ, আমাদের মধ্যে যাঁরা এই মহাত্মাকে জানেন, তাঁরা ভক্তিভরে এঁকে পূজো করেন। বহু তিব্বতী সাধক ও গৃহস্থ এঁকে একজন পরম শ্রদ্ধেয় লামা বলেই মনে করে। অনেকদিন তিব্বতে বাস করে ইনি সে দেশের আত্মজন হয়ে উঠেছিলেন।"

তিব্বতে এই শক্তিধর মহাপুরুষ একাদিক্রমে অবস্থান করেন বত্রিশ বৎসর কাল। এই দীর্ঘ সময় মধ্যে শুধু প্রাচীন যোগী সাধকদের

সাহচর্য্যই তিনি লাভ করেন নাই, শক্তিমান লামা এবং বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শেও আসিয়াছেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছেন সাধনার বহুতর নিগূঢ় ক্রিয়া।

অল্প বয়সে গয়ায় থাকিতে তিব্বতীবাবা বৈদ্যশাস্ত্র কিছুটা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। বরাবরই ইচ্ছা ছিল, এই শাস্ত্র অধিগত করিয়া অসহায় দীনদরিদ্র নরনারীর ক্লেশ কিছুটা নিবারণ করিবেন। তিব্বতের দীর্ঘ অবস্থান এ সম্পর্কে এক বড় সুযোগের সৃষ্টি করিল। লামা এবং বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের মঠে মন্দিরে প্রাচীনকাল হইতে ঔষধি সম্পর্কে প্রচুর গবেষণা অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। বহুতর বিস্ময়কর ঔষধি আবিষ্কৃত হইয়া এই সব কেন্দ্রের সাধকদের দ্বারা ব্যবহৃত হইতেছে। অপার নিষ্ঠা ও ধৈর্য্য নিয়া তিব্বতীবাবা প্রসিদ্ধ মঠসমূহ হইতে এসম্বন্ধীয় তথ্য সংগ্রহ করিলেন, তিব্বতীয় বৈদ্য শাস্ত্র এবং ভেষজ বিজ্ঞানে অসামান্য পারদর্শিতা অর্জন করিলেন। উত্তরকালের আচার্য্য জীবনে এই ভেষজ-জ্ঞান বহুজনের কল্যাণসাধন করিয়াছিল।

তিব্বত বাসের শেষ সাতটি বৎসর এই মহাপুরুষ ধ্যানের গভীরে নিমজ্জিত হইয়া যান। কখনো আকাশচুম্বী বরফমণ্ডিত গিরিগুহায়, কখনো বা খরস্রোতা নির্ঝরিণীর ধারে, কখনো বা সর্প-ব্যাঘ্রসঙ্কুল নিবিড় অরণ্যে দিনের পর দিন তিনি অতিবাহিত করিতেন সমাধিস্থ অবস্থায়। তিব্বতের লামা এবং পাহাড়ী লোকেরা এই তপস্যাপরায়ণ মহাত্মাকে বেশ ভালভাবেই চিনিত, দূর হইতে ভক্তিভরে চরণে প্রণতি জানাইয়া তাহারা চলিয়া যাইত নিজেদের দৈনন্দিন কাজে। এই পাহাড়ীদের অনেকে তাঁহাকে ডাকিত পাগলা-বাবা নামে, আবার অনেকের নিকট তিনি পরিচিত হইয়া উঠেন তিব্বতীবাবা রূপে।

ঐ সাত বৎসরের নিরবচ্ছিন্ন তপস্যাময় জীবনের শেষে তিব্বতীবাবা লাভ করেন তাঁহার বহু আকাঙ্ক্ষিত সিদ্ধি, হন পূর্ণমনস্কাম। ইহার

অব্যবহিত পরেই মধ্য এশিয়ার নানা দুর্গম তীর্থের অভিযাত্রায় তিনি বাহির হইয়া পড়েন।

কৈলাসের অদূরস্থিত চ্যাং-টাং অঞ্চল হইতে তাঁহার এই দুঃসাহসিক পদযাত্রা শুরু হয়। এই পরিব্রাজন সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিয়া এক ভক্ত নিবন্ধকার আকর্ষণীয় বর্ণনা দিতেছেন[১]—

"চ্যাং-টাং হইতে তিব্বতীবাবা মঙ্গোলিয়ায় রাজধানী উর্গা নগর অভিমুখে প্রাচীনকালের প্রশস্ত উত্তরগামী বাণিজ্যপথ ধরিয়া বিদেশীয় সঙ্গীগণের সহিত চলিলেন। তিনি যোগপারঙ্গম হওয়ায় বিজাতীয় ভাষাভাষীদের সহিত ব্যবহারে তাঁহাকে কোনরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই, পক্ষান্তরে উর্গা নগরবাসীরা এই শ্রেণীর একজন ভারতীয় হিন্দু পর্য্যটককে অতিথিরূপে পাইয়া নিজেদের কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অভিপ্রায় মত সাইবেরিয়া ভ্রমণের সুবিধা সুযোগ করিয়া দিয়াছিলেন।

"মঙ্গোলেরা স্বভাবত অতিথিপরায়ণ। কোন বিদেশী অপরিচিত অতিথি আসিলেই তাঁহাকে সমাদরে অভ্যর্থনা ক'রে এবং পূজা-পার্ব্বণ উৎসবাদিতে অনেক সময়ে অতিথি অভ্যাগতগণকে সঙ্গে লইয়া সাইবেরিয়া অঞ্চলের নিকটবর্ত্তী স্থানে ভোজন ও আমোদ-প্রমোদ করিয়া থাকে। উর্গা নগর বৌদ্ধগণের অন্যতম তীর্থ বলিয়া গণ্য ও বিভিন্ন দেশ হইতে যাত্রীদল প্রায়ই এখানে যাতায়াত ক'রে।

"তিব্বতী বাবা এই স্থান হইতে উত্তরে সাইবেরিয়া প্রান্তর অতিক্রম করিয়া চলিলেন। উর্গা হইতে বরাবর মেমাৎচীন হইয়া প্রাচীন রাজপথ উত্তরে বৈকাল হ্রদ পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই হ্রদের নিকটে একটি পবিত্র পর্ব্বতোপরি এক বিখ্যাত যজ্ঞভূমি আছে। সেখানে বুর্কান দেবতার উদ্দেশে ভারতীয় বৈদিক অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুকরণে সময় সময়ান্তরে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। যজ্ঞের (তেলপান) বৃহৎ কুণ্ডে উপযুক্তভাবে অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে উহাতে চতুষ্পদ বদ্ধ করিয়া একটি জীবিত অশ্বকে আহুতি

[১]তিব্বতী বাবা : অমিয়লাল মুখোপাধ্যায়—হিমাদ্রি, ২০শে মাঘ, ১৩৬২

দেওয়া হয় এবং তৎসহ তারাস্থন্ নামক দেশীয় সুরাও (বৈদিক সোমের অনুরূপ ?) ঢালিয়া দেওয়া হয়। এতদঞ্চলে বৈদিক বজ্রদেবতা ইন্দ্রও বিভিন্ন নামে পূজা পাইয়া থাকেন। প্রাচীনকালের চীন দেশেও ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

"তিব্বতী বাবা সাইবেরিয়া হইতে পূর্ব্ব চীনে আসেন। এই ভাবে ভ্রমণ করিতে গিয়া কৈলাস হইতে করোকোরাম, কুইনলিন্, আলটিন প্রভৃতি গিরিপথে সুগভীর খাত, গিরি সঙ্কট, দুর্গম জঙ্গলাকীর্ণ হিংস্র জন্তুর বাসভূমি ও পার্ব্বত্য নদনদী তিনি অতিক্রম করেন ; চ্যাং-টাং হইতে উর্গা পৌঁছাইতেই তিনি আনুমানিক তিন সহস্র মাইল পথ পদব্রজে ভ্রমণ করিয়াছিলেন।"

বহুবৎসর পরে, কলিকাতায় অবস্থান ক'রার কালে একবার তিব্বতী-বাবার এক পুরাতন ঝুলি হইতে রুশ, চীনা এবং মাঙ্গোলীয় ভাষায় লিখিত কতকগুলি চিঠি ও মানপত্র আবিষ্কৃত হয়। এগুলির মর্ম্ম কি, এ প্রশ্ন বাবাকে করা হইলে মুচকি হাসিয়া তিনি উত্তর দেন, "সাধ্য আর উৎসাহ যদি তোমাদের থাকে, এ ভাষা যারা জানে তাদের ডেকে মর্ম্ম অবগত হও।"

প্রায় বিশ বৎসরকাল এই মহাত্মা কলিকাতা নগরী ও উহার আশে-পাশে বাস করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উপরোক্ত মধ্য-এশীয় ভাষায় লিখিত পত্রাদির পাঠোদ্ধারে ভক্ত বা গবেষকদের কোন উৎসাহ বা তৎপরতা দেখা যায় নাই।

চীন, মঙ্গোলিয়া ও সাইবেরিয়া ভ্রমণের মধ্য দিয়া তিব্বতী বাবা প্রায় ছয় হাজার মাইল পথ অতিক্রম করেন এবং তারপর বর্ম্মায় আসিয়া উপস্থিত হন। কপর্দ্দকহীন সন্ন্যাসী তিনি, তদুপরি অপ্রতিগ্রাহী, ভিক্ষা হিসাবে কাহারো কাছে কোন কিছু গ্রহণ করার স্বভাব তাঁহার ছিল না— এ অবস্থায় এই সুদীর্ঘ পথ তিনি কি করিয়া অতিক্রম করিয়াছেন, কিভাবে নিজ দেহের ভরণ পোষণ করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত বিস্ময়জনক। পরবর্ত্তীকালে বাবা তাঁহার ভক্তদের বলিয়াছিলেন, "তিব্বতী লামাদের

প্রদত্ত ভেষজ বিদ্যা ও দ্রব্যগুণের তত্ত্ব ভাল ক'রে শিখেছিলেম বলেই, মধ্য এশিয়ার পরিব্রাজনে নিজের প্রাণরক্ষা করতে পেরেছিলাম।"

পথ চলিতে চলিতে বহুস্থানে তিনি দুরারোগ্য রোগীদের আরোগ্য করিতেন। এই সব আর্ত্তদের মধ্যে যেমন ছিল দীনতম দরিদ্র গ্রামবাসী ও যাযাবর, তেমনই ছিল ধনী গৃহস্থ, ব্যবসায়ী ও শাসককুল। ইহাদের সকৃতজ্ঞ সহায়তায় তিব্বতী বাবার পরিব্রাজন ও জীবিকার সমস্ত কিছু ব্যয় নির্ব্বাহ হইত।

বর্ম্মায় অবস্থান ক'রার কালে রামরতন বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক ভক্ত বাঙ্গালীর সঙ্গে তিব্বতী বাবার পরিচয় হয়। কিছুদিন পরে ঐ ভক্তেরই নির্ব্বন্ধাতিশয্যে তিনি মাদ্রাজে আসিয়া উপস্থিত হন। এই সময়ে মাদ্রাজের উপান্তে ধীরে ধীরে তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া একটি সাধন-আশ্রম গড়িয়া উঠে এবং কিছুসংখ্যক মুমুক্ষু ব্যক্তি এই মহাপুরুষের সাধন ও উপদেশ গ্রহণ করিয়া ধন্য হন।

মাদ্রাজের আশ্রমে তিব্বতীবাবার ভেষজবিদ্যা ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার নানা চমকপ্রদ প্রয়োগ দেখা যাইত। আর্ত্ত ভক্তেরা আসিয়া কাঁদাকাটি শুরু করিলেই তিব্বতে লব্ধ রাসায়নিক জ্ঞান তিনি তাহাদের নিরাময়ের জন্য প্রয়োগ করিতেন। এভাবে চিকিৎসা বিদ্যায় তাঁহায় নিপুণতার খ্যাতি ক্রমে চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এই সময়ে ইলোরার রাজা একটি উৎকট এবং দুশ্চিকিৎস্য রোগে ভুগিতেছিলেন। অবস্থা ক্রমে বড় সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়ে এবং রাজ দরবার হইতে বারবার আকুল আহ্বান আসিতে থাকে তিব্বতী বাবার কাছে।

বাবার হৃদয় অবশেষে করুণার্দ্র হইয়া উঠে এবং ইলোরা প্রাসাদে গিয়া তিনি উপস্থিত হন। তাঁহার প্রদত্ত একটি ভেষজের ক্রিয়ায় মৃতকল্প রাজার ব্যাধি নিরাময় হয় এবং অল্পদিনের মধ্যে তিনি একেবারে সুস্থ হইয়া উঠেন। এই ঘটনার পর দাক্ষিণাত্যের অভিজাত মহলে তিব্বতী-বাবা সুপরিচিত হইয়া উঠেন।

এই সময়ে হায়দ্রাবাদের নিজাম তাঁহার প্রাসাদে সাড়ম্বরে একটি সর্ব্বজনীন ধর্ম্মসভার অনুষ্ঠান করেন। ইলোরার নৃপতির নিকট তিব্বতী বাবার সাধন-ঐশ্বর্য্যের কথা শুনিয়া তিনি এই মহাপুরুষকে তাঁহার ধর্ম্মসভায় সাদর আমন্ত্রণ জানান। ভক্ত ও অনুরাগীদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে বাবা এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং যথাসময়ে সভার মঞ্চে গিয়া উপবেশন করেন।

হায়দ্রাবাদ কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ, স্বনামধন্যা নেত্রী সরোজিনী নাইডুর পিতা, ডক্টর অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ঐ মহতী সভার এক বিশিষ্ট সদস্য। এই সভায় তিব্বতী বাবা কিভাবে অংশ গ্রহণ করেন, কিরূপ সম্বর্দ্ধনা প্রাপ্ত হন, প্রত্যক্ষদর্শী ডক্টর চট্টোপাধ্যায় উহার নিম্নরূপ বিবরণ[১] তাঁহার কলিকাতার বন্ধুদের কাছে দিয়াছিলেন :

নিজাম প্রাসাদে জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে ধর্ম্মসভার অধিবেশন বসিয়াছে। বিভিন্ন বক্তারা নিজ নিজ ধর্ম্ম এবং সমাজের তত্ত্ব ও আদর্শ ব্যাখ্যা করিতেছেন, বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করিতেছেন। কর্ত্তৃপক্ষের অনুরোধে তিব্বতী বাবাকেও একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দিতে হইল। এ ভাষণ যেমনি জ্ঞানগর্ভ তেমনি প্রাণস্পর্শী। সুপ্রাচীন হিন্দু ধর্ম্মের স্বরূপ বুঝাইতে গিয়া বেদান্তের মহিমময় আদর্শ তিনি সর্ব্ব সমক্ষে তুলিয়া ধরিলেন। উদাত্ত কণ্ঠে কহিলেন, 'হিন্দুধর্ম্ম কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মই নয়। এ ধর্ম্ম সনাতন ধর্ম্ম। মানবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদত্ব ও ঐক্য আমাদের সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের কণ্ঠে উদ্‌গীত হয়েছে। সত্য এক, অপরিচ্ছিন্ন এবং অবিভাজ্য—এই বাণী প্রচার ক'রছে বলেই সনাতন ধর্ম্মে অন্য ধর্ম্মের মত স্ববিরোধিতা নেই। আমাদের ধর্ম্ম আরও ঘোষণা ক'রে—অবিদ্যা বন্ধনের হননকারী সেই পরমাত্মাই হংসরূপে বিরাজ করছেন জীবদেহে। যা কিছু ওপরে নীচে, দক্ষিণে বামে, অগ্রে

[১] হিমাদ্রি : তিব্বতী বাবা, ১৮ই ফাল্গুন ১৩৬২ ; ডাঃ কুঞ্জেশ্বর মিশ্র : রামায়ণ বোধ—মুখবন্ধ।

পশ্চাতে রয়েছে, তা তিনিই।—স এবেদং সর্বং। সেই তিনিই সব। আবার সেই তিনিই আমি এবং আমিই সব কিছু। —অহমেবেদং সর্বং। আমাদের ধর্ম্ম নির্ভীকভাবে ঘোষণা ক'রে—আমি আত্মস্বরূপ, আমি স্বাধীন, কাউকে আমার ভয় ক'রার কিছু নেই। শুধু তাই নয়— আমিই অবিনাশী পরম সত্য।'

তেজস্বী মহাসাধকের উদাত্ত কণ্ঠের হুঙ্কারে এবং পরমতম সত্যের নির্ভীক ঘোষণায় সভাকক্ষ গম্ গম্ করিতে থাকে। মন্ত্রমুগ্ধের মত শ্রোতৃবর্গ এই মহাপুরুষের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া থাকে। সভার শেষে নিজাম স্বয়ং তিব্বতী বাবার সম্মুখে আগাইয়া আসেন, বারবার জ্ঞাপন করেন তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম। বহুমূল্য খেলাৎ প্রদানের প্রস্তাবও তিনি উত্থাপন করেন।

তিব্বতী বাবা সহাস্যে উত্তর দেন, "নিজাম বাহাদুর, আপনার এই প্রস্তাবের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু, আমি তো এসব কখনো গ্রহণ করতে পারিনে। সত্যকার সাধু আর গৃহস্থের মানসিকতায় তফাৎ আছে। আপনি যাকে ধনৈশ্বর্য্য বলে মনে করেন আমার দৃষ্টিতে তা যে বন্ধন ছাড়া আর কিছু নয়।"

স্বীয় ভক্তগণসহ তিব্বতী বাবা সভাস্থল ত্যাগ করিলেন, উপস্থিত জনমণ্ডলী এই দৃপ্ততেজা মহাপুরুষের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল।

মাদ্রাজ অঞ্চলে কিছুদিন কৃপালীলা বিস্তার ক'রার পর তিব্বতী-বাবা উত্তর ভারতে চলিয়া আসেন। নৈমিষারণ্য, অযোধ্যা প্রভৃতি পুণ্যতীর্থ দর্শনের পর কাশীধামে আসিয়া উপস্থিত হন।

তিলভাণ্ডেশ্বর মন্দিরের সম্মুখস্থ জনবিরল গলিটিতে আপন মনে সেদিন পাদচারণা করিতেছেন, হঠাৎ পথরোধ করিয়া দাঁড়ান ব্রহ্মচারী-বেশী এক ভীমকায় সাধক। প্রণাম নিবেদনের পর যুক্তকরে কহেন, "বাবা, আমি মুমুক্ষু হয়ে দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আপনাকে

দেখে আমার প্রতীতি জন্মেছে, আপনিই আমার চিহ্নিত সদ্‌গুরু। কৃপা ক'রে আমায় দীক্ষা দিন, এ জীবন সফল হোক্।"

পথ চলিতে চলিতে ভ্রু কুচ্‌কাইয়া স্বভাবসিদ্ধ কঠোর স্বরে তিব্বতী-বাবা কহিলেন। চোখে দেখেই সদ্‌গুরু চিনে ফেল্‌লে? তুমি যে বাবা খুব বাহাদুর! দীক্ষা-শিক্ষা নেবার আগেই তার ফল আয়ত্ত করেছো, শক্তি অর্জ্জন করে ফেলেছো?"

"আমার চোখ দিয়ে নয়, চিনেছি আপনারই মত এক শক্তিধর মহাত্মার চোখ দিয়ে। কয়েকদিন আগে হিমালয় অঞ্চলে পরিব্রাজন করছিলাম। সেখানে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে ঐ মহাত্মার সঙ্গে যোগাযোগ ঘট্‌লো। তিনিই বলে দিলেন,—'তাড়াতাড়ি কাশীধামে গিয়ে উপস্থিত হও। পৌঁছবার পরের দিনই দর্শন পাবে তোমার নির্দ্দিষ্ট গুরুর। চিনে নিতে কষ্ট হবে না।' তারপর চেহারার বর্ণনাও দিলেন। তা হুবহু এখানে আপনার সঙ্গে মিলে গেল। তাইতো কৃপা ভিক্ষা চাইছি।"

"উত্তম কথা। কিন্তু বাঘের সঙ্গে লড়াই করার সখ হঠাৎ মিটে গেল কেন?"

"বাবা, আপনি সর্ব্বজ্ঞ। হিংস্র বাঘের সঙ্গে খালি হাতে দিনের পর দিন লড়াই করেছি নিছক একটা জৈব আনন্দের নেশায়। সে নেশা আমার কি ক'রে একদিন কেটে গেল। বনের বাঘ ছেড়ে এখন মনের বাঘকে পর্য্যুদস্ত করতে চাচ্ছি। কিন্তু এর কৌশল তো আমার জানা নেই।"

"বনের বাঘই ভালো ছিল রে। মনের বাঘকে বাগ মানানো অনেক বেশী কঠিন। জানিস তো, বায়ু জয় করে মনকে বশ করতে হয়—এই বায়ু তো বাঘ নয়—সিংহ। একেবারে বশে এলো তো সিদ্ধির কোঠায় চলে গেলি। বশে না এলে, অনেক সময় এর হাতেই দিতে হয় প্রাণ বিসর্জ্জন।"

"সেই জন্যেই তো আপনার মত শক্তিমান ও সুদক্ষ কর্ণধারের স্মরণ নেওয়া।"

"শিষ্যের কর্ণ খুব কষে ধরতে হয় মাঝে মাঝে। তখন পালাবি না তো ?"

"আজ্ঞে না, চরণে একবার ঠাঁই দিয়ে দেখুন না।"

"ভয় নেই, তোর হবে। আর ঠিক জায়গাতেই তুই এসেছিস্। হিমালয়ের যে মহাত্মার কথা বলছিস, তাঁর সব খবর আমার জানা আছে। আমি জানতাম, তাঁর নির্দ্দেশ পেয়ে তুই এখানে আসছিস্। এতক্ষণ এখানে তোরই অপেক্ষা করছিলাম।"

সাধনকামী এই মুমুক্ষুর নাম শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। বাড়ী ঢাকা জেলায়। দৈহিক শক্তি, পরাক্রম ও সাহসের দিক দিয়া তিনি ছিলেন অতুলনীয়। বন্য ব্যাঘ্রের সহিত মল্লযুদ্ধ লড়িবার বিস্ময়কর ক্ষমতা তিনি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। নিজের সার্কাস পার্টি ছিল, শ্যামাকান্ত তাহা নিয়া নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, অসামান্য শৌর্য্য ও মনঃশক্তি দেখাইয়া দেশ বিদেশের দর্শকদের করিতেন বিস্ময়ে অভিভূত।

সার্কাসের বেষ্টনীর মধ্যে শুধু-হাতে বুক ফুলাইয়া তিনি বন্য ব্যাঘ্রের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইতেন, বজ্রের মত মুষ্ট্যাঘাতে ঐ হিংস্র প্রতিদ্বন্দ্বীকে করিতেন পর্য্যুদস্ত। ভীমকর্ম্মা পুরুষের পরাক্রম দেখিয়া জনসাধারণ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইত, জ্ঞাপন করিত স্বতঃস্ফুর্ত্ত অভিনন্দন।

উত্তর ভারতের বহু নগরে সহস্র সহস্র দর্শকের সম্মুখে এই অদ্ভুত লড়াই শ্যামাকান্ত দেখাইয়া বেড়াইয়াছেন।

অবশেষে হঠাৎ একদিন শ্যামাকান্ত তাঁহার মল্লজীবনে ছেদ টানিয়া দেন, ঘর সংসার ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়েন মুক্তিসাধনের পথে।

নানাস্থানে পরিব্রাজনের পর সেবার হিমালয়ের পাদদেশে এবং সিদ্ধপীঠে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। এক প্রাচীন মহাত্মা রাস্তার ধারে ঝুপড়ি বাঁধিয়া সেখানে তপস্যা করেন। পথ চলিতে চলিতে তাঁহার দিকে শ্যামাকান্তের দৃষ্টি পড়িল, তখনি নিকটে গিয়া করজোড়ে প্রণাম করিলেন।

স্মিতহাস্যে মহাত্মা কহিলেন, "সাবাস্ বেটা, দেহে তুই কি বিপুল শক্তিই না ধারণ করতিস্।"

"আজ্ঞে, তা কিছুটা ছিল বৈকি"—সবিনয়ে নিবেদন করেন মহাবলী শ্যামাকান্ত।

"এখনো সে-শক্তির কতটা অবশিষ্ট আছে বল্ তো ?

"তা বাবা, অপর যে কোন মানুষের চাইতে বেশী আছে, তাতে আর সন্দেহ কি ?"—এতদিনের বল ও বলদর্প শরীর ও মন হইতে দূরীভূত হয় নাই। পূর্ব্ব অভ্যাস এখনো কিছুটা বর্ত্তমান। শ্যামাকান্ত সেই অভ্যাসবশতঃ বক্ষ প্রসারিত করিয়া বীরদর্পে ঋজু হইয়া দাঁড়াইলেন।

আসনের পাশেই ছিল কন্দমূল খনন করার একটি বৃহৎ চিমটা। ঐ চিমটাটি উঠাইয়া নিয়া প্রাচীন তাপস সজোরে উহা মৃত্তিকায় বিদ্ধ করিলেন। মুচকি হাসিয়া কহিলেন, "দেহের শক্তির গর্ব্ব করছো, তা বেশ, কিন্তু বাবা এই চিম্‌টেটা একবার টেনে তোল দেখি।"

এ আবার কি একটা কথা ! আগাইয়া গিয়া অবজ্ঞাভরে শ্যামাকান্ত চিম্‌টাতে হস্তার্পণ করিলেন, টানিয়া তুলিতে গিয়া হইলেন মহা বিস্মিত। ভূমিতলে মাত্র কয়েক ইঞ্চি উহা প্রোথিত হইয়াছে, কিন্তু সজোরে বারবার আকর্ষণ করিয়াও উত্তোলন করা যাইতেছে না। মল্লবীরের জীবনে এমনতর করুণ অভিজ্ঞতা আর হয় নাই। একি অদ্ভুত এবং অবিশ্বাস্য কাণ্ড !

বহুক্ষণ টানাটানি করার পর শ্যামাকান্ত গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উঠিলেন, আর চিম্‌টাটি পূর্ব্ববৎ প্রোথিত রহিয়া গেল মৃত্তিকার অভ্যন্তরে।

মহাত্মার চোখে মুখে দুষ্টামিভরা হাসির আভা। স্নেহপূর্ণ স্বরে কহিলেন, "বেটা, তা হলে দেখছো, তোমার দেহের শক্তিটা কত নগণ্য। আর এই নিয়ে কত গর্ব্বই না এতদিন তুমি করতে।"

"প্রভু, আমায় মার্জ্জনা করুন। আর কৃপাও করুন এই সঙ্গে। আপনার অলৌকিক শক্তির কাছে আমার এই দেহের শক্তির মূল্য আর কতটুকু ? একথা আমার অজানা নয়। তবে সংস্কার বড় প্রবল, সহজে

নিশ্চিহ্ন হতে চায় না। আমার প্রার্থনা, আপনি আমায় আপনার চরণের দাস ক'রে নিন। সন্ন্যাস-দীক্ষা ও সাধন দিয়ে মুক্ত করুন।"

উত্তরে মহাত্মা জানাইয়া দেন, শ্যামাকান্তের নির্দিষ্ট গুরু তিনি নন, তাঁহার গুরু বর্তমান সময়ে অবস্থান করিতেছেন বারাণসীতে। গুরুর চেহারার বর্ণনা দিয়া তিনি আরো কহিলেন, দর্শনমাত্রেই তাঁহাকে চিনিয়া নেওয়া শ্যামাকান্তের পক্ষে কঠিন হইবে না।

মহাত্মার নির্দেশমতই অচিরে তিনি তাঁহার গুরু তিব্বতী বাবার সন্ধান পান এবং তাঁহার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। এই আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষের কাছে শ্যামাকান্ত সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করিলেন এবং ১৮৯৯ সালে দীক্ষা দানের পর তিব্বতী বাবা তাঁহার নব নামকরণ করিলেন—সোহংস্বামী।

সন্ন্যাস নিবার পর শুরু হয় সোহংস্বামীর তপস্যার পালা। গুরু প্রদত্ত মন্ত্রচৈতন্যের বলে দেখা দেয় তাঁহার জীবনে এক অপূর্ব্ব ধ্যান-তন্ময়তা। তাঁহার এই ধ্যানস্থ ভাব একাদিক্রমে থাকে প্রায় ছয়মাস ব্যাপিয়া।

জনচক্ষুর অন্তরালে একটি নিভৃত কুটিরে বসিয়া চলিতে থাকে সোহংস্বামীর কঠোর তপস্যা। নবদীক্ষিত শিষ্য একসময়ে নিজের আহার নিদ্রার কথাও বিস্মৃত হইয়াছিলেন। এ সময়ে পুত্রাধিক স্নেহে তিব্বতীবাবা তাঁহার খাওয়া-পরা এবং রক্ষণা-বেক্ষণের ব্যবস্থা করিতেন, এমন কি শিষ্যের শৌচক্রিয়ার পর মলমূত্রাদিও তিনি নিজহাতে করিতেন পরিষ্কার।

ছয়মাস অতিবাহিত হইলে শিষ্যকে হাত ধরিয়া টানিয়া উঠাইয়া কহিলেন, "শালা, আমি কি তোর মেথর? আর কতকাল তোর খিদমৎ করবো। যা, অনেকদূর এগিয়েছিস্, এবার তুই নিজের পথ ছাখ্। আমিও চলি আমার ইচ্ছে মত।"

সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া সোহংস্বামী কহিলেন, "গুরুদেব, আপনার বিচ্ছেদে কষ্ট হবে ঠিকই, কিন্তু এটাও আমি জানি, আপনার বিধান

আমার পক্ষে কল্যাণকরই হবে। কিন্তু যাবার আগে নির্দ্দেশ দিন, আমার ভবিষ্যৎ দিনচর্য্যা কিভাবে চলবে।"

গুরুগম্ভীর স্বরে তিব্বতী বাবা কহিলেন, "শোন্ তবে। জীবনের সব কিছু প্রতিষ্ঠা, সব কিছু মায়া-মোহ ছেড়ে বেরিয়েছিস আত্মজ্ঞান লাভের জন্য। এজন্য নিরন্তর চাই আত্মচিন্তন। শক্তি-বিভূতি সব অগ্রসরমান সাধকের জীবনেই আসে, ও নিয়ে কখনো মাথা ঘামাবি না। এগিয়ে যা—শুধু এগিয়ে যা।"

"কোথায় বসে তপস্যা ক'রবো। কি ভাবে জীবন-ধারণ করবো, সে নির্দ্দেশও যে আপনার কাছে চাই।"

"গোড়ায় নৈমিষারণ্যে গিয়ে কিছুদিন সাধন ভজন কর্। তারপর হিমালয়ের কোথাও ডেরা বেঁধে বসে পড়্। আর ছাখ্, সন্ন্যাসীরা প্রায়ই ভিক্ষা-গ্রহণ নিয়ে বেশী বাড়াবাড়ি ক'রে, ওটা ক'রবি না। যাবার আগে তোকে আমি কয়েকটা দুশ্চিকিৎস্য রোগের ঔষধি বাৎলে দেবো, তাতে লোকের প্রাণ বাঁচবে, আর তোর জীবিকার ভাবনাও তেমন ভাবতে হবে না।

গুরুর নিকট হইতে শেষ উপদেশ ও ঐ সব ঔষধির সন্ধান নিয়া সোহংস্বামী বারাণসী ত্যাগ করেন। কয়েক মাস নৈমিষারণ্যে সাধন-ভজনের পর প্রস্থান করেন হিমালয়ের দিকে। উত্তরকালে সাধনরত অবস্থায় নৈনিতালের সন্নিহিত শৌঠিয়াগাঁও স্থিত নিজ আশ্রমে তাঁহার দেহপাত হয়।

বারাণসী অঞ্চলে একদল ভক্তকে কৃপা বিতরণের পর তিব্বতী বাবা কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন। এই মহানগরী ও ইহার নিকটস্থ অঞ্চলে বহু মুমুক্ষু ও রোগ-শোকে আর্ত্ত নরনারী তাঁহার আশ্রয় নিয়া কৃতার্থ হয়।

কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া তিব্বতী বাবা মাঝে মাঝে অন্যান্য অঞ্চলে ভ্রমণ করিতে যাইতেন। এই সব স্থানের মধ্যে মধুপুর তাঁহার অত্যন্ত

প্রিয় ছিল। মধুপুরে থাকাকালে প্রতিবেশী সতীশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাবার খুব স্নেহভাজন হইয়া উঠেন। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় একজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মনেতা এবং তীক্ষ্ণধী সাংবাদিক। মহাপুরুষের অন্তরঙ্গতা লাভ করিয়া তাঁহার ব্যক্তিত্ব, জীবনদর্শন এবং দিনচর্য্যা সম্বন্ধে বিচার-বিশ্লেষণ করার যথেষ্ট সুযোগ তিনি পাইয়াছিলেন।

লেখককে তিনি বলিয়াছেন, "তিব্বতী বাবার চেহারায়, আচার-ব্যবহারে এবং চলন বলনে সব সময়ে ফুটে উঠতো অপূর্ব্ব ব্যক্তিত্ব আর স্বাধীন ভাব। তাঁর কথাবার্ত্তা ও দার্শনিক আলোচনা শুনে মনে হতো তিনি বুঝি নিরীশ্বরবাদী বা শূন্যবাদী বৌদ্ধ। অথবা এমনি ধরণের কোন সাধক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। আসলে ঈশ্বর সম্পর্কে তিনি মৌন থাকতেই পছন্দ করতেন এবং সাধন বিষয়ে আত্মচিন্তনকে দিতেন সর্ব্বাপেক্ষা বড় স্থান।"

এই মহাপুরুষের জীবন-দর্শনের আর একটি দিক হইতেছে জন-কল্যাণ। জটিল ও দুশ্চিকিৎস্য কত রোগ যে তিনি নিরাময় করিয়াছেন, কত মৃতকল্প মানুষের মুখে হাসি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। এ প্রসঙ্গে সতীশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন, "বাবার প্রতিভার অপূর্ব্ব স্ফুরণ দেখা যেতো দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসায়। দ্রব্যগুণের উপর ছিল তাঁর অসামান্য অধিকার। যে কোন রোগী একবার তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করলেই জ্ঞানপন্থী কঠোরী সাধক তখনি সমবেদনায় গলে পড়তেন। দরিদ্র রোগীর চিকিৎসা ব্যয়সাধ্য হলে পাশে দাঁড়ানো ধনী ভক্তকে হুকুম দিয়ে তখনি করে দিতেন তার ব্যবস্থা। ঔষধের উপকরণরূপে তিব্বতী বাবাকে কখনো কখনো ব্যবহার করতে দেখা যেতো কৃষ্ণ ষাঁড়ের চর্ম্ম, বাদুরের মাংস, মহিষের শৃঙ্গ প্রভৃতি অদ্ভুত ধরণের উপকরণ। একবার এক কুষ্ঠরোগী বাবার কাছে এসে শরণ নিলো। আর্ত্তস্বরে কাঁদতে শুরু করলো। বাবা করুণায় গলে গেলেন। তখনি বাজার থেকে আনা হলো একটা বড় হাঁড়ি। কতকগুলো দুষ্প্রাপ্য ঔষধি সহ ষাঁড়ের মাংস তাতে পূরে দিলেন। তাঁর নির্দ্দেশ মত মাটির

নীচে এটিকে চাপা দিয়ে রাখলেন শিষ্যেরা। কয়েকদিন পরে এই হাঁড়ি উঠানো হলো—ওষুধের পচা গন্ধে যেন ভূত পালায়। এই ওষুধ কিছুদিন ব্যবহার করে ঐ কুষ্ঠরোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করেছিলো।"

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—"সব দেখে শুনে আমার মনে হয়েছে, রোগ নিরাময়ের ব্যাপারে তিব্বতী বাবা ছিলেন ধন্বন্তরী স্বরূপ। আর তিনি জটিল রোগ-গুলো ভাল করতেন নিছক দ্রব্যগুণের জোরে, তন্ত্রমন্ত্রের প্রভাব থাকলেও আমি তেমন কিছু টের পাইনি।"

ভারতের বৈদ্য-শিরোমণি শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয় তিব্বতী বাবার অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন। শ্রীযুক্ত সতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে লেখক শুনিয়াছেন, বাচস্পতি মহাশয়ের অনুরোধ উপরোধ এড়াইতে না পারিয়া বাবা তাঁহাকে যক্ষ্মা, উদরী, কুষ্ঠ প্রভৃতি কয়েকটি মারাত্মক রোগের অব্যর্থ ঔষধ এবং প্রয়োগ-বিধি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন।[১]

বর্দ্ধমান পালিতপুরে সে-বার তিব্বতী বাবার করুণালীলার এক প্রকাশ ঘটতে দেখা যায়। ভূতনাথ তা' সেখানকার এক ধনী ও গণ্য-মান্য ব্যক্তি। তাঁহার একমাত্র পুত্র তখন দুশ্চিকিৎস্য যকৃতের রোগে আক্রান্ত। রক্তাল্পতা ও প্রবল জ্বরে ভুগিয়া ভুগিয়া রোগী অস্থিচর্ম্মসার হইয়া উঠিয়াছে। অবশেষে প্রবীণ ডাক্তারেরা জবাব দিয়া গেলেন এবং ভূতনাথবাবু ও তাঁহার স্ত্রীর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

তিব্বতী বাবার সহিত সামান্য একটু আলাপ-পরিচয় ছিল, সেই সূত্রে ভূতনাথবাবু ও তাঁহার স্ত্রী এই মহাপুরুষের কাছে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন। চরণ ধরিয়া কহিলেন, "বাবা, যে ক'রেই হোক্ আমাদের

[১] শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয়ের পুত্র, কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ মহাশয় লেখকের শ্রদ্ধেয় বন্ধু। তাঁহার নিকট অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে, তিব্বতী বাবার ঐসব ঔষধিযুক্ত ব্যবস্থাপত্রের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। বলা বাহুল্য, পাওয়া গেলে মানব সমাজের প্রচুর উপকার সাধিত হইত

এই একমাত্র ছেলের প্রাণ-ভিক্ষা দিতেই হবে। নইলে, এখানে আমরা দু'জনেই আপনার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরবো।"

বাবার মন গলিয়া গেল। আর্ত্ত দম্পতির সঙ্গে সেইদিনই তিনি পালিতপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তাঁহার আদেশে রোগীর ঘরে একটি শ্বেতবর্ণের সুস্থকায় মেষশাবক আনয়ন করা হইল। তিনি নিজেও সারা রাত্রি সেখানে রহিলেন, করিলেন একটি গূঢ় তান্ত্রিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান। প্রত্যূষে কক্ষের দ্বার উন্মুক্ত করিতেই সকলে সবিস্ময়ে দেখিলেন, শুভ্র মেষটির সারা অঙ্গ হলুদ্‌বর্ণে রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে। কাহারো বুঝিতে বাকী রহিল না, বালকের মারাত্মক যকৃৎ-দুষ্টি ও কামলা রোগ রাতারাতি সঞ্চারিত হইয়াছে ঐ মেষের শরীরে। মেষটি তখন ভূমিতলে পড়িয়া জ্বরের ঘোরে রহিয়াছে অচৈতন্য।

তিব্বতীবাবার এক ঘনিষ্ঠ ভক্ত এ সময়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। উচিতবক্তা বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। তিনি কহিলেন, "বাবা, যদি কিছু মনে না ক'রেন একটা প্রশ্ন করি।"

"নির্ভয়ে বল্, কি বলবি"

"আচ্ছা বাবা, আপনার যেন অপরিমেয় বিভূতি রয়েছে, কিন্তু তাই বলে একটা মানুষকে বাঁচাতে গিয়ে আপনি ঐ মেষশাবকটাকে মেরে ফেলতে উদ্যত হয়েছেন কেন? আমরা তো বুঝি, আপনার মত আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষের মধ্যে থাকবে সমদর্শিতা—মানুষ আর মেষে ভেদবুদ্ধি থাক্‌বে কেন।"

রুক্ষস্বরে তিব্বতীবাবা উত্তর দিলেন, "মূর্খ, কোন কিছুই বুঝিস্‌নে, আবার ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করতেও তোর জুড়ি নেই। একটু ধৈর্য্য ধরে থাক, টের পাবি সব।"

ক্ষণপরেই দেখা গেল বাবা তীব্র জ্বরের ঘোরে কাঁপিতে কাঁপিতে শয্যায় শুইয়া পড়িলেন। দুই চোখ হরিদ্রা বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। তারপরই তাঁহার দেহে দেখা দিল প্রাণঘাতী হিক্কা রোগ। এই সময়

সকলে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলেন, ভূতলে শায়িত মেষশাবকটি ধীরে ধীরে সুস্থ হইয়া উঠিতেছে।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়া তিব্বতীবাবা তাঁহার স্বাভাবিক দিনচর্য্যা শুরু করিয়া দিলেন। পরে কথা প্রসঙ্গে বলিলেন, "যকৃতের রোগীটার এখন-তখন অবস্থা ছিল। তাই মেষটাকে এরে তাড়াতাড়ি ঠেক্‌না দিতে হয়েছিলো।"

পালিতপুরের জমিদার ধর্ম্মদাস মণ্ডল এবং পূর্ব্বোক্ত ভূতনাথ তা'র চেষ্টা ও অর্থব্যয়ে পালিতপুরে তিব্বতীবাবার জন্য একটি স্থায়ী আশ্রম নির্ম্মাণ করা হয়, নাম দেওয়া হয় প্রজ্ঞামন্দির। এই আশ্রমে বাবা তাঁহার শেষ জীবনের একটি বড় অংশ অতিবাহিত করেন।

১৯৩০ সালের ১৮ই নবেম্বর তারিখে ১৮২ বৎসর বয়সে পালিতপুর প্রজ্ঞামন্দিরে প্রজ্ঞানমন এই মহাত্মা তাঁহার মরদেহ ত্যাগ করেন। ভারতের অধ্যাত্ম-আকাশ হইতে খসিয়া পড়ে এক জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্র।

কাষ্ঠজিহ্ব স্বামী

গহন অরণ্যের ভিতর দণ্ডায়মান এক সুপ্রাচীন দেবদেউল। অশ্বত্থ আর বটের পরগাছা অজস্র ফাটল ধরাইয়া দিয়াছে সারা গায়ে। ধ্বস নামিয়াছে বড় বড় পাথরের। চারপাশ কাঁটা আর জঙ্গলে ভরা। দেখিয়াই মনে হয় দীর্ঘদিন কোন জনমানব ঢোকে নাই এখানে। কিন্তু কুমার মহীপনারায়ণকে সেদিন ঢুকিতে হইয়াছে প্রাণের দায়ে।

মাত্র অল্প কয়েকদিন আগে তিনি আত্মগোপন করিয়াছেন এই দুর্গম বনাঞ্চলে। কিন্তু মনে হয়, সে যেন এক যুগের ব্যবধান!

বারবার মহীপনারায়ণের স্মৃতিপটে জাগিয়া উঠে রামনগরের প্রাসাদ-জীবনের কথা। কি বিলাস ব্যসন ও হুল্লোড়েই না কাটিয়াছে দিনের পর দিন। পিতামহ মহারাজা বলবন্ত সিং-এর স্নেহভরা মুখচ্ছবি কেবলই ভাসিয়া উঠে মানসপটে। বলবন্ত সিং-এর আদরিণী কন্যার একমাত্র পুত্র এই মহীপনারায়ণ। ছোটবেলা হইতে কি গভীর মমত্বের বন্ধনেই না বৃদ্ধ তাঁকে জড়াইয়া রাখিয়াছিলেন। সে সব দিনের সুখস্মৃতি আজ অরণ্যচারী নির্বান্ধব মহীপনারায়ণের মনে হয় স্বপ্নের মত।

কয়েক বছর আগে বলবন্ত সিংজী স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তারপর হইতেই কাশীরাজ্যের গদি নিয়া বাধে তীব্র বিরোধ। চেৎ সিং আর মহীপনারায়ণ—কেউ কাউকে ছাড়িয়া দিতে রাজী নন এই রাজ্যের উত্তরাধিকার। কিন্তু মহীপনারায়ণ নিতান্ত অল্পবয়স্ক, অনভিজ্ঞ। তিনি কি করিয়া আঁটিয়া উঠিবেন পরাক্রান্ত চেৎ সিং-এর সাথে? উৎকোচ-লোভী ওয়ারেন হেষ্টিংসকে হাত করিয়া চেৎ সিং আগেই গদি দখল করিয়া নিয়াছেন, তারপর আবার তাঁহার সাথে ঝগড়া করিয়া এই সেদিন সেই গদি ছাড়িতে হইয়াছেন বাধ্য।

শিবালা-কুঠির সংঘর্ষের পর ইংরেজ সেনার অবরোধ এড়াইয়া চেৎ-সিং নাটকীয়ভাবে গঙ্গায় ঝাঁপ দেন, পলাইয়া যান মাধোজী সিন্ধিয়ার আশ্রয়ে। সেই ঘটনার পর ওয়ারেন হেষ্টিংস ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়াছেন, কাশীর রাজদরবারের উপর হইয়াছেন খড়্গহস্ত।

সেদিন হঠাৎ চর মুখে মহীপনারায়ণ সংবাদ পাইলেন ওয়ারেন হেষ্টিংস নাকি তাঁহার জন্য খুব খোঁজাখুজি করিয়া বেড়াইতেছেন।

বড় ঘাবড়াইয়া গেলেন মহীপনারায়ণ। তবে কি হেষ্টিংস তাঁকে বন্দী করিতে চান? চেৎ সিং-এর ওপর জাতক্রোধ হইয়া প্রতিহিংসা নিতে চান এই তরুণ রাজদৌহিত্রের উপর?

সেই দিনই তিনি প্রাসাদ হইতে গা ঢাকা দেন, পলাইয়া আসেন এই দুর্গম অরণ্যে। ক'দিন হইতে ঐ পুরোণো ভাঙ্গা মন্দিরেই তিনি আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছেন।

কিন্তু আজ তাঁহার মন আরো চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে। খাস মুন্সী কুন্দনলাল খানিক আগে রামনগর হইতে আসিয়াছিল গোপনে দেখা করিতে। সে জানাইয়া গেল, বাজারে গুজব—হেষ্টিংস নাকি বলিয়াছেন, যেমন করিয়াই হোক মহীপনারায়ণকে তাঁহার পাওয়া চাই-ই। রামনগর প্রাসাদে সবাই আতঙ্কিত হইয়া ভাবিতেছেন—কাশীরাজের কোন উত্তরাধিকারীকেই বোধহয় ইংরেজ জীবিত থাকিতে দিবেনা।

মহীপনারায়ণের দুশ্চিন্তার আর অবধি নাই। শেষটায় কি ধরা পড়িয়া খৃষ্টানদের হাতে ফাঁসী যাইবেন? হেষ্টিংসের জোর তল্লাসীর কথা রোজ তাঁহার কাণে আসিতেছে। কবে তার চরেরা এখানে হানা দেয়, কে জানে? এখন হইতে এক জায়গায় আর বেশীদিন থাকা ঠিক নয়। ঐ পুরাতন জীর্ণ মন্দির ত্যাগ করিয়া তখনি মহীপনারায়ণ প্রবেশ করিলেন বনের গভীরতর প্রদেশে।

ক্রোশখানেক আগাইয়া আসিয়াছেন, হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়িল এক বটবৃক্ষের নীচে। ধুনি জ্বালাইয়া ব্যাঘ্রচর্ম্মের ওপর ধ্যানস্থ রহিয়াছেন এক প্রাচীন সন্ন্যাসী। বয়সে বৃদ্ধ হইলেও দেহ এখনো সুঠাম, সমুন্নত।

শিরে বিলম্বিত দীর্ঘ জটাজাল। ধ্যাননিমীলিত নেত্রে নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছেন। মনে হয়, দেহে প্রাণস্পন্দনের চিহ্ন নাই।

মহীপনারায়ণ থমকিয়া দাঁড়ালেন। হিংস্র জন্তু-ও-শ্বাপদসঙ্কুল এই দুর্গম বনে অনন্যনিষ্ঠায় সাধনা করিয়া চলিয়াছেন কে এই সন্ন্যাসী? ভাগ্য-ক্রমে সন্ধান যদি মিলিলই, একবার ইহাঁর আশীর্ব্বাদ নিয়া যাইতেই হইবে।

মহীপনারায়ণের জীবন আজ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে চরম সঙ্কটের মুখে। এ সঙ্কটে কোন যোগবিভূতিসম্পন্ন সাধকের সাহায্য ছাড়া পরিত্রাণ পাইবার আশা নাই। তাই সন্ন্যাসীর ধুনীর কাছে আসিয়া নীরবে রহিলেন অপেক্ষমান। কিছুকাল পরে মহাত্মা নয়ন উন্মীলন করিলেন। মহীপনারায়ণ ভক্তিভরে প্রণাম নিবেদন করিতেই বলিয়া উঠিলেন, "বেটা কুছ চিন্তা মৎ করো। অংগ্রেজোসে কাঁহে ডরতে হো? তুম্‌হারা লিয়ে ফাঁসাকা ফান্‌দা নেহি, রাজমুকুট ধ্রুব নিশ্চিত্‌ হ্যায়। কাল হি তুম উনসে মিলো।"

মহীপনারায়ণ তো বিস্ময়ে হতবাক্‌। এ সন্ন্যাসী কি অন্তর্যামী? ওয়ারেন হেষ্টিংস যে তাঁহাকে পাঁতি পাঁতি করিয়া খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন, আর তিনিও তাঁহাকে এড়াইয়া চলিয়াছেন প্রাণপণে—এসব সংবাদ তো এঁর অজানা নয়!

কিন্তু মনের আতঙ্ক যায়না। ভাবেন, সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া শেষটায় বেঘোরে প্রাণ যাইবে না তো? চেৎ সিং-এর বিদ্রোহের তিক্ত স্মৃতি ইংরেজের মন হইতে নিশ্চয়ই এতো শিগগীর মুছিয়া যায় নাই। যে আহ্বান লিপি ওয়ারেন হেষ্টিংস তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন আসলে কি তাহার উদ্দেশ্য? এ কি সাদর আমন্ত্রণ, না বধ করার এক প্রচ্ছন্ন ফাঁদ?

সন্ন্যাসী বুঝিলেন, মহীপনারায়ণ মহা সংশয়ে পতিত হইয়াছেন। স্মিত হাসি হাসিয়া যাহা বলিলেন তাহার মর্ম: ভাখো বেটা, তোমার অনাগত জীবনের দৃশ্য আমার মনের মুকুরে ফুটে উঠেছে এক ঝলকে। যোগীর এ অতীন্দ্রিয় দর্শন কখনো মিথ্যা হয়না। তুমি কালই চলে যাও

ইংরেজ রাজপ্রতিনিধির আস্তানায়। তাতে তোমার ভালই হবে।

নিজের মন এবার স্থির করিয়া ফেলিলেন মহীপনারায়ণ। সন্ন্যাসীর চরণে ভক্তিভরে প্রণাম জানাইয়া সেই দিনই ফিরিয়া গেলেন রামনগরের রাজপ্রাসাদে।

পরদিন ওয়ারেন হেষ্টিংসের কাছে উপস্থিত হইতেই যে সমাদর ও সম্মান পাইলেন তাহা তাঁহার কল্পনায়ও আসে নাই। তাছাড়া, ইংরেজ-প্রধান জানাইলেন, তিনি স্থির করিয়াছেন যে, পলায়িত চেৎসিংএর স্থলে মহীপনারায়ণকেই দেওয়া হইবে কাশীর রাজসিংহাসন। কাশীনগর এবং আরো কয়েকটা অঞ্চল বাদে চেৎসিংএর গোটা রাজ্যের মালিক হইবেন তিনি।

ওয়ারেন হেষ্টিংস তাঁহাকে আরো জানাইলেন, কোম্পানী বড় উদগ্রীব হইয়াছেন কাশীরাজ্যে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের জন্য। মহারাজা বলবন্ত-সিং-এর কোন উপযুক্ত উত্তরাধিকারীকে গদিতে বসাইয়া দিয়া স্থানীয় জনগণের অসন্তোষ দূর করা হোক্, ইহাই তাঁহারা চান। এই উদ্দেশ্যেই বলবন্তের কিশোর দৌহিত্র মহীপনারায়ণের জন্য এত খোঁজাখুঁজি।

এমনি নাটকীয়তার ভেতর দিয়া ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের এক শুভ প্রভাতে কাশীরাজ্যের অধীশ্বররূপে অভিষিক্ত হইলেন মহীপনারায়ণ।

আনন্দে উৎসবে অতিবাহিত হইয়া গেল কয়েকদিন। তারপর কৃতজ্ঞ চিত্তে তিনি স্মরণ করিলেন অরণ্যচারী সেই প্রাচীন তপস্বীর কথা।

কাশীর নানা অঞ্চলে অনুসন্ধান চালানোর ফলে জানা গেল তাঁহার প্রকৃত পরিচয়। মহাত্মা আত্মারাম তীর্থ নামে উত্তর ভারতের সাধু মহলে তিনি পরিচিত। তিনি মহাশক্তিধর, আর তাঁর কৃপাপ্রাপ্ত শিষ্যদের মধ্যে রহিয়াছেন বহু তিতিক্ষাবান ও জ্ঞানী দণ্ডীস্বামী। তীর্থনগর হইতে দূরে, জনজীবনের কোলাহল এড়াইয়া, দীর্ঘ দিন ঐ গহন বনে তিনি নিরত রহিয়াছেন কঠোর তপস্যায়।

হাতী ঘোড়া লোক লস্কর সঙ্গে নিয়া মহারাজ মহীপনারায়ণ একদিন

উপস্থিত হইলেন সেই বিজন বনভূমিতে। মহাত্মার চরণে ভক্তিভরে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন,—"মহারাজ, আপনার শ্রীমুখের বাণী সত্য হয়েছে। ইংরেজ কোম্পানী আমায় করেছে রাজগদিতে অধিষ্ঠিত। সেদিন আপনার নির্দ্দেশ না পেলে বিড়ম্বিত ভাগ্য নিয়ে, অসহায়ের মত আমায় চির-জীবন ভেসে বেড়াতে হতো। আজ তাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছি। আর এসেছি আপনার আশীর্ব্বাদ ও পরমাশ্রয় পেতে।"

মহীপনারায়ণ ধরিয়া বসিলেন, বৃদ্ধ মহাত্মার কাছে তিনি মন্ত্রদীক্ষা নিবেন। তাঁহার আশ্রিত হইয়া চালাইবেন গুরুভার রাজকার্য্য।

গুরু গম্ভীর স্বরে বলিলেন মহাত্মা, "একি কথা তুমি বলছো, বেটা? আমি অরণ্যবাসী তপস্বী— দীক্ষাদানের ঝামেলায় কেন শুধু শুধু নিজেকে জড়াতে যাবো? তাছাড়া, বেটা, আমিতো কখনো গৃহস্থ মানুষকে দীক্ষা দিইনে। আর তোমার মত রাজরাজড়া হচ্ছে প্রবৃত্তিমার্গের লোক—অত্যধিক বিষয়ী। তাদের শিষ্য করার তো প্রশ্নই ওঠে না। বেটা, দীক্ষাদান বিষয়ে আমি বড় রক্ষণশীল, প্রবীণ সাধুরা সবাই এটা জানে।"

কিন্তু মহীপনারায়ণকে এড়ানো বড় কঠিন। দিনের পর দিন তিনি আসিতে থাকেন এই বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর চরণপ্রান্তে। করুণকণ্ঠে মিনতি জানান, "প্রভু, আপনার কৃপাঘন দিব্যদৃষ্টিই আমায় প্রতিষ্ঠিত করেছে রাজসিংহাসনে। সেই দিব্যদৃষ্টির আশ্রয়ে থেকেই আমি চিরজীবন কাটিয়ে দিতে চাই। কৃপা আমায় করতেই হবে, নতুবা আমার এ জীবন হয়ে যাবে ব্যর্থ।"—বলিতে বলিতে অশ্রুজলে কিশোর মহারাজার বক্ষ প্লাবিত হয়।

কিন্তু মহাত্মার তাহাতে ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই। প্রস্তরমূর্ত্তির মত অটল অচল হইয়া বসিয়া থাকেন। এতকিছু মিনতি ও ক্রন্দন মনে তাঁহার কোন ভাব বৈলক্ষণ্য ঘটায় না।

প্রত্যাখ্যাত হইয়া মহারাজ সেদিন প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কিন্তু দীক্ষা গ্রহণের সঙ্কল্প একেবারে ত্যাগ করিলেন না। ভাবিলেন, বেশ তো, মহাত্মা যদি কিছুতেই দীক্ষা দিতে রাজী না হন, তবে তাঁহার মণ্ডলীর কোন বিখ্যাত সাধক, তাঁহারই কোন অন্তরঙ্গ প্রবীণ শিষ্যকে মহীপনারায়ণ বরণ করিবেন গুরুরূপে।

অনুসন্ধানের ফলে জানা গেল, ঐ মহাত্মার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিষ্য হইতেছেন দণ্ডীস্বামী দেবতীর্থ। অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহাবৈদান্তিক হিসাবে সারা উত্তর ভারতে এ সময়ে তাঁহার প্রসিদ্ধি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বিস্ময়কর মেধা, প্রতিভা ও তর্কশক্তির অধিকারী ছিলেন তিনি। কিন্তু বিদ্যামদে মত্ত হইয়া এই শক্তিকে সদাই ব্যবহার করিতেন নির্ব্বিচারে। সুযোগ পাইলেই বিশিষ্ট সন্ন্যাসী ও আচার্য্যদের তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিতেন, অবলীলায় করিতেন তাঁদের ধরাশায়ী। ইহা ছিল দণ্ডীস্বামী দেবতীর্থের এক আমোদজনক ব্যসন বিশেষ।

দেবতীর্থ স্বামীর এ দ্বন্দ্বপ্রবণতার কথা ক্রমে গুরুমহারাজের কাণে গেল। একদিন তাঁহাকে নিজ সকাশে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, "দেবতীর্থ, তুমি আত্মজ্ঞানী সন্ন্যাসী হতে গিয়ে শেষটায় কি ডাকু বনে গেলে? সাধুসন্ত আর ভগবৎ-রসিক আচার্য্যদের অনর্থক এভাবে ঘায়েল ক'রে যাচ্ছো? এ যে মহাপাপ।"

সেইদিনই প্রিয় শিষ্যের জিহ্বা কণ্ডূয়ন তিনি বন্ধ করিয়া দিলেন। তীক্ষ্ণ ছুরি দিয়া নিজ হাতে তাঁহার জিহ্বার অগ্রভাগ করিলেন ছেদন। তারপর তাহাতে সংযোজিত করিয়া দিলেন কাষ্ঠনির্ম্মিত এক জিহ্বাংশ। দণ্ডীস্বামী দেবতীর্থ সেই সময় হইতে সাধারণ্যে পরিচিত হইলেন কাষ্ঠজিহ্ব স্বামী নামে। তখন হইতে তিনি একেবারে নিশ্চুপ। কাহারো সঙ্গে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া তো দূরের কথা, একেবারে হইয়া গেলেন মৌন। ধীরে ধীরে নিমজ্জিত হইলেন আপন তপস্যার গভীরে। মহাতার্কিক বেদান্তীর ঘটিল অপরূপ রূপান্তর!

মহারাজা মহীপনারায়ণ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে সেদিন ঠিক

করিয়াছেন, এই কাষ্ঠজিহ্ব স্বামীকেই তিনি গুরুরূপে বরণ করিবেন। তাই সেদিন বড় আশা করিয়া উপস্থিত হইলেন এই মৌনী আচার্য্যের সকাশে। যাচ্ঞা করিলেন তাঁহার কাছে মন্ত্রদীক্ষা ও চরণাশ্রয়।

কিন্তু তাঁহাকে রাজী করা বড় সহজ কাজ নয়। মৌনী দণ্ডীস্বামী ঘরের মেঝেতে খড়ি দিয়া লিখিয়া জানাইলেন—বহিরঙ্গ জীবনের সকল পাট তিনি উঠাইয়া দিয়াছেন, একান্তভাবে নিমগ্ন রহিয়াছেন নিজের অধ্যাত্মসাধনায়। তাই কাহারো আচার্য্য হইবার মত মনোবৃত্তি বা রুচি বর্তমানে তাঁহার নাই।

কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িলেন, মহারাজ মহীপনারায়ণ। আকুল হইয়া জানাইলেন "প্রভু, আপনার গুরু মহারাজের কাছে আমি প্রত্যাখ্যাত হয়ে এসেছি। আপনি তাঁর পুত্র-প্রতিম শিষ্য। তাই এবার আমি সঙ্কল্প করেছি—হয় আপনার কাছ থেকে দীক্ষামন্ত্র লাভ ক'রবো, নয়তো গঙ্গাগর্ভে দেবো এই পাপদেহ বিসর্জ্জন।"

এ কান্না আর আর্ত্তি আর যেন থামিতে চায় না।

কাষ্ঠজিহ্ব স্বামীর অন্তর ক্রমে করুণার্দ্র হইয়া উঠে। মহারাজকে শান্ত করিয়া কথা দেন, তাঁহাকে তিনি শিষ্যরূপে গ্রহণ করিবেন।

কয়েক দিন পরের কথা। কাষ্ঠজিহ্ব স্বামী সেদিন গুরুদেবের চরণ দর্শন করিতে আসিয়াছেন তাঁহার সেই অরণ্যাবাসে। সাধনভজন সম্পর্কিত নির্দ্দেশাদি নিবার পর নিবেদন করিলেন, কাশীর মহারাজ মহীপনারায়ণ বড় সজ্জন। ভক্তও বটেন। তিনি কথা দিয়াছেন—রাজাকে দীক্ষা দান করিবেন। এ বিষয়ে গুরুর অনুমতি ভিক্ষা তিনি চান।

রোষভরে গর্জ্জিয়া উঠিলেন বৃদ্ধ মহাত্মা। কহিলেন, "দেবতীর্থ। এ তুমি কি বলছো? শেষটায় দীক্ষা দেবে গৃহস্থকে—ভোগবিলাসের পঙ্কে নিমজ্জিত ঐ রাজাকে? সর্ব্বত্যাগী, নিবৃত্তিমার্গী সন্ন্যাসী হয়ে এ তোমার কি জঘন্য প্রবৃত্তি? এ দীক্ষা দিলে তুমি পতিত হবে!"

কাষ্ঠজিহ্ব স্বামী উত্তরে জানান, "প্রভু, আপনার কথা সবই সত্যি।

কিন্তু রাজার আর্ত্তি আর কান্না দেখে আমার হৃদয় বিগলিত হয়েছিলো, আমি যে তাঁকে কথা দিয়ে ফেলেছি। এখন তা রাখতে না পারলে সত্যভঙ্গের দায়ে পড়বো। সে যে এক মহাপাপ।"

গুরু সংক্ষেপে মন্তব্য করিলেন, "বেশ তো, বেটা। কথা তুমি যখন একবার দিয়েই ফেলেছো, তা রক্ষা ক'রো।"

এবার কাষ্ঠজিহ্ব স্বামী কাঁদিয়া পড়িলেন গুরুর চরণে। গৃহস্থকে, ভোগপরায়ণ রাজাকে মন্ত্র প্রদান করিয়া যে পাপ তিনি করিবেন, কি হইবে তাহার প্রায়শ্চিত্ত? এ পাপ স্খালনের জন্য গুরু মহারাজ যে ব্যবস্থা দিবেন তাই তিনি লইবেন মাথা পাতিয়া।

গুরু মহারাজ খানিকটা কি যেন ভাবিয়া নিলেন। তারপর ধীরকণ্ঠে বলিলেন, "বেটা দেবতীর্থ, রাজা মহীপরায়ণকে দীক্ষাদানের পিছনে তোমার করুণা ঠিকই রয়েছে। কিন্তু তার অন্তরালে আরো রয়েছে তোমার মনের সূক্ষ্ম অহং। আচার্য্যগিরির ইচ্ছা লুকিয়ে আছে অবচেতন মনের গোপন স্তরে। তার মূল এবার উৎপাটন ক'রো প্রায়শ্চিত্তের ভেতর দিয়ে। সে প্রায়শ্চিত্তের বিধি আমি দিচ্ছি। গলদেশে তোমার বেঁধে নাও—এক কাষ্ঠফলক। তাতে লিখে নাও—'আপলোগ হমসে শুন্ লিজিয়ে—দণ্ডীস্বামী দেবতীর্থ পতিত হ্যায়।' কাশীধামের যত মঠ মন্দির, পন্থ ও আখড়া আছে, সব স্থানে গিয়ে দাঁড়াও দীনবেশে এবং গললগ্নিকৃতবাস হয়ে। সবার সামনে তোমার পাপ-কাহিনী প্রকাশিত হোক আর স্খালন হোক সে পাপের।"

বারাণসীর রাজপথে, গঙ্গার ঘাটে ঘাটে, মন্দিরে ও সভাগৃহে সেদিন দেখা গেল এক অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য।

দুর্দ্ধর্ষ তর্কশূর, মহাবেদান্তী দেবতীর্থ স্বামীর জিহ্বা কর্ত্তন করিয়া, তাহাতে কাষ্ঠজিহ্বা সংযোজিত করিয়াও তাঁহার গুরুমহারাজ ক্ষান্ত হন নাই। আজ আবার তাঁহাকে পাঠাইতেছেন—প্রকাশ্যে তাঁর পাতিত্যের কথা ঘোষণা করিতে।

সর্বজনশ্রদ্ধেয় মহাপুরুষ, প্রতাপবান কাশীরাজের গুরু, কাষ্ঠজিহ্ব

স্বামীর আজ একি দুর্দ্দশা ! সবাই বলাবলি করিতে থাকে, কি তাঁহার এমন গুরুতর অপরাধ ?

কাশীর দণ্ডীসমাজ ও সাধু-সন্তদের সম্মুখে কাষ্ঠজিহ্ব স্বামীর এই প্রায়শ্চিত্ত সেদিন উচ্চে তুলিয়া ধরিয়াছিল সন্ন্যাসধর্ম্মের নিষ্কলঙ্ক, ত্যাগপূত, মহান আদর্শ।

কি তাঁহার পাপ ও কলঙ্ক ? না, দণ্ডীস্বামী হইয়া ও সর্ব্ব মায়ামোহ ছিন্ন করার সঙ্কল্প গ্রহণ করা সত্ত্বেও—গৃহীকে, ভোগী রাজাকে, দিয়াছেন তিনি দীক্ষামন্ত্র। ফলে ঘটিয়াছে চরম পাতিত্য দোষ।

সে দিন তাঁহার নির্দ্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্ত সমাপ্ত করিয়া কাষ্ঠজিহ্ব স্বামী যুক্তকরে দাঁড়াইলেন আসিয়া গুরুর সমীপে।

গম্ভীর কণ্ঠে গুরু বলিলেন—"বেটা, পাপ স্খালনের জন্য যা তুমি করলে, তাতে শুধু যে তোমারই উপকার হবে তা নয়, দণ্ডীসমাজেরও সামনে দীর্ঘ দিন উড্ডীন থাকবে সন্ন্যাসের পবিত্র পতাকা। ভ্রষ্টাদর্শ যতিরা থাকবে সশঙ্কিত হয়ে, শির নত ক'রে। কিন্তু বেটা, তোমার প্রায়শ্চিত্ত যে পূর্ণ হ'তে আরো একটু বাকী আছে।"

আবার কোন্ নূতন প্রায়শ্চিত্তের কথা গুরু বলিতে চাহিতেছেন ? কাষ্ঠজিহ্ব স্বামী চিন্তিত হইয়া তাকান তাঁহার দিকে।

প্রশান্ত কণ্ঠে বৃদ্ধ মহাত্মা কহেন, "বেটা, কাষ্ঠফলক গলায় বেঁধে তুমি ঘুরেছো সারা বারাণসীর পথে ঘাটে মন্দিরে। কিন্তু ঐ ফলক-লেখাতো শিগ্‌গীরই জনমন থেকে মুছে যাবে। সে লেখাকে আরো দীর্ঘস্থায়ী ক'রে দাও তুমি। বিশ্বনাথ মন্দিরের প্রস্তর নির্ম্মিত দ্বারে তা উৎকীর্ণ ক'রে রাখো।"

এবার দণ্ডীস্বামী ধীরপদে আসিয়া দাঁড়াইলেন বিশ্বনাথ মন্দিরের তোরণের সম্মুখে। হাতে তাঁহার একটি তীক্ষ্ণ ছেনী। নিজের পাতিত্যের স্বীকৃতি, ভ্রষ্টাদর্শের কলঙ্কময় কথা এই ছেনীর অগ্রভাব দিয়া খোদাই করিয়া দিলেন পাষাণ প্রাচীরের গায়ে। লিখিলেন —"দেবতীর্থ নামে দণ্ডী পতিত্ হায়।"

কালের দীর্ঘ ব্যবধান রচিত হইয়াছে কিন্তু আজো মন্দিরের লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থী কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা নিয়া দেখিয়া যান প্রায়শ্চিত্তকামী এই আচার্য্যের হস্তলেখা। ফটকের প্রবেশ দ্বারের বাঁ দিকের পাষাণ প্রাচীরে, সাড়ে ছয় ফুট উঁচুতে, দেব নাগরী অক্ষরের ঐ ঐতিহাসিক লেখাটি অগণিত মানুষের মনে আজিও তোলে আলোড়ন। ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মাভ্যাসী যে কোন সাধকের মনে নূতন করিয়া জাগাইয়া তোলে ভারতীয় সন্ন্যাসধর্ম্ম ও অধ্যাত্মজীবনের শুচিশুভ্র মহান আদর্শ।

নাঙ্গাবাবা

দারুময় ব্রহ্মবিগ্রহ শ্রীজগন্নাথকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে মহাধাম পুরীক্ষেত্র। যুগ যুগ ধরিয়া ভারতের সর্ব্ব অঞ্চল হইতে এখানে সমাগত হইতেছে তীর্থকামী মানুষের দল। ইঁহাদের মধ্যে যেমনি আছেন ধর্মপ্রাণ ভক্ত গৃহস্থ, তেমনি রহিয়াছেন সর্ব্বত্যাগী সাধু-সন্ন্যাসী ও সিদ্ধ মহাত্মাগণ। সমুদ্রে স্নান তর্পণ ও শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া সবাই আগাইয়া চলেন নিজ নিজ পরিব্রাজনের পথে।

পুরী-তীর্থের নানা স্থানে ছড়ানো রহিয়াছে অজস্র মঠ-মন্দির, আশ্রম, সাধনপীঠ। গির্ণারী-বস্তার নিভৃত নাঙ্গাবাবা মহারাজের আশ্রমটি ইহাদের মধ্যে স্বল্পখ্যাত ও অনাড়ম্বর; কিন্তু এটি যে অনন্যসাধারণ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

লোকনাথ-শিবের আস্তানের সন্নিকটে অবস্থিত এই গির্ণারী-বস্তা। তাল-তমাল-নারকেল বীথির নীচ দিয়া জনহীন জংলা গ্রামপথে আপনি আগাইয়া চলুন, অদূরে সম্মুখে নয়নপথে পতিত হইবে নাতিবৃহৎ এক বালিয়াড়ীর ঢিবি।

দেখিতে নিতান্ত সাধারণ হইলেও দেহাতি স্থানীয় লোকেরা আজো এই ঢিবির প্রাচীন মাহাত্ম্য স্মরণ করিয়া শ্রদ্ধাভরে প্রণাম নিবেদন ক'রে। পৌরাণিক যুগের পুণ্যময় ঐতিহ্য নাকি বহন করিতেছে এই বালিয়াড়ী। দেবাদেশ পাইয়া রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন যখন নীলাচল-নাথকে বালুকাস্তূপ হইতে উদ্ধার করেন, তখন ভূ-গর্ভ খননের বালুরাশির কিছুটা পতিত হয় এই গির্ণারী-বস্তায়। এই ঢিবিটি তাই তাহাদের চোখে এক অসামান্য, পরম পবিত্র বস্তু।

বালিয়াড়ীর উপরে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র অনাড়ম্বর আশ্রম। এই আশ্রমেরই একটি কক্ষে বিরাজমান রহিয়াছেন আত্মজ্ঞানী মহাসাধক নাঙ্গাবাবা। জটাজুট-সমন্বিত মহাকায় সন্ন্যাসী একেবারে দিগম্বর। আজানুলম্বিত বাহুদ্বয় হাঁটুর উপর স্থাপন করিয়া, ব্যাঘ্রচর্ম্মের উপর, সুখাসনে তিনি ধ্যানস্থ। উপবিষ্ট দেহের উচ্চতা, আর একটি দণ্ডায়মান মানুষের উচ্চতায় বেশী পার্থক্য নাই।

অদ্বৈত বেদান্তসিদ্ধির এক মূর্ত্ত বিগ্রহ এই ভীমকায় কঠোরী সন্ন্যাসী, মায়াপাশবদ্ধ জীবের সম্মুখে যেন এক জীবন্ত মোহমুদ্গর !

বাবা ও তাঁহার দুই তিনটি সেবকভক্ত ছাড়া স্থায়ীভাবে আশ্রমে আর কেউ বাস করে না। দর্শনকামী অভ্যাগতের সংখ্যাও অল্প। ভীমদর্শন, স্বল্পভাষী, শুদ্ধ জ্ঞানবাদী এই মহাপুরুষের সম্মুখে কতক্ষণই বা থাকা যায় ? তবুও যদি কেহ কোন সঙ্কল্প নিয়া কক্ষের মেজেতে বসিয়া থাকে, মৃদুস্বরে বাবা বলিয়া উঠেন, "হাঁ-হাঁ, দর্শন হো গিয়া, আভি চলা যাও। সহরমে যা'কর্ মন্দির-উন্দির দেখো।"

তত্রাচ কেহ আসন চাপিয়া বসিয়া থাকিলে তাহার জন্য হয় মহাপুরুষের অন্য রকমের ব্যবস্থা। সেবক-সন্ন্যাসী জ্ঞানানন্দ স্বামীকে এবার তিনি গুরুগম্ভীর গলায় আহ্বান করেন, কহেন "জ্ঞানা, ব্রহ্মজ্ঞানকো কিতাব লে আও।"

আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া জ্ঞানানন্দ পাঠ শুরু করেন বেদান্ত বা পঞ্চদশী। শুষ্ক তত্ত্ববিচার শুরু হইতেই অবাঞ্ছিত দর্শনার্থীরা ধীরে ধীরে বাবার সম্মুখ হইতে সরিয়া পড়ে।

আপাত শুষ্ক এই জ্ঞানতাপসের মধ্যেই আবার এক এক সময়ে ফুটিয়া উঠে অপূর্ব্ব করুণাঘন রূপ। উপযুক্ত আধার ও ত্যাগ-বৈরাগ্যবান মুমুক্ষুর দর্শন পাওয়া মাত্রেই বাবা যেন কৃপা বর্ষণের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠেন।

পুরীধামের শ্মশান, সমুদ্র সৈকত ও গির্ণারী-বস্তার এই ক্ষুদ্র আশ্রম, সবগুলি স্থান মিলাইয়া নাঙ্গাবাবা মহারাজ এ অঞ্চলে অবস্থান করিয়া

গিয়াছেন প্রায় পঞ্চাশ বৎসর। এই সময়ে বাবাকে দর্শনের সৌভাগ্য যাঁহাদের হয়, তাঁহারা সবাই এক বাক্যে বলিয়াছেন—অর্দ্ধ শতাব্দীর ব্যবধানেও এই মহাপুরুষের চেহারার তেমন বিশেষ কিছু পার্থক্য বা পরিবর্ত্তন তাঁহারা লক্ষ্য করেন নাই।

স্থানীয় সাধু সমাজের বিভিন্নপন্থী সাধকেরা—বেদান্তী, যোগী, তান্ত্রিক, বৈষ্ণব—যে দলই হোক না কেন, নাঙ্গাবাবার সম্বন্ধে সবাই পোষণ করিত অসাধারণ শ্রদ্ধা।

উচ্চ কোটির অভ্যাগত সাধু মহাত্মাদের আগমন পুরীতে প্রতি বৎসর কম দেখা যায় না। দল মত নির্ব্বিশেষে ইঁহাদের সবাই নাঙ্গাবাবার প্রতি সম্ভ্রম দেখাইতে ব্যগ্র হইতেন।

কিন্তু স্থানীয় বা বহিরাগতদের কেহই বাবার প্রকৃত পরিচয় তেমন জ্ঞাত ছিলেন না। নিজে তিনি ছিলেন অতিমাত্রায় আত্মগোপনশীল, পূর্ব্বাশ্রম বা বর্ত্তমানের তথ্য উদ্‌ঘাটনে কোনদিনই তিনি আগাইয়া আসেন নাই।

সাধক ও গৃহস্থ ভক্তদের মধ্যে তাই নাঙ্গাবাবা সম্পর্কে সদাই শোনা যাইত চাপা গুঞ্জনময় প্রশ্ন। কে এই মহাশক্তিধর সন্ন্যাসী? কোথায় তাঁহার পূর্ব্বাশ্রম? গুরুকরণ কোথায়? কোন্ সাধনপথ অনুসরণ করিয়া হইয়াছেন তিনি আপ্তকাম? কোন্ কোন্ ভাগ্যবান সাধক হইয়াছেন তাঁহার কৃপাধন্য? বহুজনের ঔৎসুক্য সত্ত্বেও এসব প্রশ্নের জবাব মিলে নাই।

কিন্তু বিধির বিধানে সে-বার এক অপূর্ব্ব যোগাযোগ ঘটে এবং ইহার ফলে বাবার সম্বন্ধীয় তথ্য কিছুটা প্রকাশ হইয়া পড়ে।

১৯৪৯ সালের শরৎকাল। পুরীধামে সে-বার এক ব্রহ্মবিদ্‌বরিষ্ঠ মহাযোগীর আগমন ঘটে। প্রসঙ্গক্রমে সেদিন নাঙ্গাবাবা সম্বন্ধে অন্তরঙ্গ ভক্তমহলে তিনি বলিয়া ফেলেন, "এই মহাত্মার প্রকৃত খবর তোমরা কি জান্‌বে? অদ্বৈত সাধনার উচ্চ শিখরে সদা রয়েছেন সমাসীন। অধ্যাত্ম-

সিদ্ধির যেন এক মৈনাক পর্ব্বত। বিরাট পর্ব্বত—কিন্তু মৈনাকের মতই জলের নীচে লুকিয়ে আছেন—সহজে তাঁর মাহাত্ম্যের পরিমাপ করা কঠিন, স্বরূপ বুঝে ওঠা আরো কঠিন।”

চুপ করিয়া থাকিয়া যোগীরাজ আবার কহিলেন, “আর একটা কথা তোমরা জেনো রাখো—এই নাঙ্গাবাবার দেহ পাঞ্জাবী দেহ, আর ইনিই হচ্ছেন ইতিহাস-খ্যাত মহাবেদান্তী—তোতাপুরী মহারাজ। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে যিনি দীক্ষা দিয়েছিলেন কৃপা ক'রে।”

অন্তরঙ্গ ভক্তেরা তো একথা শুনিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত। সমস্বরে তাঁহারা বলিয়া উঠেন, “আজ্ঞে তাহলে এই মহাত্মার বয়স কত? শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তোতাপুরীজীর সাক্ষাৎ ঘটে ১৮৬২ সালে। তখন পুরী মহারাজের বয়স বোধহয় ষাটের কাছাকাছি ছিল। কারণ রামকৃষ্ণ-জীবনীকারেরা বলেছেন—তোতাপুরীজী প্রায় চল্লিশ বৎসর অদ্বৈত বেদান্তের কঠোর সাধনা করেছিলেন। নাঙ্গাবাবাই যদি তোতাপুরী, তবে তাঁর বয়স এখন নিশ্চয়ই দেড়শ' বৎসর।”

“আরো বেশী—প্রায় আড়াই শ' বৎসর বয়স এঁর হবে।”

“বর্তমান যুগে এই আয়ুষ্কালের কথা আমরা ভাবতেই পারিনে।”

“তা, আশ্চর্য্য হবার কি আছে? এঁর মত বিরাট মহাপুরুষ—যোগ ও বেদান্তে পারঙ্গম, শক্তিধর মহাত্মা হিমাচলের নীচে কমই রয়েছেন। ইচ্ছে হলে এঁরা দেহের ক্ষয়-ক্ষতি ও পরিণতিকে স্তম্ভিত ক'রে দু-পাঁচশো বৎসর বেঁচে থাকবেন, এটা এমন কি অসম্ভব কথা?”

একজন সেবক প্রশ্ন করিলেন, “প্রভু, আপনি যা বল্লেন তা চরম সত্য সন্দেহ নেই। কিন্তু ভাবতে অদ্ভুত লাগে—তোতাপুরী মহারাজ জীবিত রয়েছেন, আর এই শ্রদ্ধেয় পরমগুরুর কোন সন্ধান রামকৃষ্ণ-মণ্ডলীর সাধকেরা জানেন না।”

“পুরী মহারাজ নিজেই ইচ্ছে ক'রে অতীত জীবনের সব অধ্যায়কে জনস্মৃতি থেকে বিলুপ্ত ক'রে দিয়েছেন। কাজেই, কারুর সাধ্য নেই যে তাঁর সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হয়, বা তাঁকে খুঁজে বার ক'রে?”

যোগীরাজ অতঃপর প্রসঙ্গান্তরে চলিয়া যান এবং ভক্তদের বাধ্য হইয়া নিরস্ত হইতে হয়।

নাঙ্গাবাবা মহারাজের বয়স সম্পর্কে আর একটি সাক্ষ্য প্রমাণ এখানে উল্লেখনীয়। ১৯৬০ সালে কাশীর সন্নিহিত বনপুরওয়াস্থিত ব্রহ্মবিদ্ সাধক বীতরাগ-বাবার সহিত লেখকের দীর্ঘকাল ব্যাপী নানা আলোচনা হয়। সেই সময়ে নিজ জীবনের কথা প্রসঙ্গে বীতরাগজী নাঙ্গাবাবা সম্বন্ধে তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা বিবৃত করেন। তিনি বলেন, "আমরা যখন সতের আঠারো বৎসরের নবীন সাধক, নাঙ্গাবাবা তখন বয়সে প্রাচীন এবং কাশীর উচ্চশ্রেণীর মহাত্মারা সবাই তাঁকে খুব সম্মান করতেন। তখনি শুনেছি তাঁর শরীর ছিল পাঞ্জাবী। কাশীতে থাকতে তিনি অবস্থান করতেন দূর শহরতলীতে এবং মাঝে মাঝে নৌকাযোগে সেখান থেকে আমাদের গুরুর আশ্রমে দেখা সাক্ষাৎ করতে আসতেন। সে সময়েও তিনি নাঙ্গা ছিলেন, বিরাটকায় এই শক্তিমান মহাত্মার পাশে আমরা ঘোরাফেরা করতাম, ঔৎসুক্যভরে নির্নিমেষে তাঁর সবকিছু লক্ষ্য করতাম।"

বীতরাগ বাবা উপরোক্ত কথাগুলি লেখককে বলেন ১৯৬০ সালে। কাশীর প্রাচীন এবং প্রত্যক্ষদর্শী লোকদের কাছে শুনিয়াছি, তখন তাঁহার বয়স ছিল ১৯০ বৎসর। এই ১৯০ বৎসরের বৃদ্ধ তাঁহার যৌবনোদ্গমে যে পূর্ণ বয়স্ক মহাত্মা নাঙ্গাবাবাকে দর্শন করিতেন, বর্ত্তমানে তাঁহার বয়স আড়াই শত বৎসর বলা হইলে বিস্ময়ের কিছু নাই।

নাঙ্গাবাবার পরিচয় সম্পর্কে যোগীরাজ সেদিন যে সংবাদটি প্রকাশ করিলেন তাহা বড় চাঞ্চল্যকর। অন্তরঙ্গ মহলে ইহা নিয়া চাপা গুঞ্জন চলিল বেশ কিছু দিন ধরিয়া। শ্রীক্ষেত্রে তপস্যারত কয়েকজন উচ্চকোটির মহাত্মা এবং নাঙ্গাবাবার বিশিষ্ট ভক্তদের কাণেও এ কথা পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না।

আশ্রম-কক্ষের বেদান্ত পাঠ ও ব্যাখা সেদিন সবেমাত্র সাঙ্গ হইয়াছে।

স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে ভক্তদের দিকে তাকাইয়া বাবা কহিলেন, "হমারা একঠো বাৎ তুম্‌লোগ হরবখৎ ইয়াদ রাখো। বেদান্তকা বিচার হ্যায় সব্‌সে বড়িয়া সাধন্। কলিযুগকো লিয়ে ইয়ে সাধন বহুৎ উপযোগী হ্যায়। বেদান্ত এক অচ্ছিওয়ালা সেতু। ইসকো ওপর দেকে এক চুটিভি নদী পার হোনে সক্‌তা।"

অর্থাৎ, আমার একটা কথা তোমরা সব সময়ে স্মরণ রেখো—সকল সাধনার ভেতর বেদান্ত বিচার ও আত্মধ্যানের সাধনা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ। আর কলিযুগের মানুষের জন্য তো এ সাধন সব চাইতে বেশী উপযোগী। প্রকৃতপক্ষে বেদান্ত হচ্ছে একটি চমৎকার সেতু, মানুষ তো দূরের কথা, পিঁপড়েও এর ওপর দিয়ে ভবনদী পার হতে পারে।

একটি ভক্ত সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, "বাবা, আধুনিক কালে বেদান্তে কিন্তু সব চাইতে বড় অবদান রেখে গিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ।"

"হাঁ হাঁ, উহ্‌ বেদান্ত্‌কো প্রচারমে এক বড়া কর্ম্মী থে।"

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে ঐ ভক্তটি কহিলেন, "সে কি বাবা, এ কথা বললে চলবে কেন? স্বামীজী সিকাগো ধর্ম্মসম্মেলনে গিয়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীগুণীর সামনে বেদান্তের জয়ধ্বজা উড়িয়েছেন, পশ্চিম দেশের মাটিতে বেদান্তের বীজ বপন করে গেছেন! এ যে এক বিরাট কাজ?"

স্মিতহাস্যে বাবা মন্তব্য করিলেন, "লেকিন উহ্‌ কর্ম্মকা বীজসে পেঁড় কয়ঠো হুয়া, বাতাও। আত্মজ্ঞানকা লেক্‌চার দেনেসে ক্যা জরুরৎ হ্যায়? অওর উহ্‌ লেকচার সুননেসে ভক্তয়োঁকো আত্মজ্ঞান ক্যায়সে হো জায়গা, ইয়েভি মুঝে সমঝায় দেও।"

"তা বাবা, আপনি যাই বলুন, স্বামীজী এক বিরাট কীর্ত্তি রেখে গেছেন। তাছাড়া, তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ? তিনিও তো এক বিশ্বখ্যাত মহাসাধক। অধ্যাত্মসাধনার উচ্চতম চূড়ায় ছিলেন অধিষ্ঠিত।"

"হাঁ হাঁ, উহ্‌ দেবী কালীকো শ্রেষ্ঠ ভক্ত থে।"

কলিকাতার এক বিশিষ্ট ভক্ত পাশেই উপবিষ্ট ছিলেন। নাঙ্গাবাবাই মহাবেদান্তী তোতাপুরীজী এবং শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহারই নিকট দীক্ষা নিয়াছেন,

এ কথা তিনি শুনিয়াছেন। মনে কৌতূহলের অন্ত নাই। প্রসঙ্গ-কথার সুযোগ নিয়া সোজাসুজি প্রশ্ন করা শুরু করিলেন—

"আচ্ছা, বাবা আপনি কলকাতায় গিয়েছেন? দক্ষিণেশ্বর চেনেন? সেখানে থেকেছেন কখনো?"

উত্তরে বাবা কহিলেন, "সাগরতীর্থকা রাস্তেসে কয় দফে তো ম্যঁয় কলকত্তা গিয়া রহা। দক্ষিণেশ্বরমে ভি একদফে ঠার রহো থে।"

"বাবা, আপনি কি শ্রীরামকৃষ্ণকে সন্ন্যাস দীক্ষা দিয়াছিলেন? দয়া ক'রে কথাটা ভেঙ্গে বলুন তো।"

"ঐছা তো অওর্ গৃহস্থকো ম্যাঁয় দীক্ষা দিয়া হ্যাঁয়। লেকিন সন্ন্যাস কিস্‌কো দিয়া বাতাও।"

ভক্তটি পুনবায় প্রশ্ন করার উদ্যোগ করিতেই নাঙ্গাবাবা মহারাজ তিরস্কারের স্বরে কহিলেন, "ইয়ে, খবর মিলনেসে তুমহারা কেয়া ফয়দা, বাতাও। ব্রহ্মজ্ঞান তুমকো মিল্ জায়গী?"

বাবার এই কঠোর মনোভাব দেখিয়া কৌতূহলী ভক্তেরা চুপ করিয়া গেলেন। আলোচনার গতি এবার আত্মজ্ঞান সম্পর্কিত নানা প্রশ্নের দিকে ধাবিত হইল।

কলিকাতায় কয়েকজনের মুখে নাঙ্গাবাবার সাধন-ঐশ্বর্য্যের খ্যাতি শুনিয়া এক ভক্ত সাধক তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই বাবার সঙ্গে তাঁহার একটি প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া উঠিল। আশ্রমে অবস্থান করিয়া রোজ দুই বেলা তিনি বাবার উপদেশামৃত পান করেন, আর শ্রবণ করেন বেদান্তের ভাষ্য। দিন বেশ আনন্দেই কাটিয়া যাইতেছে।

একদিন ঐ ভক্তটি কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া প্রশ্ন করিলেন—"বাবা আপনার সম্বন্ধে কাণাঘুষায় তো কত কথাই শুনি। আচ্ছা, বলুন তো, আপনিই কি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বেদান্ত সাধনার গুরু—তোতাপুরী মহারাজ?"

বাবার মুখমণ্ডলে কিন্তু কোন ভাববৈলক্ষণ্যই দেখা গেল না। ক্ষণকাল

চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, 'হাঁরে, ইয়ে ছোটিসা বাৎ সুননেকে লিয়ে তুম কলকাত্তাসে ইত্‌নি কষ্ট্‌ কর্‌কে আয়ে হো। ইস্‌ খবর মিল্‌নেসে তুম্‌হারী কুছ ফয়দা হোগা ?"

আশ্রমের বিশিষ্ট উড়িয়া ভক্ত ভজুবাবু, বর্ত্তমানের স্বামী সুন্দরানন্দ, বড় উদ্যোগী ও কর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি। একবার অপর কয়েকটি ভক্তের সহিত মিলিত হইয়া তিনি স্থির করিলেন, বাবার একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী সঙ্কলন করিতে হইবে। বাবা তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের বিগত অধ্যায়গুলিকে বিস্মৃতির অতলে নিমজ্জিত রাখিয়াছেন। মোটামুটি তথ্যাদি তাঁহার মুখ হইতে জানিতে পারিলে বড় সুবিধা হয়। সাহস সঞ্চয় করিয়া বাবার নিকট এ প্রস্তাব তাঁহারা পাড়িলেন। বাবার গুরু গম্ভীর কণ্ঠের উত্তর শোনা গেল, "হাঁ-হাঁ, হমকো তুমলোগ জীব সম্‌ঝো তো জীব্‌নী লিখো, কোই হরজা নেই।"

আত্মজ্ঞানের আলোকস্তম্ভরূপে যিনি সদা দীপ্যমান, শিবত্বে যিনি চির প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাকে জীবজ্ঞান করা এবং তাঁহার জীব-জীবনের তথ্য সঙ্কলন করার মধ্যে কোন যৌক্তিকতাই নাই—একথাই তিনি সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিলেন।

আত্মজ্ঞানী মহাসাধকের মুখে সেদিন ঐ উক্তিটি শুনিয়া ভক্তদের চৈতন্যোদয় হইল। তাঁহারা উপলব্ধি করিলেন, ব্রহ্মবিদ্‌ মহাত্মাদের লৌকক জীবনের সত্যকার ইতিবৃত্ত রচনা করা সম্ভব নয়, সম্ভব শুধু খাঁটি ও প্রত্যক্ষদর্শী ভক্তদের অভিজ্ঞতা হইতে অলৌকিক ও করুণাঘন রূপের একটা রেখাচিত্র অঙ্কন করা।

একবার কোন ভক্ত লঘু হাস্যপরিহাসের সুযোগে নাঙ্গাবাবাকে জিজ্ঞাসা করেন, "আচ্ছা বাবা, কত লোকে আপনার সম্বন্ধে বিশ্বাস্য অবিশ্বাস্য কত কথাই বলে। সে যাই হোক্‌, আমার একটা তীব্র কৌতুহল হয়েছে আপনার সঠিক বয়স জানতে। দয়া করে বলুন তো—আপনার বয়স কত ?

বাবা গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া উত্তর দিলেন, "আত্মজ্ঞানী সাধককো

জনম মরণ কুছ্ হ্যায় ? হমারা তো জনমই নেহি হুয়া। উমর্ ক্যায়সে বাতায়েঙ্গে ?"

চল্লিশ বৎসরেরও অধিক কাল গির্মারী-বস্তার এই আশ্রমে নাঙ্গা-বাবা বাস করিয়া গিয়াছেন। এই সময়ের মধ্যে নিভৃতি-প্রয়াসী মহাত্মা কোনদিনই তাঁহার আশে পাশে ভীড় জমিতে দেন নাই। গুটিকয়েক সাধক সন্ন্যাসী নিয়া আত্মধ্যানে রহিয়াছেন সদা নিমগ্ন।

নাঙ্গা বাবার একান্ত-সেবক ও আশ্রমের প্রাণস্বরূপ ছিলেন স্বামী জ্ঞানানন্দ। ঘরসংসার ও আত্মপরিজন সব ছাড়িয়া বাবার সেবাকেই তিনি ধরিয়া নিয়াছিলেন তাঁহার সাধনার অঙ্গরূপে। তিনি বলিয়াছেন ঃ

আশ্রমে অতিথি হিসাবে মাঝে মাঝে উপস্থিত হইতেন নানা ধরণের সাধু সন্তের দল। ইহাদের মধ্যে দশনামী সন্ন্যাসী যেমন থাকিত তেমনি দেখা যাইত উদাসী কবীরপন্থী প্রভৃতি সাধকদের। উত্তর ভারতের সাধুরা যেমন আসিয়া জুটিতেন তেমনি আসিতেন অন্ধ্র, তামিল ও কেরালার সাধুগণ। বিস্ময়ের বিষয়, বাবা সকলেরই সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতেন তাঁহাদেরই মাতৃভাষায়। ইহা হইতে বুঝা যাইত, দীর্ঘ পরিব্রাজক জীবনে বাবা সারা ভারত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন এবং ঐ সময়ে কতকগুলি ভাষাও তিনি সম্পূর্ণরূপে করিয়াছেন আয়ত্ত।

অতিথিদের আদর আপ্যায়নেও বাবার কোন তারতম্য ছিলনা। নিজে ছিলেন বৈদান্তিক সন্ন্যাসী কিন্তু উচ্চ কোটির অবৈদান্তিক সাধু সন্তের সহিত মিলনে উৎসাহের অভাব কোনদিন দেখা যায় নাই।

নাঙ্গা বাবার প্রথম জীবনের শিষ্যদের কাহাকেও স্বামী জ্ঞানানন্দ এই আশ্রমে আসিতে বা অবস্থান করিতে দেখেন নাই।

বাবা প্রয়োজন বোধে দীক্ষা এবং সন্ন্যাস কিছু সংখ্যক সাধনকামীদের দিয়াছেন বটে কিন্তু সাধনপথে একবার প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবার পর আর কোন বাহ্যিক যোগসূত্র তাঁহাদের সহিত রক্ষা করেন নাই। শক্তিধর গুরুর একটু স্পর্শ, একটু কৃপাই হয়তো ছিল ঐ নবীন সাধকদের পক্ষে

যথেষ্ট। অথবা মায়ামোহ-নির্ম্মুক্ত আত্মজ্ঞানী এই মহাসন্ন্যাসী নিজ শিষ্যদের সম্পর্কেও বুঝি ছিলেন নির্লিপ্ত ও নিরাসক্ত।

পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিককাল নাঙ্গাবাবা মহারাজ পুরী অঞ্চলে বাস করিয়া গিয়াছেন। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী প্রবীণ সাধক লেখককে বলিয়াছেন,—এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বাবা মহারাজের একই চেহারা বরাবর তাঁহারা দেখিয়াছেন, এই বিরাট পুরুষের দেহরেখায় বয়োবৃদ্ধির কোন চিহ্ন ফুটিয়া উঠে নাই।

পুরী তীর্থবাসের গোড়ার দিকটায় নাঙ্গাবাবা অবস্থান করিতেন সাগরসৈকতস্থিত শ্মশানের এক প্রান্তে। উলঙ্গ, সুগম্ভীর মহাপুরুষ প্রায়ই থাকিতেন আপন মনে ধ্যানস্থ ও সমাহিত। এ সময়ে দুই চারিটি স্থানীয় ভক্ত তাঁহার সেবা যত্নের ভার নিয়াছিলেন।

সারাদিন ধ্যানস্থ থাকিয়া অপরাহ্নে বাবা এক সের দুধ ও দুইটি ডাব আহার্য্যরূপে গ্রহণ করেন। মধুসূদন গোয়ালার কুটির শ্মশানের কাছেই। প্রত্যহ বিকাল হইলে এক ভাঁড় দুধ নিয়া ভক্তিভরে বাবার সমীপে সে উপস্থিত হয়। সঙ্গে থাকে বালক পুত্র বংশীধর। বাবার জন্য রোজ সে এক জোড়া গন্ধপুষ্পের মালা আনয়ন করে, সযত্নে তাঁহার গলায় পরাইয়া দিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণতি জানায়।

বালক বংশীধর জন্মান্ধ। দরিদ্র হইলেও মধুসূদন গোয়ালা পুত্রের চক্ষুর চিকিৎসায় জন্য চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। কিন্তু সব চেষ্টাই হইয়াছে ব্যর্থ। ডাক্তারেরা শেষ কথা বলিয়া দিয়াছেন,—দৃষ্টিশক্তি পাইবার তাহার আর কোন আশা নাই।

বংশীধর রোজই নাঙ্গাবাবার সকাশে উপস্থিত হয় এবং মহাপুরুষ তাহাকে আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপনও করেন। কিন্তু অধিকাংশ সময়ে নিমীলিতনেত্র থাকায় বাবার দৃষ্টি তাঁহার চক্ষু দুইটির উপর পড়ে নাই। সেদিন মধুসূদন পুত্রকে শিখাইয়া দিয়াছে, বাবাকে মালা ও প্রণাম নিবেদন করিয়াই সে যেন তাহার অন্ধত্বের কথা জানায়, প্রার্থনা করে আরোগ্য লাভের জন্য।

সেদিন অপরাহ্ণে পিতার নির্দ্দেশক্রমে বংশীধর তাহাই করিল। আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদিয়া কহিল, "বাবা, আমি জন্মান্ধ, আমি বড় দুঃখী। আপনি স্বয়ং ভগবান—আপনি একবার চোখ মেলে আমার দুর্দ্দশা দেখুন, আমায় কৃপা করুন। আপনি ছাড়া আমার আর কোন আশ্রয় নেই।"

নাঙ্গাবাবা চোখ মেলিয়া চাহিলেন। মনের দুয়ার সে সময়ে সৌভাগ্যক্রমে খোলা ছিল। ক্রন্দনরত বংশীধরের অন্ধ নয়ন দুটির দিকে তাকাইতেই করুণায় বিগলিত হইয়া গেলেন। ব্যাকুল কণ্ঠে মহাপুরুষ বলিয়া উঠিলেন, "হাঁরে, তুম আঁখ তো খুলো। দেখো, আভিসে তুম অন্ধা নহি, পুরা দৃষ্টি তুমহারা আঁখমে আ গয়া।"

"হ্যাঁ বাবা, তাইতো তাইতো!"—বিস্ময়ে আনন্দে বংশীধর চীৎকার করিয়া উঠে। দুই চোখে তাহার ঝরিতেছে আনন্দাশ্রু, আর বলিতেছে,—"কি সুন্দর! কি সুন্দর! যা কিছু দেখছি সবই অপূর্ব্ব সুন্দর!"

জন্মান্ধ বংশীধরের ঐ আনন্দ কোন চক্ষুষ্মানেরই উপলব্ধিতে আসিবেনা। চির অন্ধকারের যবনিকা টুটিয়া সূর্য্যালোকের কমল ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার দুই নয়নে। মহাকাশের নিঃসীম বিস্তার, নীল দিগন্তের হাতছানি, আর সাগর উর্ম্মির ছন্দোময় নৃত্য তাহার সম্মুখে সৃষ্টি করিয়াছে নূতন মায়াময় পৃথিবী।

বংশীধর আনন্দে কখনো হাসিতেছে, কখনো কাঁদিতেছে। কখনো বা নাঙ্গাবাবার চরণতলে পড়িয়া দিতেছে গড়াগড়ি।

এই অত্যাশ্চর্য্য যোগবিভূতি প্রত্যক্ষ করিয়া মধুসূদন গোয়ালা করজোড়ে অবাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, মুখ দিয়া একটি শব্দ তাহার বাহির হইতেছে না।

একটা বড় গোরে মালা বংশীধরের মাথার উপর ছুড়িয়া দিয়া বাবা স্মিতহাস্যে কহিলেন, "হাঁ—হাঁ, তুম আভি ঘর চলা যাও। কাল অওর অচ্ছি মালা লে কর্ আও!"

কয়েক বৎসর পরে নাঙ্গাবাবা দক্ষিণ ভারত পরিব্রাজনে বাহির হন এবং ফিরিয়া আসিয়া পুরীর সমুদ্রতটে আসন গ্রহণ করেন এক নূতন

স্থানে। ১৯২০ সালে ফ্ল্যাগস্টাফের কাছে, কাশিমবাজারে ভবনের সম্মুখে বালুকার উপর তিনি অবস্থান করিতে থাকেন। দারুণ গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে বালুরাশিতে যখন পা রাখা যাইত না, তখনো দেখা যাইত, বাবা-মহারাজ নির্বিকার চিত্তে বিশাল বপুটি উত্তপ্ত বালুতে এলাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত আরামে শয়ন করিয়া আছেন। প্রচণ্ডতম ঝড় ও ঘুর্ণিবায়ুর মধ্যেও অন্য কোথাও তাঁহাকে আশ্রয় গ্রহণ করানো যাইত না। নীচে বালুকাময় সৈকত ভূমি ও উর্দ্ধে সীমাহীন আকাশ, এই দুই-এর মধ্যে আত্মজ্ঞানী শিবকল্প মহাপুরুষ আপন মহিমায়, আপন অলৌকিক ও দুরবগাহ অস্তিত্ব নিয়া থাকিতেন বিরাজমান।

সাগর-তটের প্রায় প্রবেশ দ্বারের মুখেই নাঙ্গাবাবা মহারাজের আসন। তীর্থদর্শন ও প্রমোদ ভ্রমণের জন্য যাহারাই পুরীতে আসে এই পথ দিয়া যাতায়াত করে। বিশালবপু জটাজুট-সমন্বিত, উলঙ্গ সন্ন্যাসীকে প্রণাম নিবেদন করিয়া তাহারা চলিয়া যায়।

প্রত্যক্ষদর্শী প্রবীণ ভক্ত শ্রীকুমুদবন্ধু সেন এসময়কার একটি ঘটনার বিবরণ দিয়াছেন।[1] পুরীর পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ইতিমধ্যে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে বাবার বিষয়ে রিপোর্ট প্রেরণ করেন। প্রকাশ্য দিবালোকে সাধু একেবারে নগ্ন অবস্থায় বসিয়া থাকেন, ইহা দেখিতে যেমন বিসদৃশ, ভদ্র-রুচির বহির্ভূত, তেমনি আইনবিরুদ্ধও বটে। বিশেষ করিয়া বেলা-ভূমিতে পর্য্যটক সাহেব-মেমরাও মাঝে মাঝে বেড়াইতে আসেন, সব কিছুর ফটো তুলিয়া থাকেন। কাজেই সাধুকে ঐ স্থান হইতে অপসারণ করাই সমীচীন।

ম্যাজিষ্ট্রেট ইতিমধ্যেই নাঙ্গাবাবার বিবরণ শুনিয়াছেন। কয়েকদিন আগে তাঁহার স্ত্রী বাবাকে দর্শন করিতে যান এবং ভক্তি-শ্রদ্ধায় আপ্লুত হইয়া ফিরিয়া আসেন। বন্ধু-বান্ধব মহল হইতেও বাবার সম্পর্কে নানা শ্রদ্ধাপূর্ণ উক্তি শুনিতে পাওয়া যায়। অবশেষে ম্যাজিষ্ট্রেট একদিন স্বয়ং এ ব্যাপারে তদন্ত করিতে গেলেন। গৌরকান্তি বিরাটকায় মহাত্মা

[1] উজ্জীবন, পৌষ, ১৩৬৯ : পুরীধামে ন্যাংটাবাবা—কুমুদবন্ধু সেন

সর্ব্বত্যাগী মহাদেবের মত বসিয়া আছেন। এমন ভাবে আসন করিয়া বসিয়া আছেন যাহাতে নিম্নদেহের নগ্নতা ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। উজ্জ্বল দুইটি চোখের দিকে চাহিলেই শির আপনা হইতে নত হইয়া আসে। আসনের সম্মুখে যে ভক্তেরা বসিয়া আছেন, এই শক্তিধর মহাপুরুষের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধার সীমা নাই।

দর্শনমাত্রেই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব মুগ্ধ হইয়া গেলেন। প্রণত হইলেন বাবার চরণে।

স্নেহপূর্ণ স্বরে বাবা কহিলেন, "হমারা মায়ী, আপকো জেনানা, তো ইঁহা আয়ী থী। লেড়কাকো ইম্তেহান থা। উহ্ অচ্ছিসে পাশ করেঁ—ইসিকে লিয়ে মুঝে বহুত আরজ কী থী। লেড়কা তো বহুত আচ্ছাসে পাশ কিয়া গয়া—না ?"—অর্থাৎ, আমার মায়ী—তোমার স্ত্রী—এখানে এসেছিলো। আমায় ধরে পড়েছিলো—ছেলে পরীক্ষা দিচ্ছে, তার ফল যেন ভাল হয়। সে তো খুব ভাল পাশ করেছে, তাই না ?

ম্যাজিষ্ট্রেট যুক্ত করে কহিলেন, "হাঁ বাবা। আপনার শুভেচ্ছায় ভালভাবেই সে পাশ করেছে। এবার তাকে পাঠাচ্ছি বাইরে—সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবার জন্যে। সে শিগ্গীরই এখানে পৌঁছে যাবে, কয়েকটা দিন আমাদের সঙ্গে কাটিয়ে রওনা হবে বিলেতের দিকে।"

নাঙ্গাবাবা কিন্তু হঠাৎ একেবারে নীরব হইয়া গেলেন। তাঁহার পুণ্যময় সান্নিধ্যে আরো কিছুক্ষণ কাটাইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট নিজের বাংলোয় ফিরিয়া আসিলেন।

দুই একদিনের ভিতর পুত্রটি পুরীতে পৌঁছিয়া গেল। মাতা পিতার আনন্দ আর ধরে না। এই উপলক্ষে সেদিন ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলোতে গণ্যমান্য লোকদের ভোজে আপ্যায়িত করাও হইল।

পুত্রটিকে নিয়া স্বামী-স্ত্রী পরদিন নাঙ্গাবাবার কাছে উপস্থিত। বিশ বৎসরের স্বাস্থ্যবান, সুন্দরকান্তি যুবক। বাবাকে প্রণাম করিয়া উঠিতেই ম্যাজিষ্ট্রেট আনন্দভরে কহিলেন, "বাবা, এই আমাদের ছেলে। আর কয়েকটা দিন মাত্র আমাদের সঙ্গে আছে, তারপর জাহাজে পাড়ি জমাবে

ইংল্যাণ্ডের পথে। আপনি দয়া ক'রে ও'র মাথায় হাত রেখে একটু আশীর্ব্বাদ করুন।"

নাঙ্গাবাবা কিন্তু নির্লিপ্ত, নিরুত্তর। মনে হয় এ আবেদন তাঁহার কাণে পৌঁছায় নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট ও তাঁহার পত্নী আশীর্ব্বাদের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে থাকিলে মহাত্মা গুরু গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "চার রোজ বীত্ জানে দেও, ইসকে বাদ আও মেরে পাস্।"—অর্থাৎ চার দিন গত হতে দাও, তারপর আমার কাছে এসো।

নাঙ্গাবাবা কেন একথা কহিলেন, তাহা বুঝা গেল না। ম্যাজিষ্ট্রেট ও তাঁহার পত্নী মনকে প্রবোধ দিলেন, হয়তো ইহা মহাপুরুষের একটা খেয়ালীপনা।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বাবার সন্নিধানে বসিয়া থাকার পর তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সবাই সেদিনকার মত চলিয়া আসিলেন।

তৃতীয় দিনের দিনই রাত্রিকালে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের ঐ পুত্রটি আকস্মিকভাবে আক্রান্ত হয় এক দুশ্চিকিৎস্য রোগে। স্থানীয় ডাক্তারদের প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে এবং পরদিনই সে ইহলোক ত্যাগ ক'রে।

এই ঘটনার কথা অল্পকাল মধ্যে পুরীর সর্ব্বত্র রটিয়া যায় এবং বাবার নাম জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়া পড়ে।

ত্যাগ তিতিক্ষা ও বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নাঙ্গাবাবা সব দিক দিয়াই ছিলেন একেবারে নাঙ্গা—ন্যাংটা। গির্ণারী বস্তার ক্ষুদ্র আশ্রমটি স্থাপিত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত 'রমতা সাধু—বহ্‌তা নীর' এই সত্যটি তাঁহার জীবনে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছিল। আসন বিছাইয়া কিছুদিন কোথাও অবস্থান করার পরই হঠাৎ একদিন মহাপুরুষ কোথায় অন্তর্দ্ধান হইতেন, নূতন কোন অরণ্যে, শ্মশানে বা সাগরতটে হইতেন আবির্ভূত।

পুরী সৈকতের আসন ত্যাগ করিয়া সেবার কিছুদিনের জন্য তিনি উপস্থিত হইলেন সাক্ষী গোপালের জনবিরল অরণ্যে। সঙ্গে জুটিয়া গেল

জনকয়েক ত্যাগ তিতিক্ষাবান ভক্ত। বাবা তাহাদের কহিলেন, তিনি সব দিক দিয়াই ন্যাংটা এবং সন্ন্যাসী মানুষ। কোনরূপ কৃচ্ছ্রতেই তাঁহার দেহ বা মনের বিকার নাই। তাঁহার সঙ্গী হইয়া কেন ভক্তেরা এত কষ্ট সহ্য করিবে ?

ভক্তেরা তাঁহাদের সঙ্কল্পে অবিচল। কহিলেন, "বাবা আপনার মত মহাপুরুষের সঙ্গে থাকতে পারবো, এই আমাদের পরম লাভ, পরম আনন্দ। উপবাসী যদি থাকতে হয়, দুঃখ কষ্ট যদি সহ্য করতে হয়, তা হাসিমুখেই সহ্য ক'রবো।"

নাঙ্গাবাবা জানাইয়া দিলেন, কোন কুটিরে বাস করার ইচ্ছা তাঁহার নাই। জঙ্গলের অভ্যন্তরে কোন বৃক্ষতলে তিনি আসন বিছাইবেন এবং দিন রাত সেই আসনে বসিয়াই করিবেন অতিবাহিত। সঙ্গীদের নির্দ্দেশ দিলেন, জঙ্গলের কাছাকাছি স্থানে গাছের গুঁড়ি ও লতাপাতা দিয়া তাহারা যেন নিজেদের জন্য পর্ণকুটির তৈরী ক'রে ও সেখানেই সাধন ভজন করিতে থাকে।

এ অঞ্চলের কিছু সংখ্যক লোক নাঙ্গাবাবাকে চিনে, তাঁহার মাহাত্ম্য জানে। ইঁহাদের মুখে মুখে মহাপুরুষের জঙ্গলে অবস্থিতির কথা রটিয়া যায় এবং দুই চারজন গৃহী ভক্ত তাঁহার সেবার জন্য ভেটও প্রেরণ করিতে থাকে।

সেদিন এক গাড়ী ভর্ত্তি ডাব ভেট আসিয়াছে। সঙ্গীয় একটি ব্রাহ্মণ ভক্ত বাবার বিশেষ স্নেহভাজন। তাঁহাকে ডাকিয়া নির্দ্দেশ দিলেন, "দেখো, ইয়ে সব ডাব তুমহারা কুঠিয়ামে লে যাও। তুমলোগ সব খা লেও! অওর একঠো কাম তুমকো করনে হোগা। মেরে দর্শনকা লিয়ে যো সব আদমী আতা হ্যায়, দু-এক রূপাইয়া উহ্ দে যাতা হ্যায়। ম্যঁয় কভি হাথসে ছুঁতা নহি। উহ্ সব তুমহারা পাশ রাখ দো,—দর্শনকা ওয়াস্তে জো আদমীয়োঁ আতা হ্যায় উহ্ রূপাইয়াসে উসকো খিলা দো। তুমলোগ ভি খানা পিনা করো। তুম লোগোঁকো আরামকে লিয়েই রূপাইয়া আতা হ্যায়।"

"আপনার আদেশ মতই কাজ হবে, বাবা,"—বলিয়া ভক্তটি স্থান ত্যাগ করিতেছেন, এমন সময় নাঙ্গাবাবা আবার তাঁহাকে ডাকিয়া ফিরাইলেন। জানাইয়া দিলেন—দর্শনীরূপে প্রাপ্ত ঐ সব টাকার সঙ্গে যেমন তাঁহার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নাই, তেমনি ঐ টাকার জন্য ভক্তটিকে কোনদিন জবাবদিহিও করিতে হইবে না।

সাক্ষীগোপালের অরণ্য-আবাস কিন্তু বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। একদিন প্রত্যূষে উঠিয়া ভক্তেরা দেখিলেন, কাহাকেও না জানাইয়া বাবা তাঁহার নূতনতর পরিব্রাজনের পথে কোথায় উধাও হইয়াছেন।

১৯২১ সালের মাঝামাঝি সময়ে নাঙ্গাবাবা আবার পুরী অঞ্চলে ফিরিয়া আসেন। অন্তরঙ্গ ভক্তদের মধ্যে আনন্দের সাড়া জাগিয়া উঠে। সবারই একান্ত ইচ্ছা, বাবার জন্য এবার একটি আশ্রম নির্ম্মিত হোক এবং সেখানে তাঁহার আনন্দময় সান্নিধ্য লাভ করিয়া সবাই ধন্য হোক।

আশ্রম-ও-আশ্রয়বিরক্ত মহাপাগল সন্ন্যাসীর সুদীর্ঘ জীবন এতকাল বহিয়া আসিয়াছে বহতা নদীরই মত। এবার সে জীবনে ছেদ পড়িল। শহরের জনবিরল স্থানে ক্ষুদ্রায়তন ও সাধারণ গোছের একটি আশ্রম নির্ম্মাণে তিনি সম্মতি দিলেন। জনবসতির বাহিরে গির্ণারী-বস্তার একটি উচ্চ বালিয়াড়ী নির্ব্বাচিত হইল বাবার আশ্রমের স্থান রূপে। স্থানটির পবিত্র ঐতিহ্য, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জনশূন্যতা দেখিয়া বাবা সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

এবার হইতে বালিয়াড়ী শীর্ষের এই আশ্রমই হইল নাঙ্গাবাবার স্থায়ী আস্তানা। দুই চারিবার গঙ্গা ও নর্ম্মদায় তীর্থ-স্নানের উদ্দেশ্য ছাড়া এই আশ্রম ত্যাগ করিয়া অতঃপর আর বেশী তিনি বাহিরে যান নাই।

সে-বার বাবা সাগর-সঙ্গমে গিয়াছেন। পুণ্যতীর্থে স্নান সমাপনের পর পদব্রজে উড়িষ্যায় ফিরিতেছেন। কলিকাতার কাছে রিষড়ায় আসিয়া এক বৃক্ষতলে আসন বিছাইলেন। মহাকায়, দিব্যকান্তি, শিবকল্প মহা-পুরুষ—একবার তাঁহার দিকে দৃষ্টি পড়িলে নয়ন আর ফিরানো যায়না।

স্থানীয় ধনী জমিদার লালজী সেই পথে কোথায় যাইতেছিলেন, দর্শন মাত্রেই বাবার প্রতি তিনি বড় আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন।

আগাইয়া গিয়া প্রণাম করিলেন। যুক্তকরে কহিলেন, "বাবা, কৃপা ক'রে যদি এ অঞ্চলে এসেই পড়েছেন, চলুন এই অধমের গৃহে। আপনার সেবার সুযোগ পেলে আমরা কৃতার্থ হবো।"

নাঙ্গাবাবার অধরে ফুটিয়া উঠে স্মিত হাসির রেখা। মৃদু গম্ভীর স্বরে যাহা বলেন তাহার মর্ম্ম এই :

—আমি তো বেশ রয়েছি এই বৃক্ষতলে। তোমার ভবনে গিয়ে আমার এমন কি আরাম হবে বলতো ? তোমরা বিষয়ী লোক, বিষয় নিয়ে টানা-হেঁচড়া ক'রে দিনরাত কাটাচ্ছো—এ সব দেখে বরং আমার বিরক্তিই হবে।

"বাবা, আমরা বিষয়কীট, নিজেরা নিজেদের পাপে জ্বলে মরছি। আপনাদের মত সাধু সন্তের সান্নিধ্য পেলে, অমৃতময় কথা শুনলে, প্রাণে একটু শান্তি আসে বৈকি।"

"দ্যাখো, ওসব ছেঁদো কথা ছেড়ে দাও। সাধু সন্তের কথা তো জীবনে অনেক শুনেছো। তার ক'টা মনে রেখেছো, জীবনে করেছো প্রতিফলিত ? উপনিষদে, বেদান্তে সারকথা ঋষিরা সবই বলে গিয়েছেন, গ্রহণ করেছে কয় জন ?"

"তবুও, বাবা সাধুদের পুণ্যময় উপস্থিতিতে তো আমাদের কল্যাণ কিছুটা হয়ই।"

"সাধু মহাত্মাদের গৃহস্থ বাড়ীতে স্থাপন করা,—এ আমি পছন্দ করিনে। এর পেছনে সাধু সঙ্গ লাভের শুভ ইচ্ছা কিছুটা আছে, তা ঠিক। কিন্তু এর চাতে বেশী আছে অহংবোধ।—আমার মস্ত কুঠিতে মস্ত এক সাধু এসে রয়েছেন—এই ভাব। কিছু মনে করোনা, একটা অপ্রিয় সত্য বলছি। বাগান বাড়ী আর রক্ষিতা রাখার মত সাড়ম্বরে সাধু রাখার একটা ঝোঁক পড়ে গেছে আজকাল দেশের বড় লোকদের ভেতর।"

নিজ ভবনের দিকে আঙুল নির্দ্দেশ করিয়া লালজী কহেন, "বাবা আমি কিন্তু তেমন বড় লোক নই।"

"তা যাক্। শোন আমার কথা। তোমাদের এ স্থানটা আমার আমার পছন্দ হয়েছে। কয়েকটা দিন এখানে কাটিয়ে যাবো। কিন্তু তোমার মোকানে আমি থাকবো না। থাক্‌বো, পাশের বাগিচার ঐ জঙ্গলে, বৃক্ষতলে। রোজ দুখানা শুকনো রুটি আর সব্‌জি হলেই আমার চলবে।"

রিষড়ায় নাঙ্গাবাবা কিছুদিন অবস্থান করেন। লালজী এবং তাঁহার পুত্র রাধারমণজী এই মহাপুরুষের সেবা পরিচর্য্যা করিয়া ধন্য হন।

এখানে থাকা কালে একটি দুর্ঘটনার মধ্য দিয়া নাঙ্গাবাবা মহারাজের যোগবিভূতির ঐশ্বর্য্য হঠাৎ একদিন প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

ভোরে উঠিয়া নিজের কৃত্যাদি শেষ করার পর ভক্ত লালজী বাবাকে দর্শনের জন্য বাহির হইলেন। বাড়ীর সীমানার কাছেই ঘেঁটুফুলের এক জঙ্গল। এই জঙ্গলের হাঁটা পথ দিয়া আগাইতেই পা পড়িল এক গোখ্‌রা সাপের লেজের উপর। সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদ্ধ সাপটি ফণা উঁচাইয়া দাঁড়ায়, লালজীর পায়ে মারিয়া বসে প্রাণঘাতী ছোবল।

লালজীর আর্ত্ত চীৎকারে চারিদিকে লোক আসিয়া জড় হয়, ওঝা ও ডাক্তারের জন্য সবাই চেঁচামেচি শুরু করিয়া দেয়। আত্মপরিজনের মধ্যে উঠে কান্নার রোল।

সর্পদষ্ট লালজী কিন্তু এমনতর সঙ্কটে পরিয়াও লক্ষ্যচ্যুত হন নাই। দুই বাহু প্রসারণ করিয়া বাবা-বাবা বলিতে বলিতে ছুটিয়া চলেন জঙ্গলপূর্ণ বাগিচার অভ্যন্তরে—নাঙ্গাবাবা মহারাজ যেখানে রহিয়াছেন উপবিষ্ট। এদিকে গোখরা সাপের তীব্র বিষ দেহে ছড়াইয়া যাইতেছে। বাবার আসন ও ধুনীর কাছে আসিয়াই লালজীর দেহ ঝুপ্‌ করিয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেল। সারা দেহ নীলবর্ণ—মুখ দিয়া ফেনা বাহির হইতেছে, চোখ দুইটি ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হইয়া উঠিল। বাবার আসন ও লালজীর ভূলুণ্ঠিত দেহটি ঘিরিয়া তখন প্রকাণ্ড ভীড় জমিয়া গিয়াছে।

নাঙ্গাবাবার মুখে একটি শব্দ নাই, নিষ্পলক দৃষ্টিতে মুমূর্ষু ভক্তের মুখের দিকে চাহিয়া আছেন।

কয়েক মিনিট এভাবে কাটিয়া গেল। অতঃপর বাবা তাঁহার কমণ্ডলু হইতে সাগরতীর্থ হইতে আনীত পবিত্র বারি লালজীর চোখেমুখে ছিটাইয়া দিলেন। ক্ষণপরে লক্ষ্য করা গেল, মৃতকল্প মানুষটির দেহে জীবনের লক্ষণ ফিরিয়া আসিতেছে। দেহের বর্ণ ক্রমে স্বাভাবিক হইয়া উঠে, সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান তিনি ফিরিয়া পান।

লালজী আগাইয়া আসিয়া বাবার চরণ ধরিয়া স্তুতি করিতে থাকেন, দুই চোখ দিয়া দরদর ধারে ঝরিতে থাকে অশ্রুধারা।

এই অত্যাশ্চর্য্য ও আনন্দময় দৃশ্যে পুলকিত হইয়া জনতা বারবার উচ্চারণ করিতে থাকে নাঙ্গাবাবার জয়ধ্বনি।

লালজীকে প্রবোধ দানের পর বাবা স্নেহভরা কণ্ঠে বলেন, "বেটা, অওর কুছ ডর নেহি। অভি থোরাসা দুধ পী লেও। ঘরমে জা' কর্ বিশ্রাম করো। কাল সুবহ্ মে মেরে পাস্ আ যাও।"

পরদিন প্রাতে দেখা হইতেই বাবা লালজীকে কহিলেন, "আভি তো তুমহারা সমঝ্ মে আ গিয়া—জীবন অ্যায়সা এক স্বপ্নহি হ্যায়। তুমহারা ধন-দৌলৎ, ইত্‌নি বড়া মোকান্, লেড়কা-লেড়কী স্ত্রী—সবকুছ স্বপ্নকে মাফিক ঝুট হ্যায়। এক মুহূর্‌ত্ মে সব টুট জানে লগতা থা। সব কুছ প্রপঞ্চ্ হ্যায়, স্বপ্ন হ্যায়—ইয়ে ইয়াদ রাখনেসে দুখকো নিবৃত্তি হোগা, মোক্ষ্ আ জায়গা তুরন্ত্।" অর্থাৎ, এবারে তো তোমার উপলব্ধিতে এসে গেল—বিত্ত বিষয়, এতবড় বাড়ী, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সব কিছুই স্বপ্নের মত মিথ্যা। এক নিমিষেই তো এ সব টুটে যাচ্ছিলো। যা কিছু দেখছো সবই প্রপঞ্চ, স্বপ্ন। এ তত্ত্বটি স্মরণ রাখলে সকল দুঃখের নিবৃত্তি হবে, মোক্ষও হবে করায়ত্ত।

উপরোক্ত ঘটনার পর নাঙ্গাবাবার যোগবিভূতির খ্যাতি ঐ অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে। নির্জ্জন বাগিচায় এবার হইতে থাকে জন সমাগম। বিরক্ত সন্ন্যাসী অতঃপর এখান হইতে সরিয়া পড়েন।

ভক্ত লালজীর আগ্রহাতিশয্যে রিষড়ায় বাবার জন্য একটি ক্ষুদ্র আশ্রম তৈরী হয়। লাল পরিবারের স্নেহের ডোরে আবদ্ধ হইয়া বাবাকে মাঝে মাঝে পুরী হইতে এখানে আসিতে হইত, স্বেচ্ছাবিহারী মহাপুরুষ ১৯২১ হইতে ১৯২৬ সাল অবধি এখানে কয়েকবার আগমন করিয়াছেন এবং দুই একমাস অতিবাহিত করিয়াও গিয়াছেন। রিষড়ায় থাকার কালে কলিকাতা অঞ্চলের কিছুসংখ্যক ভাগ্যবান ভক্ত নাঙ্গাবাবার সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পাইয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

১৯২৬ সালের পর হইতে বাবার স্থায়ী আবাস হয় গির্ণারী বস্তার আশ্রম। অতঃপর খুব জরুরী প্রয়োজন ব্যতীত এই আশ্রম তিনি ত্যাগ করেন নাই। জনবিরল ক্ষুদ্র আশ্রমটিতে দুই তিনটি নিষ্ঠাবান সেবক সঙ্গে নিয়া বালুকা পাহাড়ের শীর্ষে তিনি অতিবাহিত করিতেন আরণ্যক জীবন। দর্শনের উদ্দেশ্যে সমাগত হইত ভক্ত গৃহস্থ, তীর্থচারী এবং উচ্চকোটির সাধু সন্ন্যাসীর দল। সমদর্শী মহাপুরুষ সবারই উদ্দেশ্যে বিতরণ করিতেন অদ্বৈত তত্ত্ব ও আত্মজ্ঞানের উপদেশ। ত্যাগবৈরাগ্যবান, বেদান্ত সাধনার মূর্ত্ত বিগ্রহ, শিবকল্প এই মহাত্মাকে কেন্দ্র করিয়া বহিয়া চলিত মুমুক্ষা ও পরম কল্যাণের স্রোতধারা।

নাঙ্গাবাবা কহিতেন,—কলিতে মানুষের আয়ু কম। দৃঢ় দেহ বা দৃঢ় মন কোথায়? স্বাস্থ্যহানি ও সাংসারিক নানা দুঃখ দারিদ্র্যে থাকে তারা সদা ক্লিষ্ট, তাই যোগ বা তন্ত্র সাধনা তাদের পক্ষে তেমন উপযোগী নয়। বেদান্ত সাধনার পথে, আত্মানাত্ম বিচারের পথে, ধীরে ধীরে চলার অভ্যাস করাই এ যুগের মানুষের পক্ষে কল্যাণকর। বহুবার বহুসময়ে তাঁহাকে দৃঢ়স্বরে বলিতে শুনা যাইত: বেদান্ত বিচারকা রাস্তে পর একঠো চুটি ভি চল্ যানে সকতা হ্যায়,—বেদান্ত বিচারের পথ অনুসরণ ক'রে একটা ক্ষুদ্র পিঁপড়েও পৌঁছুতে পারে মোক্ষের দ্বারে।

বাবার জ্ঞানগর্ভ উপদেশাবলীর[১] মর্ম্ম কিছুটা এখানে বিবৃত হইতেছে

—ভ্যাখো, মানুষ মাত্রই সুখ চায়, কিন্তু সুখপ্রাপ্তির আসল পথটি

---

[১] বেদান্ত বোধ: সঙ্কলয়িতা—রাধারমণ লাল—পৃঃ ৪-৭

ছেড়ে দিয়ে সে চলে যায় ভুল পথে। আসল সুখ থেকে তাই হয় বঞ্চিত। বাহ্য জগতের, এই বিশ্বপ্রপঞ্চের, সব কিছুই বিনাশশীল। যা বিনাশধর্ম্মী ও পরিবর্ত্তনশীল তা স্থায়ী সুখশান্তি কি করে দেবে? পার্থিব ভোগ্যবস্তু পরিণামে সব সময়ে দুঃখই ডেকে আনে। ভোগ্যবস্তু ছেড়ে দিয়ে ভোগী মানুষটির দিকে একবার তাকাও। ছাখো, সে ক্ষয়িষ্ণু ও বিনাশশীল। নিজের অসহায়তার সম্পর্কে অনুভব, অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ দর্শনের পরও ভোগলিপ্সা তার দূর হয় না।

কয়েকজন মুমুক্ষু ভক্ত সে-বার প্রশ্ন করিলেন, "বাবা, স্থায়ী সুখলাভের জন্য আমাদের কি ক'রা উচিত?"

উত্তর হইল, "স্থায়ী সুখ পেতে হলে সত্যবস্তু কি প্রথমে তা জানতে হবে। সত্য বস্তুকে জানাই তাকে পাওয়া। সত্য স্বয়ং প্রকাশশীল, তাকে দেখবার জন্য অপর কোন প্রদীপের প্রয়োজন হয় না। তবে তোমার নিজের চোখে যে মল আছে তা অবশ্য দূর করতে হবে। দৃষ্টি দোষ দূর ক'র, সূর্য্য বা তার আলোককে অর্থাৎ সত্যকে দেখতে পাবে। নিজের সম্বন্ধেও সত্যের সন্ধানই মূল কথা নিজের সম্বন্ধে সত্য কিভাবে প্রতিভাত হয়? এ সত্য জানিয়ে দেয়, বাহ্য দৃশ্যমান পদার্থমাত্রই জড় এবং আমি অদৃশ্য ও চৈতন্যময়। জড়পদার্থে অহং ভাবনা করলেই তার যে সব দোষ, যেমন জড়তা, ক্ষণস্থায়িত্ব, বিনাশত্ব তা নিজের ভেতর উপলব্ধি করা যাবে। আর চৈতন্যে যদি অহং ভাবনা করা যায় তাহলে ভাবুক হয়ে উঠ্‌বে চৈতন্যের স্বরূপ, হবে সৎ-চিৎ-আনন্দ। আত্মজ্ঞান ছাড়া স্থায়ী সুখ বা আনন্দ হয় না, আত্মকল্পতরুর নীচে আশ্রয় নাও, এ হচ্ছে সর্ব্বসিদ্ধিদাতা। শ্রুতি বলেছেন, এ ছাড়া 'নান্য পন্থা বিদ্যতে।'

—আচ্ছা বাবা, আত্মাকে জানবার উপায় কি?

—আত্মা সর্ব্ব সময়ে সর্ব্বকালে রয়েছেন প্রকাশমান, লোকে তা অনুভব করতে পারে না, কারণ তাদের চিত্তের অশুদ্ধতা রয়েছে। মলিন দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব কি দেখা যায়? সূর্য্যের প্রতিবিম্ব কি তাতে ফুটে ওঠে? সূর্য্য সর্ব্ব সময়ে প্রকাশমান, কিন্তু এই প্রকাশ দেখা যায় শুধু

দর্পণ বা শুদ্ধ সলিলের মত শুদ্ধ বস্তুতেই। অবিদ্যার প্রভাবে চিত্তে মল বিক্ষেপ বা আবরণরূপী ময়লা পড়ে। এ ময়লা দূর ক'রতে হলে ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রীগুরুর মুখে বেদের তত্ত্বমসি ইত্যাদি মহাকাব্য শ্রবণ করতে হবে, তারপর নিষ্ঠাভরে করতে হবে মনন ও নিদিধ্যাসন। এই হচ্ছে বেদচিহ্নিত কল্যাণকর পন্থা।

বাবা বলিতেন, এই প্রপঞ্চময় বিশ্বসৃষ্টিকে স্বপ্নরূপে ভাবলে, ক্ষণস্থায়ী বুদ্বুদরূপে কল্পনা করলে, সাধকের পক্ষে আত্মজ্ঞানের দিকে এগিয়ে চলার সুবিধা হয়।

উত্তর-পাড়ার প্রাক্তন এম-এল-এ, শ্রীধীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় নাঙ্গাবাবার কাছে মাঝে মাঝে যাইতেন। বাবার কিছু তথ্য লেখককে তিনি দিয়াছিলেন। সে-বার যোগদা আশ্রমের এক আমেরিকান সাধুকে সঙ্গে নিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় রিষড়ায় নাঙ্গাবাবার আস্তানায় গিয়াছেন। আমেরিকান সাধুটি প্রশ্ন করিলেন, "দয়া করে বলুন, মানুষের অহংবোধ কি ক'রে যায়? আর এই শরীরে, এই জন্মেই কি মোক্ষলাভ সম্ভব?"

স্নেহপূর্ণ স্বরে, সহজ সরল ভাষায় বাবা এই বিদেশী দর্শনার্থীকে কহিলেন, "সাধনার দুটো প্রশস্ত পথ আছে। একটি হচ্ছে এই জগৎকে স্বপ্নবৎ জ্ঞান করা, মিথ্যা ভেবে চলা এবং ত্যাগ বৈরাগ্যের পথে থেকে কর্ম্মসন্ন্যাস নেওয়া। অপরটি, এই জগৎকে ভগবৎ-স্বরূপ ও ভগবৎ-ময় বলে মনে করা এবং নিষ্কাম কর্ম্মে ব্রতী থাকা। একটি অদ্বৈত, অপরটি দ্বৈত পথ। তবে ভাল ক'রে বুঝে নিতে হবে, কোন্ পথের তুমি অধিকারী।"

"আমরা অহংবোধযুক্ত মানুষ—অজ্ঞান। কোন পথের অধিকারী, তা কি ক'রে বুঝবো।

"সেই জন্যেই তো গুরুকরণ দরকার। তবে মূর্খ অজ্ঞান গুরু নয়, ব্রহ্মবিদ্ গুরু, আত্মজ্ঞানের আলোকে যিনি অভ্রান্তরূপে তোমার জন্ম-

জন্মান্তরের খবর জানবেন। সর্ব্বোপরি এবারকার সাধনায় যিনি পথ দেখাতে পারবেন।”

আসলে নাঙ্গাবাবা ছিলেন বেদান্তের চরমসিদ্ধান্তেরই পক্ষপাতী। অর্দ্ধপথের গোঁজামিল কোনকালেই তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। তত্বতঃ তিনি অদ্বৈত ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের পন্থাকেই মুমুক্ষুদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতেন, আর প্রাধান্য দিতেন কর্ম্মসন্ন্যাসকে। তাঁহার মতে, আত্মজ্ঞান-সাধনার দুইটি দিক আছে। একটি অন্তরঙ্গ, অপরটি বহিরঙ্গ।

ব্রহ্মবিদ্ গুরুর অধীনে থাকিয়া ত্যাগবৈরাগ্যময় জীবনে মহাবাক্য শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনই অন্তরঙ্গ সাধন। এই সাধনের পরম্পরা যথাক্রমে--বিবেক, বৈরাগ্য, ষট্ সম্পত্তি, (শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধান) মুমুক্ষুত্ব, 'তৎ' পদ 'ত্বং' শব্দের অর্থ সাধন, শ্রবণ মনন এবং নিদিধ্যাসন।

আর আত্মজ্ঞানের বহিরঙ্গ সাধনা অনুসৃত হয় দুইটি পন্থায়—নিষ্কাম কর্ম্মে এবং নিষ্কাম উপাসনায়।

বেদান্তের সূক্ষ্মতত্ত্ব ও সাধনক্রম সম্বন্ধে যাহাই বলুন না কেন, সৎ এবং মুক্তিকামী সাধারণ গৃহস্থের জন্য বাবার ব্যবস্থা ছিল সহজতর। বলিতেন, “গৃহস্থ মানুষ যদি মোক্ষের দ্বার উন্মুক্ত করতে চায় তবে তিনটি বিষয়ে তাকে অগ্রণী হতে হবে। সে তিনটি হচ্ছে—সদ্‌গ্রন্থ ও শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ, সৎসঙ্গ এবং সদ্‌গুরুর উপদেশ অনুযায়ী সাধন।

অন্তরঙ্গ পরিবেশে সাধ্য-সাধন তত্ত্বের কথা নাঙ্গাবাবা অনেক সময় এমন সহজ সরল ভাষায় ও আন্তরিকতার সহিত বিবৃত করিতেন যে, ভক্তদের হৃদয়ে তাহা স্থায়ীভাবে গাঁথা হইয়া থাকিত। একদিনের এই কথোপকথনের কথা শ্রীরাধারমণ লালের ভাষায় আমরা উদ্ধৃত করিতেছি[১] :

“আমরা একবার পুরীধামস্থ গির্ণারী পাহাড়ে বসিয়া তাহার মনো-

[১]বেদান্তবোধ : নাঙ্গাবাবার উপদেশাবলী : পৃ-১০

মুগ্ধকর পরম রমণীয় সৌন্দর্য্য দেখিতেছি। দক্ষিণে তরঙ্গমালা সমন্বিত বঙ্গোপসাগর, পূর্ব্বে পুরীর শ্রীমন্দির, উত্তরে শাখা যমুনা নদী এবং পশ্চিমে উচ্চাবচ তরঙ্গায়িত বালুকারাশির উপর নয়নাভিরাম সুন্দর হরিৎ বৃক্ষশ্রেণী মনোমোহন রূপ ধরিয়া আমাদিগকে মুগ্ধ করিতেছিল। শ্রীশ্রীবাবাও বসিয়া আছেন যেন সাক্ষাৎ শিব। আমি বলিলাম—"এই তো আমাদের প্রেয় ও শ্রেয়ঃ। আপনার শ্রীচরণের নিকট নির্ভয়ে আমরা স্বর্গসুখ উপভোগ করিতেছি। প্রকৃতি নির্জ্জন আশ্রমটির মনোহারিত্ব বৃদ্ধির জন্য নানা রূপ ধরিয়া স্থানটিকে সাজাইয়াছেন। কে না চাহিবে যে, এই সুন্দর পরিবেশের মধ্যে সে অমর হইয়া থাকে ও সর্ব্বদা আপনার শ্রীচরণ সেবার সৌভাগ্য পায়?

"উত্তরে বাবা বলিলেন—যিনি সৃষ্টির প্রকৃত তত্ত্ব ও রহস্য জানিয়াছেন, একমাত্র আত্মানুভবী সেই মহাপুরুষই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ পাইয়া থাকেন ও সে আনন্দ পাইবার তিনি অধিকারী। তোমরা অভিনয় দেখিয়া থাক। জানিও—অভিনয় ও অভিনেতা দুই-ই মিথ্যা। অভিনেতা জানেন যে, তিনি হরিশ্চন্দ্র নন্; কিন্তু অভিনেতা নিজে এবং দর্শকরূপে তোমরা, যখন করুণ দৃশ্য আসে তখন করুণায় এবং ভয়ঙ্কর দৃশ্য আসিলে ভয়ে অভিভূত হইয়া থাক—কাহারও মনে থাকে না যে, ইহা অভিনয়। নিজেকে সদাই অভিনয়-দ্রষ্টা বলিয়া মনে ক'র। যেমন আমি আমার কৈলাসে বসিয়া আছি, পাশে আমার অক্ষয়বট বৃক্ষ। নীচে সংসারের জীবেরা যখন মাথায় নিজের বাঁধা মোট লইয়া অতিকষ্টে হাঁটিতে থাকে, তখনই দেখিয়া হাসি এইজন্য যে, ইহারা মোট নিজেই বাধিয়া তাহা বহিতে গিয়া কেমন কাতর হইতেছে। এই জন্য সংসারী লোকের কোথাও সুখ-শান্তি পাওয়া বড় কঠিন, কারণ তাহারা উহা নিজেরাই চায় না।"

আত্মিক সাধনার যে উচ্চতম শিখরে আরূঢ় থাকিয়া নাঙ্গাবাবা জগৎপ্রপঞ্চের অলীকত্ব ঘোষণা করিতেন, সংসারকে স্বপ্নরূপে, অভিনয়-

রূপে দেখিবার উপদেশ দিতেন, সংসারী মানুষের পক্ষে তাহা ধারণা করা সহজ নয়। এ সম্পর্কে প্রকৃত জিজ্ঞাসুরা আধারভেদে বাবার নিকট হইতে সাধন সম্পর্কে নানা মূল্যবান উপদেশ প্রাপ্ত হইতেন।

কুমুদবন্ধু সেন সে-বার বাবাকে দর্শনের জন্য গির্ণারী বস্তার আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন। কথা প্রসঙ্গে শুরু হইল সাধনতত্ত্বের কথা। শ্রীযুক্ত সেন লিখিতেছেন[১]—"আমি বলিলাম—ভগবান লাভ কিসে হয়? নাঙ্গাবাবা উত্তরে বলিলেন,—তুমি সেই ব্রহ্মের কোলে বসে আছো। আর তিনি তোমার অন্তরে হৃদয় পদ্মে বসে আছেন। আমি বলিলাম—একবারে কি তা হয়? আপনি কত যোগ তপস্যা করেছেন।"

"তিনি উত্তরে বলিলেন,—সেই সব করেই তো বলছি। কলিযুগে, বিশেষত বাঙ্গালীর শরীরে, যোগ প্রাণায়াম করতে গেলে অসুস্থ হয়ে পড়বে। সিদ্ধাইর ওপর ঝোঁক আসবে। আমি এত সব করেই তো তোমায় এ কথা বলছি।"

"আমি বললাম,—ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, এই তো বেদান্তে বলে। তিনি বলিলেন, তোমার এত লম্বা লম্বা কথার দরকার কি? যা বললাম, তা কর, যেটা সহজ পথ। ওসব সম্বন্ধে যখন ধারণা হবে তখন ওসব বুলি ঝেড়ো।"

"আমাকে আরও বলিলেন,—"দেখ্‌ছি তোমার গুরুকরণ হয়েছে। সেই ইষ্টমন্ত্র জপ করবে। সেই ইষ্টই ব্রহ্ম। তাঁর কোলে বসে আছো। তোমাকে ব্রহ্মানন্দরস পান ক'রতে দেবেন। আর তোমার হৃদয়পদ্মে তিনি আসীন হয়ে রয়েছেন।"

প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দুপুর। শ্রীযুক্ত সেন সেদিন রৌদ্রে তাঁতিয়া পুড়িয়া আসিয়াছেন, জল তৃষ্ণাও খুব পাইয়াছে। নাঙ্গাবাবা তখনি সেবক-ভক্ত জ্ঞানানন্দজীকে কাছে ডাকিলেন, কহিলেন, "তাড়াতাড়ি একে একটা ডাব দাও।"

[১]উজ্জীবন : পুরীধামে ন্যাংটা বাবা, পৌষ, ১৩৬৯

সেবক ভক্তটি আদেশ পালনে মোটেই উৎসাহ দেখাইতেছেন না, যুক্তকরে নীরবে দাঁড়াইয়া আছেন।

বিরক্ত হইয়া বাবা কহিলেন, "ব্যাপার কি? তুমি কি আমার কথা শুনতে পাওনি?"

"আজ্ঞে তা নয়, আসল কথা আশ্রমের ভাড়াঁরে মাত্র একটি ডাবই অবশিষ্ট আছে। সেটি আপনার জন্যই রেখে দেওয়া হয়েছে।"

ব্যস্তসমস্ত হইয়া শ্রীযুক্ত সেন বলিয়া উঠেন, "সে কি বাবা, একটি মাত্র ডাব রয়েছে, আপনি খাবেন। আমি কখ্‌নো তা খাব না। আমার এমন কিছু দরকারও নেই।"

বাবা এ কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তখনি তাঁহার হুকুমমত সেই ডাবটিই তৃষ্ণার্ত্ত সেন মহাশয়কে পরিবেশন করা হইল।

কথাপ্রসঙ্গে কিছুকাল অতিবাহিত হইয়া গেল। তারপর দেখা গেল—বালিয়াড়ীর নীচে গেটের সম্মুখে ডাব বোঝাই-করা একটি গরুর গাড়ী। গাড়ীর মালিক এখানকার এক সম্পন্ন গৃহস্থ। ত্রস্তপদে সে উপরে উঠিয়া আসে, নাঙ্গাবাবাকে প্রণাম করিয়া করজোড়ে নিবেদন করে, "বাবা, আমার বাগিচায় বহু নারকেল গাছ রয়েছে। একটি গাছে চিহ্ন দিয়ে রেখে মানৎ করেছিলাম, এবার তাতে প্রথম যে ফল হবে তা আপনার আশ্রমের জন্য দেবো। তাই নিয়ে এসেছি, আপনি এগুলো দয়া করে গ্রহণ করুন।"

বাবা তাহাকে আশীর্ব্বাদ জানাইয়া তখনি জ্ঞানানন্দজীর কাছে পাঠাইয়া দিলেন—যেন প্রসাদ দেওয়া হয়। এবার সেন মহাশয়ের দিকে তাকাইয়া মুচ্‌কি হাসিলেন। শান্তস্বরে কহিলেন, "প্রত্যক্ষ করলে তো, আসলে আমরা সবাই ব্রহ্মের কোলেই অবস্থান করছি। আমাদের লালন পালনের ভার রয়েছে তাঁরই ওপর। কিন্তু আমাদের লালচ্ বেশী, অহংবোধ বেশী, তাই তো তাঁর সব কিছু ব্যবস্থা ওলট-পালট করে বসি। আমাদের সব কিছু দুঃখকষ্ট হচ্ছে নিজেদেরই সৃষ্টি। ব্রহ্মের ওপর যে

একান্তভাবে নির্ভর করে থাকে, তাঁর কাছে আত্মসমর্পন করে, তার কষ্ট হবে কেন ?"

আত্মজ্ঞান সাধনার উপদেশ নাঙ্গাবাবা যতই দিন, যোগ বিভূতি বা সিদ্ধাইর বিরুদ্ধে যতই কঠোর মন্তব্য করুন, তাঁহার লীলাময় জীবনেও বিভূতির ঐশ্বর্য্য কম প্রকাশ পায় নাই। গির্ণারী বস্তার আশ্রম স্থাপনের পূর্ব্বে যেমন তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া অলৌকিক ঘটনা বহু ঘটিয়া গিয়াছে, পরবর্ত্তী যুগেও ইহার কমতি দেখা যায় নাই। বারবার আর্ত্ত সংসারী মানুষের করুন ক্রন্দন ও মিনতি বাবার হৃদয়ে জাগাইয়াছে করুণার স্পন্দন, অবতরণ ঘটাইয়াছে কল্যাণ-প্রবাহের।

সেদিন আশ্রমকক্ষে ভক্তদের সঙ্গে বাবা কথোপকথনে রত। এমন সময়ে কঙ্কালসার, রুগ্নদেহ এক উড়িয়া গ্রামবাসী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। দুরারোগ্য গ্রহণী রোগে সে ভুগিতেছে। ভক্তিভরে প্রণাম নিবেদনের পর উঠিয়া দাঁড়াইতেই বাবা সমবেদনার সুরে প্রশ্ন করিলেন, "কিরে, তোর খবর কি ?"

রোগীটি আর্ত্তকণ্ঠে কহিল, "বাবা, আর এ কষ্ট সহ্য করতে পারছি নে। যা খাই পেটে কিছুই থাকে না, এমন কি জল-সাবুও আজকাল আমি আর খেতে পারিনে।"

"তাই তো রে, বড় কষ্টেই পড়েছিস্। তা এখানে এসেছিস কেন ? আমি কি ডাক্তার যে রোগ ভাল করবো ? হয় ডাক্তারের কাছে যা, ভাল করে ওষুধপত্র খা—নয়তো চলে যা লোকনাথ শিবজীর মন্দিরে।"

"বাবা ডাক্তারদের চেষ্টা শেষ হয়েছে। তাঁরা বল্লেন, এ গ্রহণী রোগ আর সারবে না। তাইতো আপনার কাছে শরণ নেওয়া। যা হয় আপনি এর একটা বিহিত করুন।"

"আমি কি করবো রে ? এ যে কালব্যাধি। শিবজীর চরণামৃত ছাড়া যাবে না। রোজ এক ঘটি ক'রে ওখানকার চরণামৃত খাবি, তাতেই হবে।"—আশ্বাস দিয়া বাবা আবার কহিলেন, "ভয় নেই তোর। ওতেই সেরে যাবে। বুঝলি, ভয় নেই।"

কুমুদবন্ধু বাবু কাছেই দাঁড়াইয়া আছেন। কহিলেন, "বাবা, যোগ-বিভূতির সাহায্যে রোগ ভাল করা তো আপনি পছন্দ করেন না, অথচ এর প্রাণ বাঁচানোর জন্য আপনাকে তো সেই সাহায্যই নিতে হলো।"

নাঙ্গাবাবা মুচ্‌কি হাসিলেন। ভক্তের প্রশ্নটিকে সুকৌশলে এড়াইয়া গিয়া কহিলেন, "ছ্যাখো, দ্রব্যগুণ মানতে হয়। শিবজীর শিরে ভক্তেরা কত রকমের ফুল-চন্দন অর্ঘ্যাদি ঢেলে দেয়, সেই সব মিলিত বস্তুর একটা বিশেষ দ্রব্যগুণ কি নেই?"

কূটতর্ক তুলিয়া বাবাকে অবশ্যই এ সময়ে বলা যাইত—"আপনার নির্দ্দেশ ছাড়া অপর কোন রোগী ঘটি-ঘটি চরণামৃত পান করুক তো, তাতে প্রাণঘাতী গ্রহণী রোগ নিরাময় হয় কি না?"

পুরীর অন্যতম জমিদার কৃষ্ণবাবুর স্ত্রী তুলসী দেবী ছিলেন নাঙ্গা-বাবার অন্যতম ভক্ত। গির্ণারী বস্তায় আশ্রম তৈরী হওয়ার আগে হইতেই এই মহিলা বাবার শরণ নিয়াছিলেন এবং পরবর্ত্তী কালেও দীর্ঘদিন তাঁহার সেবার অধিকার পাইয়া তিনি ধন্য হইয়াছিলেন।

প্রতিদিন ভোর বেলায় একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ে মহিলা ভক্তটি আশ্রমে উপনীত হইতেন। সঙ্গে থাকিত বাবার জন্য এক ভাঁড় দুধ এবং পুজার অর্ঘ্য উপচার। ধূপধূনা গুগগলের গন্ধে সারা কক্ষটি পূর্ণ হইয়া উঠিত; বাবার গলায় পরানো হইত বড় বড় গন্ধপুষ্পের মালা। তারপর ধুনুচী ও পঞ্চপ্রদীপ নিয়া ভক্তিমতী তুলসীদেবী প্রাণ ভরিয়া মহাপুরুষের আরতি করিতেন। এই ধরণের বাহ্য অনুষ্ঠান কোনদিনই বাবার পছন্দ নয়, কিন্তু এই ভক্ত সাধিকার অন্তরের আকুতিকে কোন দিনই তিনি প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন নাই; সুবোধ বালগোপালটির মত তিনি নীরব নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকিতেন; আরতি ও পূজা শেষ হইলে তবে শুরু হইত প্রতীক্ষমান ভক্ত, দর্শনার্থীদের সহিত কথাবার্ত্তা।

সে-বার নাঙ্গাবাবা কাহাকেও কিছু না জানাইয়া পুরীধাম হইতে অন্তর্দ্ধান হইলেন। ভক্তেরা সবাই মহা মর্ম্মাহত। তাঁহারা ভালভাবে

জানেন, বাবা স্বতন্ত্র পুরুষ, যত্রতত্র স্বেচ্ছাবিহার করাই তাঁহার চিরাচরিত রীতি। কিছুকাল পরে আবার হঠাৎ একদিন তিনি আবির্ভূত হইবেন, এই আশায় অন্তরঙ্গ ভক্তেরা দিন গুণিতে থাকেন।

বাবার অদর্শনে কাতর হইয়া সেদিন তুলসী দেবী কিন্তু এক অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া বসিলেন। সঙ্কল্প করিলেন, যতদিন বাবা পুরীধামে প্রকট না হইবেন, তিনি রহিবেন উপবাসী। স্বামীর প্রবোধ বাক্য, নাঙ্গাবাবার ভক্তদের অনুরোধ উপরোধ কোন কিছুই তাহাকে টলাইতে পারে নাই। মাসের পর মাস এই মহিলা ভক্ত দিন যাপন করিতে থাকেন কোন প্রকারের আহার গ্রহণ না করিয়া।

কৃষ্ণবাবু এবং বাবার বিশিষ্ট ভক্তেরা প্রথমটায় তাঁহার এই প্রয়োপবেশন দেখিয়া বড় ভীত হইয়া পড়েন, বিপন্ন বোধ করিতে থাকেন। পরে তাঁহারা বাবার কৃপার উপরই সব কিছু ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন।

পরম বিস্ময়ের কথা, এই মহিলা ভক্তের অনশনব্রত চলে প্রায় দুই বৎসর কাল এবং এই দীর্ঘ সময়ে নাঙ্গাবাবার অলৌকিক কৃপাশক্তিই তাঁহাকে রাখিয়াছিল সঞ্জীবিত।

দুই বৎসরের ব্যবধানে পুরীধামের ভক্তেরা খবর পাইলেন, নাঙ্গাবাবা ভাগলপুরের নিকটে এক জনবিরল অরণ্যে অবস্থান করিতেছেন। কৃষ্ণবাবু তাড়াতাড়ি বাবার সন্নিধানে ছুটিয়া গেলেন, খুলিয়া বলিলেন তাঁহার স্ত্রীর অত্যাশ্চর্য্য অনশনের কথা। মহাপুরুষের হৃদয় গলিয়া গেল, তাড়াতাড়ি তিনি পুরীধামে চলিয়া আসিলেন।

সরাসরি গিয়া উপস্থিত হইলেন মহিলা ভক্তটির গৃহে। স্নেহপূর্ণ স্বরে কহিলেন, "ইয়ে ক্যযসা বাৎ। খানা পীনা একদম কাঁহে ছোড় দিয়া? খা লেও—খা লেও।"

দীর্ঘদিনের অনশন বাবার আবির্ভাবে এবং একটি কথায় ভঙ্গ হইয়া গেল। মহিলা ভক্তটি কোন্ শক্তিবলে এই দুই বৎসর যাবৎ এই অত্যাশ্চর্য্য ধরণের প্রয়োপবেশন করিয়াছেন এবং প্রাণে বাঁচিয়াছেন—

একথা প্রশ্ন করা হইলে বাবা সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, "উস্‌কো বিশ্বাস থে, ইসিকা ওয়াস্তে বিন্‌ পান্‌ ভোজনসে জিন্দা রহা।"

নিজের কৃপা বা যোগ বিভূতির প্রশ্ন এ সম্পর্কে ভক্তদের সেদিন আর তুলিতে দিলেন না।

আত্মজ্ঞান সাধনার প্রথম ধাপ হইতেছে দেহাত্মবোধ লোপের প্রচেষ্টা। যে কোন ভক্ত বা আর্ত্ত ব্যক্তি নাঙ্গাবাবার সমীপে উপস্থিত হইলেই এই কল্যাণকর প্রচেষ্টার দিকে তিনি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন।

সেদিন এক ভক্ত বাবাকে প্রণাম নিবেদন করিতে আসিয়াছেন, সঙ্গে আনিয়াছে ঝুড়ি-ভর্ত্তি রঙীন ফুলের অজস্র মালা। বাবার গলায় এগুলি একটির পর একটি পরানো হইল। এই মাল্যদান পর্ব্ব শেষ হইলে বাবা কহিলেন, "অওর হ্যায় তো দো। লেকিন, সমঝমে রাখো, ইয়ে ভি এক প্রপঞ্চ হ্যায়।"

কেহ ভক্তিভরে হয়তো তাঁহার প্রণাম নিবেদন করিতেছে, স্নিগ্ধ গম্ভীর স্বরে বাবা বলিয়া উঠেন, "হাঁ হাঁ, প্রণাম ক'রো, ইয়ে হাড্ডি মাংসকা দেহকো তো প্রণাম কর্‌ লেও।"

বলা বাহুল্য এই মন্তব্যের মধ্য দিয়া ভক্তের কল্যাণকামী মহাপুরুষ ইঙ্গিত করিতেছেন—তোমার শ্রদ্ধা ও প্রণতি আমার এই হাড়-মাষের খাঁচাতেই নিবদ্ধ রেখোনা—তাকে প্রেরণ ক'র আমার জ্ঞানময় সত্তার দিকে, শিব সত্তার দিকে।

পূর্ব্বে আমরা তুলসী দেবী কর্ত্তৃক বাবার অর্চ্চনা ও আরতির কথা উল্লেখ করিয়াছি। আরো দুই চারিজন একনিষ্ঠ ভক্ত বাবার আশ্রমে নানা উপচার নিয়া উপস্থিত হইতেন, তাঁহার পূজা ও আরতি সম্পন্ন করিয়া বিদায় নিতেন।

প্রবীণ ভক্ত ও আশ্রমিক ভজুবাবুর (বর্ত্তমানের স্বামী শঙ্করানন্দ) অভিলাষ হইল, ঐ ভক্তদের অনুসরণে তাঁহারাও বাবার পূজা আরতি করিবেন এবং ইহা হইবে নিত্যকার এক বিশেষ অনুষ্ঠান।

সন্ধ্যার তরল ছায়া নীল আকাশের গায়ে ছড়াইয়া যায়, বালিয়াড়ীর বালুতরঙ্গের শীর্ষে চিক্ চিক্ করিয়া উঠে দিনান্তের রক্তরাঙ্গা আলো। বিরাটকায় উলঙ্গ মহাসাধক উদাস নেত্রে আপন কক্ষটিতে নীরবে বসিয়া থাকেন। এই সময়ে রোজ আশ্রমিকেরা স্বল্পকালের জন্য হাজির হয় পূজারতির উপচার আর ঝাঁঝর-কাসর-শিঙ্গা-ঘণ্টা নিয়া।

আরতি শুরু হইলেই বাবা মহারাজ তাহা শেষ করার জন্য তাড়া দিতে থাকেন। বাদ্য যন্ত্রগুলি লক্ষ্য করিয়া ভক্ত ভজুবাবুকে বলেন, "ভজু, জলদি খতম ক'রো। তুমহারা ভূত সবকো ভাগাও হিঁয়াসে।"

অনুযোগের সুরে ভজুবাবু উত্তর দেন, "বাবা, ভূত ভাগানোর কথা কেন বলছেন? আপনার পূজারতির জন্য এসব বাদ্যযন্ত্র আনানো হয়েছে, আর এগুলিকে আপনি বলছেন—ভূত?"

"কেঁও নহি? আস্‌লি পূজামে হোতা হ্যায় মনমে ধ্যান। ইতনি হল্লা তো ভূত ভাগানেকো ওয়াস্তেই হোতা হ্যায়।"—অর্থাৎ এসব বাদ্য যন্ত্রকে ভূত বলবো না তো কি? আসল পূজো হচ্ছে মনের ধ্যান। এতো তা নয়। তোমাদের এত সব হল্লা যে ওঝাদের ভূত ভাগানোর মতই।

হিন্দি ও গুরুমুখী ভাষা নাঙ্গাবাবা ভাল জানিতেন। এই সঙ্গে তেলেগু ও তামিলেও তাঁহার পারদর্শিতা ছিল। সে-বার গঞ্জাম হইতে একদল তেলেগু-ভাষী সাধু আশ্রমে তাহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। বাবাকে শিব জ্ঞানে তাঁহারা স্তবস্তুতি ও অর্চ্চনা করিলেন। তারপর শুরু হইল নানা বাদ্যযন্ত্র ও সঙ্গীতের ঐকতানসহ দক্ষিণী রীতির আরতি। উচ্চ রব ও সোরগোলে কাণ পাতা দায়। কিছুক্ষণ ধৈর্য্য ধরিয়া থাকার পর বাবা বলিয়া উঠিলেন, "আরে, ইতনি চিল্লানেসে ক্যা হোগা? মনমে স্মরণ ক'রো, ধ্যান ক'রো। উসিসে আস্‌লি কাম হোগা।"

বাবার বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠ শুনিয়া ও তাঁহার মন মেজাজের গতি প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া ভক্ত সাধুদের উৎসাহে ভাঁটা পড়িল।

শিষ্য, ভক্ত ও আগন্তুক দর্শনার্থীদের কল্যাণের জন্য অপ্রিয় সত্য

উচ্চারণ করিতে বা কঠোর কথা বলিতে বাবা কখনো পশ্চাদ্‌পদ হইতেন না। এ জন্য সঙ্গীয় ভক্ত ও সেবকেরা অনেক সময় বিব্রত হইতেন, লজ্জায়ও পড়িতেন।

একটি উড়িয়া ভদ্রলোক সেদিন নাঙ্গাবাবাকে প্রণাম জানাইতে আসিয়াছে। নিজে ভক্তিমার্গের সাধক হইলেও এই মহাবেদান্তীর উপর তাঁহার আকর্ষণের সীমা নাই। মাঝে মাঝেই আসিয়া তাঁহার উপদেশ-সুধা পান করেন। কথাবার্তার মধ্য দিয়া সেদিন কিছুটা অন্তরঙ্গ পরিবেশের সৃষ্টি হইলে ভক্তটি নিজের অবস্থার কথা জানাইলেন। কহিলেন, "বাবা, আজকাল আমার মন সহজে কোন বিষয়ে লিপ্ত হতে চায় না, ভজন গান শোনা ছাড়া। ভজন শুনলেই মন আমার তাতে একেবারে বিভোর হয়ে যায়। আর কোন দিকে হুঁস থাকে না। আজকাল এমনি অবস্থা।"

উত্তর হইল, "উহ্ ভি তো একঠো বিষয় হ্যায়।"

কলিকাতার এক বিখ্যাত কীর্ত্তন শিল্পী কয়েকজন সঙ্গীসহ পুরীতে বেড়াইতে গিয়াছেন। স্থানীয় লোকদের কাছে বাবার খ্যাতি ও মাহাত্ম্য শুনিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিলেন।

প্রণাম নিবেদন ও কথাবার্ত্তার পর দলের একজন কহিলেন, "বাবা, ইনি ভজন-কীর্ত্তনের একজন নামকরা সঙ্গীত-শিল্পী। আমাদের সবার ইচ্ছে, আপনি এর কণ্ঠের কীর্ত্তন একটু শুনুন।"

অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে মহাপুরুষ উত্তর দিলেন, "বেকার গিধ্‌ধরকা মাফিক চিল্লানেসে ক্যা ফয়দা হ্যায়?"

বড় অপ্রিয় ও কঠোর মন্তব্য। দর্শনার্থীরা মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইয়া নীরব রহিলেন। বাবার এবার হুঁস হইল, এতটা কঠোর হওয়া ভাল হয় নাই, মনে ইহারা দুঃখ পাইয়াছে। ধীর প্রশান্ত কণ্ঠে কহিলেন,— "দ্যাখো, ভজন কীর্ত্তন ভালই, মনটাকে ভগবৎমুখী করে দেয় তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ওটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করেই লোকে ভুল ক'রে। প্রপঞ্চ

থেকে মন উঠিয়ে নিতে হবে, এগিয়ে যেতে হবে ত্যাগ-বৈরাগ্য আর স্মরণ মনন নিদিধ্যাসনের পথে। তবেই পাবে মোক্ষ। তাল মান লয়—এসবও প্রপঞ্চ। এগুলো আঁকড়ে থাকলে তো চলবে না।"

প্রতিদিন প্রভাতে আশ্রমে স্বাধ্যায় উদ্‌যাপিত হয়। সেদিন পঞ্চদশী পাঠ চলিতেছে। বাবা মাঝে মাঝে এক একটি সূত্র ধরিয়া অধ্যাত্ম-সাধনার নানা ইঙ্গিত প্রদান করিতেছেন।

কিছুকাল পরে একটি নূতন দর্শনার্থী আসিয়া উপস্থিত। প্রণাম নিবেদনের পর কক্ষের এক কোণে গিয়া সে উপবিষ্ট হয়, নির্নিমেষে সতৃষ্ণনয়নে বাবার দিকে চাহিয়া থাকে।

আলোচনা কিছুটা অগ্রসর হইলে বাবা ঐ নবাগত লোকটির দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "দর্শন হো গিয়া, আভি চলা যাও।"

লোকটি জোড় হস্তে বলিয়া উঠে, "বাবা, আর একটু বসি, আপনাকে দর্শন করি।"

কিছুকাল পরেই বাবা আবার তাগাদা শুরু করিলেন, "বড়া ধূপ হোগী বাহারমে। দর্শন তো হো চুকা, বেকার কাঁহে বৈঠা রহা?"

ভক্তেরা ভাবিলেন, 'আহা, থাক্ না বেচারী! বাবার সঙ্গলাভের জন্য লুব্ধ হয়েছে, শাস্ত্রপাঠও কিছুটা শুনতে চায়।' কিন্তু বাবা মহারাজের জোর তাগাদায় আগন্তুককে উঠিয়া যাইতেই হইল।

একটি ভক্ত সাহস সঞ্চয় করিয়া কহিলেন, "বাবা, লোকটিকে দয়া ক'রে একটু শাস্ত্র আলোচনা শুনতেও আপনি দিলেন না। ওর হয়তো তীব্র ইচ্ছে হয়েছিলো শুনতে। কেমন দুঃখী হয়ে আপনার কাছ থেকে উঠে গেল।"

উত্তরে বাবা কহিলেন—"তোমরা বালক, এ সবের কি বুঝবে? ওর স্ত্রীর হয়েছে রাজযক্ষা। বাঁচবার কোন উপায় আমি দেখ্‌ছিনে। মনের একান্ত কামনা নিয়ে বসে আছে। আমি যেন কৃপা ক'রে ওর স্ত্রীর রোগটা আরোগ্য ক'রে দিই। কেউ কোন কামনা বাসনা নিয়ে কাছে

বসে থাক্‌লে কি শাস্ত্রপাঠ চলে? বার বার পবিত্র ভাবপ্রবাহে ছেদ পড়ে যায়। তাই তো ওকে উঠে যেতে বললাম।"

তারপর আত্মপক্ষ সমর্থনের সুরে কহিলেন—"আচ্ছা, তোমরাই বল। এটা আশ্রম না হাসপাতাল? সবারই রোগ সারাবার অফিস হয়ে উঠ্‌বে এটা? এ আশ্রম হচ্ছে ভবরোগের হাসপাতাল। ভবরোগ-মুক্তি আর মোক্ষ এখানে লাভ হতে পারে, অবশ্য যদি ত্যাগ-বৈরাগ্য ও ধ্যান মননের গতিবেগ থাকে।"

সে-বার এক ধনী ভক্ত বহুদিন পরে আসিয়াছেন নাঙ্গা বাবাকে দর্শন করিতে। সোৎসাহে নিজের তীর্থদর্শনের কথাই বারবার বর্ণনা করিতে লাগিলেন। শেষটায় কহিলেন, "বাবা, ভারতের সব জাগ্রত তীর্থই আমি দেখে ফেলেছি। কেদার বদরী ইত্যাদি আগেই হয়ে গেছে। এবারও আবার সেখানে সপরিবারে যাবো বলে ভাবছি। বাবা, আপনার আশীর্ব্বাদ যেন তীর্থযাত্রার পথে সতত আমার ওপর থাকে।"

বাবা এতক্ষণ নীরবে সব কথা শুনিতেছিলেন। এবার বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ-হাঁ যাও তীর্থমে, বহুৎ ঘুমো। লেকিন ইহা ভি পথ্‌থর, উহা ভি পথ্‌থর্। হাথ্‌ মে বহুৎ পয়সা হ্যায়, বহুৎ ঘুম্‌তা ফির্‌তা ভি হ্যায়। অওর তীর্থসে লওটকর গপ্‌ করো সবকো সাথ—অ্যায়সা কিয়া, অ্যায়সা দেখা। ইয়ে অহং ছোড়্‌কর্ কোই স্থানমে বৈঠ্‌ যাও, আত্ম-জ্ঞানকে লিয়ে কোসিস্ করো।"—অর্থাৎ, ভাল ভাল তীর্থে যাও, ঘুরে বেড়াও। কিন্তু এখানে যেমন ইট পাথর—ওখানেও তাই। হাতে জমে গিয়েছে অজস্র টাকা-কড়ি, তাই ঘুরতে পারো, আর তীর্থ দেখে ফিরে এসে সবার কাছে গল্প ক'র—এটা দেখছি, এটা করেছি। এই সব, অহংবোধ ছেড়ে দিয়ে এবার কোথাও বসে প'ড়ো, আত্মজ্ঞান সাধনায় ব্রতী হও।

পুরীর একটি সাধক বাবাকে বড় ভক্তি শ্রদ্ধা করেন। প্রায়ই আশ্রমে আসেন এবং শাস্ত্রপাঠ শ্রবণের পর তাঁহার সঙ্গ ও উপদেশ লাভে ধন্য

হন। গুরু নির্দ্দেশিত পথে দীর্ঘদিন ইনি সাধন ভজন করিয়া চলিয়াছেন, কিন্তু অন্তরে তেমন শান্তি পাইতেছেন না। সেদিন সখেদে কহিলেন, "বাবা, এতদিন ধরে ধ্যান জপ করছি, কৃচ্ছ্র সাধন করছি, কিন্তু কই, কিছু তো হচ্ছে না। দেবদেবীর মূর্ত্তি দর্শন বা অতীন্দ্রিয় দর্শন শ্রবণ— এসব প্রাথমিক প্রাপ্তিও কিছু হলো না, আর সব তো দূরের কথা। মনটা তাই দিন দিন মুষ্‌ড়ে পড়ছে।"

বাবা উত্তর দিলেন, "ইতনি সব দর্শনসে ক্যা ফয়দা, মুঝে বাতাও। ইস্‌সে তুমহারা আত্মজ্ঞান হোগা ?"

সাধকটি লজ্জিত হইয়া নীরবে মাথা নত করিয়া রহিলেন। স্নেহপূর্ণ স্বরে অতঃপর বাবা যাহা কহিলেন তাহার মর্ম্ম এই :

অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনের কথা পড়েছো তো ? কৃষ্ণজীর তিনি ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং অনুগামী। মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে কৃষ্ণজী কৃপা করে তাঁকে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়ে দিলেন। কিন্তু অর্জ্জুনের সাধন-প্রস্তুতি কি ছিল ? বিশেষ ক'রে বিশ্বরূপ দর্শনের প্রস্তুতি কতটা ছিল ? এর আগে তো ধনুর্ব্বিদ্যা, বহু বিবাহ, আর নারী সঙ্গেই দিন কেটেছে। ভাল ক'রে ভেবে চিন্তে বলতো, বিশ্বরূপ দর্শন করার পর কি অর্জ্জুনের আত্মজ্ঞান হয়েছিলো ? যদি তাই হবে, তবে অভিমন্যুর মৃত্যুতে অজ্ঞানের মত এত শোক ক'রলো কেন ?"

সহাস্যে আরো কহিলেন, "কৃষ্ণজী বড় চতুর। কিন্তু অর্জ্জুনের আচরণে বড় বিপদে পড়ে গেলেন। তাছাড়া, তুমি কি মনে ক'র অর্জ্জুন শুধু শোকেই অভিভূত হয়েছিল ? ডরও বেশ হয়েছিল কৃষ্ণ-সখার। কারণ, ওপক্ষে রয়েছেন সব দুর্দ্ধর্ষ মহারথী। এরা যে অজেয় তা অর্জ্জুন সবার চাইতে বেশী জানেন। ভীষ্ম সম্মুখ সমরে কোন দিনই পরাজয় মানেননি। আর দ্রোণ হচ্ছেন মহাবীর ব্রাহ্মণ-যোদ্ধা, মন্ত্রঃপূত বাণ সন্ধান ক'রতে তাঁর জুড়ি নেই। কর্ণের পরাক্রমও অপরিসীম। এসব চিন্তা ক'রে, বিষাদের সঙ্গে অর্জ্জুনের ডর হয়নি বলে তুমি মনে ক'র ? এই ডর ভাঙ্‌বার জন্য কৃষ্ণজী দেখালেন. আগে থেকেই এসব মহারথীদের

তিনি মেরে রেখেছেন। কিন্তু লক্ষ্য ক'রো, অভিমন্যু যে নিহত হয়েছে তা কিন্তু একবারও দেখালেন না।"

"তা দেখালে কি হতো বাবা?"—একটি ভক্ত কৌতূহলভরা কণ্ঠে প্রশ্ন ক'রেন।

"আরে তা, হলে কী আর কৃষ্ণজীর এত সাধের ধর্ম্মযুদ্ধ হতো? তাঁর পাকা ঘুঁটি কেঁচে যেতো। গাণ্ডীবী গাণ্ডীব ছেড়ে হাত পা গুটিয়ে রথের ওপর বসে পড়তেন। তাকে দিয়ে আর যুদ্ধ করানো যেতোনা, সম্ভব হতোনা কৌরবদের পতন ঘটানো। তবেই ভেবে ছাখো—অর্জ্জুন এতো তত্ত্ব ব্যাখ্যা শুনলেন স্বয়ং কৃষ্ণজীর মুখ থেকে। বিশ্বরূপও দর্শন ক'রলেন। তবুও শোকে মুহ্যমান।

প্রসঙ্গক্রমে এক জিজ্ঞাসু ভক্ত কহিলেন, "বাবা, ভগবদ্‌গীতা পরম শ্রদ্ধার বস্তু, নিত্য পাঠও ক'রি। কিন্তু বহুতর মত ও পথের কথা বলায় আমাদের মত সাধারণ মানুষ সময় সময় বড় বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, সব গুলিয়ে যায়।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বাবা তাঁহার শ্রোতৃমণ্ডলীর উপর হঠাৎ যেন এক বোমা নিক্ষেপ করিলেন। কহিলেন—"উহ্ তো এক স্বাদু, বড়িয়া খিচ্ড়ি হ্যায়। সব্ কিসিম কা রস্ উসনে ঘুস্ দিয়া।"

নাঙ্গাবাবার রসিকতা এবং ভক্তদের কৌতূহলী কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়া কক্ষমধ্যে বেশ একটা অন্তরঙ্গ আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছে। এই সুযোগে অনেকে অনেক রকম প্রশ্ন উত্থাপন করিতে লাগিলেন।

জনৈক স্থানীয় ভক্ত প্রায়ই মহাপুরুষের আশ্রমে আসা-যাওয়া করেন। নিবেদন করিলেন্, "বাবা, দিন দিন হতাশ হয়ে পড়ছি, সাধনার পথে তেমন আর যেন এগুতে পারছিনে।"

বাবা তিরস্কারের স্বরে কহিলেন, "আগে একটা একটা করে বন্ধন কাটাও, তবে তো এ কথা উঠ্‌বে। তাছাড়া এগুনো হবেই বা না কেন? তোমার তো ব্রাহ্মণ দেহ। ভাগ্যক্রমে এমন দেহ পেয়েছো। প্রাণপণে চেষ্টা ক'রো, এবার এ দেহেই যেন আত্মজ্ঞানের উদয় হয়।"

অতঃপর অপর ভক্তদের দিকে চাহিয়া প্রশান্ত মধুর কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "শুধু ধ্যান ভজনে কাজ হয় না, এই সঙ্গে চাই কৃচ্ছ্র, ত্যাগ-বৈরাগ্য। আহারে বিহারে যার সংযম নেই, জ্ঞানের উদয় তার জীবনে কি করে হবে?"

কলিকাতার একটি ভক্ত কয়েক দিন হয় আশ্রমে আসিয়াছেন। আশ্রমের বরাদ্দ, শুকনো কয়েকখানা রুটি আর একটা সব্‌জি,—তা তো কোনমতে গলাধঃকরণ করিতেছেন। কিন্তু চায়ের কোন ব্যবস্থা আশ্রমে নাই, এজন্যই পড়িয়াছেন বড় মুস্কিলে। একটি ছোক্‌রা আশ্রমের কাছেই থাকে। সে প্রস্তাব দিল, নবাগত ভক্তটিকে চা করিয়া খাওয়াইবে। কয়েকদিন যাবৎ এই ব্যবস্থাই চলিতেছে।

সেদিন ঐ ভক্তটির দিকে তাকাইয়া বাবা কহিলেন, "দ্যাখো, তুমি আর ঐ ছোক্‌রার হাতে চা খেয়ো না। কারণ, ও ধর্ম্মের ব্যবসা করে। দর্শনার্থীরা আমার কাছে আস্‌বার আগে ও তাদের হাতে ফুলের মালা গুঁজে দেয়, টাকা আদায় ক'রে। এ সব হীনবুদ্ধি লোকের ছোঁয়া চা খাওয়া ঠিক নয়, ওর ধর্ম্ম-ব্যবসায়ের ভাব তোমার মনে সংক্রামিত হতে পারে।

আর একটি ভক্তের দিকে তাকাইয়া বাবা কহিলেন, "তুমি আশ্রমে অবস্থানের সময়ে বাইরে এত ঘোরাফেরা ক'র কেন? আজ যাচ্ছো সাগর স্নানে, কাল মন্দিরে, তারপর দিন হরিণের চামড়া কিন্‌তে। এই ধরণের বহির্ম্মুখীনতা তো ভাল নয়। একনিষ্ঠ হয়ে কাজ করবে। আশ্রমে এলে শুধু ভাব্‌বে স্বাধ্যায় আর জ্ঞানবিচারের কথা। তবে তো এগিয়ে যাবে বন্ধন মুক্তির পথে।"

সবাই জানেন, অধ্যাত্ম-জীবনের মত ও পথ নির্ব্বাচনে বাবা সবাইর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন উপনিষদের তত্ত্ব ও বেদান্ত বিচারের প্রতি। কিন্তু অন্তরঙ্গতার স্পর্শে সাহসী হইয়া আজ ভক্তেরা লঘু গুরু নানা প্রশ্নই উত্থাপন করিতেছেন।

একটি অনুসন্ধিৎসু ভক্ত কহিলেন, "আচ্ছা বাবা, আপনি তো বেদান্ত-বিচার গ্রহণের আগে যোগসাধনাও দীর্ঘকাল ক'রেছেন?"

"জরুর কিয়া। মঁয় তো হর্ কিসিম্‌কা সাধন কিয়া। হঠযোগ, রাজযোগ, বেদান্ত-বিচার—সব কুছ্।

অতঃপর ভক্তদের কৌতুহল নিবৃত্ত করিতে গিয়া বলিতে থাকেন,—

"আমি সব সাধনই করে দেখেছি এবং তা ক'রে দেখবার পর আজ তোমাদের বলছি—বেদান্ত বিচারের পথই এ যুগের সাধারণ মানুষের পক্ষে বেশী উপযোগী। যোগ সাধনার জন্য চাই দৃঢ় দেহ ও কষ্টসহিষ্ণুতা। চাই যোগসিদ্ধ গুরু এবং ভাল বাসস্থান ও আহার। পঞ্চাশ বৎসরের উর্দ্ধে যোগাভ্যাস শুরু করা তো কোন মতে সঙ্গতই নয়। কাজেই বেদান্তই আজকের দিনের সহজতর সাধন পথ। তবে মনে রাখবে, আসল বেদান্ত-সাধনা হচ্ছে আরণ্যক জীবনের সাধনা, সর্ব্বত্যাগী ও মহবৈরাগ্যবানের সাধনা। দৃঢ়চিত্ত ও নিষ্ঠাবান যে সব সাধক বেদান্তের পথে আসে, ন্যায় আর সাংখ্য তাদের ভাল ক'রে পড়ে নেওয়া দরকার। নইলে বেদান্তশাস্ত্রের সূক্ষ্ম বিচার-ধারা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হয়।"

একটি শুদ্ধাচারী স্বাধ্যায়ী ভক্ত যুক্তকরে নিবেদন করেন, "বাবা, অদ্বৈত বেদান্তের শেষ কথা তো শঙ্করই বলে গিয়েছেন, তাই না?"

"সেকি কথা? অদ্বৈত বেদান্তের শেষ কথা কি কেউ বলতে পারে? 'মায়া অনির্ব্বচনীয়া'—তা'হলে শেষ কথাটি কি বলা সম্ভব হলো? আর শঙ্করের কথা যখন তুললে তখন বলি'—এ কথা আমি আগেও বলেছি—শঙ্কর ততক্ষণই শঙ্কর যতক্ষণ অবধি শ্রুতির সঙ্গে তাঁর ভাষ্যের মিল আছে। আর শঙ্কর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে এ কথাও বিস্মৃত হওয়া চলে না যে, যোগ-সমাধিকে তিনি 'মূর্চ্ছা' বলে ভুল করেছেন।"

কথা কয়টি শুনার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হইল। নাঙ্গাবাবা মৃদুহাস্যে কহিলেন, "হ্যাঁ, একথা বলতেই হয়—উচ্চতম যোগ-সমাধির অভিজ্ঞতা শঙ্করের ছিল না। তবে অদ্বৈত বেদান্তের যে তিনি শ্রেষ্ঠ আচার্য্য ও প্রবক্তা, তাতে সন্দেহ আছে কা'র?"

আশ্রমের সহিত সংশ্লিষ্ট একটি ভক্ত সাংসারিক দিক দিয়া নানা আপদ বিপদে পড়িয়াছেন। এ সম্পর্কে বাবার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া করিয়া একটি ভক্ত প্রশ্ন করেন, "বাবা, ইনি তো সাধনার দিক দিয়ে বেশ উচ্চ স্তরে পৌঁচেছেন, তবে এঁর ভাগ্যে এতো সব বিড়ম্বনা কেন ?"

উত্তরে নাঙ্গাবাবা বলেন, "সাধনার পথে নানা সময়ে দৈবের আঘাত আসে। একে বলে সুরবিঘ্ন। দেবতাদের কেউ কেউ গোড়ার দিকে সাধকের মুক্তির প্রয়াস পছন্দ করেন না। শাস্ত্রে বলে, মানব হচ্ছে দেবতাদের 'পশু'—সেবক বিশেষ। এই মানবদের অনুষ্ঠিত সেবা পূজা উৎসর্গ প্রভৃতিতে তাঁদের প্রচুর আকর্ষণ। যখন দেখেন, সেই মানব সাধনার ভেতর দিয়ে মুক্ত হতে যাচ্ছে—অর্থাৎ সেবক চলে যাচ্ছে উচ্চতর লোকে, তখন এঁরা বাধা দেন। এ সময়ে স্ত্রীপুত্রের ওপর আঘাত আসে, ঘটে আর্থিক ও বৈষয়িক নানা বিপর্য্যয়। এ বিঘ্ন সত্ত্বেও যে মানব এগিয়ে চলে তার ওপর দেবতারা প্রসন্ন হন, কৃপা ক'রে এগিয়ে এসে করেন সহায়তা।"

মঠ মন্দির ও বিগ্রহ নিয়া বৈষয়িক লোক ও আর্ত্ত ভক্তেরা সে ভাবোচ্ছ্বাস দেখায়, বহিরঙ্গ ভক্তির যে মাদকতা ও ফেনিল উচ্ছ্বলতা তাহাদের মধ্যে দেখা যায়, নাঙ্গাবাবা তাহা মোটেই পছন্দ করিতেন না। তিনি কহিতেন, "চিত্তকা বিক্ষেপ অওর মল দূর হোনেকা বাদ যো দর্শন হোতা হ্যায়, ওহি হ্যায় আস্‌লি দর্শন।"

এই নকল ও আসল দর্শন প্রসঙ্গে ভক্তপ্রবর কুমুদবন্ধু সেনের সহিত সে-বার বাবার এক মনোজ্ঞ কথোপকথন হয়:

কুমুদবাবু কহিলেন, "বাবা, আপনি তো জগন্নাথ দর্শন করতে যান না। কখনো তো আপনাকে শ্রীমন্দিরে দেখিনি। তিনি বললেন,—হৃদয়-মন্দিরে দর্শনই তো দর্শন। হাঁ, একবার এমার মঠে বসে রথ দেখে-ছিলাম। আমি বললাম,—কেমন দর্শন করলেন ? তিনি বললেন,—মস্ত তামাসা দেখলাম। কি পাণ্ডা, কি সেবকেরা, কি পুলিস দোকানদারেরা

খালি যাত্রীদের কাছে ফাঁকি দিয়ে পয়সা কড়ি নিচ্ছে, কোথাও কোথাও জুলুমও করছে। আব সব কীর্ত্তনের দল সম্প্রদায়গত ঈর্ষা বিদ্বেষ দেখাচ্ছে। কে কত লাফাতে পারে, নাচ্‌তে পারে, তাই দিয়ে লোকের ভক্তি আকর্ষণ করছে। জুতো পায়ে দিয়ে অনেকে রথ টানছে, পুলিস কনেষ্টবলেরা তো বটেই। তুমি কি রোজ মন্দিরে যাও?"

আমি বললাম, "আমি দুই তিনবার যাই।"

—কি দর্শন ক'র?

—শ্রীবিগ্রহমূর্ত্তি দর্শন করি।

—সেখানে উকিল মোক্তার ডাক্তার রোগী এসব দেখতে পাও না? অনেকে ঐ সব মতলবে যায়। প্রসাদ সস্তা, কাজে কাজেই অনেকে ওখানে প্রসাদ পায়।

ভাবোচ্ছ্বাসময় মেকি ভক্তি ও নাকে কাঁদুনি দেখিলে নাঙ্গাবাবা বিরক্ত হইতেন, কিন্তু সত্যকার ভক্তি দেখিলে তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না এবং এই সব ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষদের তিনি সত্যকার মর্য্যাদা সোৎসাহে দিতেন। শ্রীযুক্ত সেনের কথায় তাহার প্রমাণ মিলে :

—আমি বল্‌লাম, বাসুদেব বাবা বলে মন্দিরে একটি সাধু আছেন। তিনি বললেন,—আহা, ঐ একজন মহাত্মা আছেন, দেখবে কেমন তন্ময় হয়ে দর্শন করেন। তিনি যথার্থ জগন্নাথ দর্শন করেন এবং চামর দিয়ে সেবা করেন। ও রকম দু'চারটি সাধু কচিৎ কখনো আসেন। আমি বললাম,—মহাপ্রভু চৈতন্যদেব জগন্নাথ দর্শন করার সময় বাহ্যসংজ্ঞা হারিয়ে ফেলতেন। জগন্নাথ বলতে, জ-জ-জ-জগ···করতেন। ন্যাংটা বাবা হেসে বললেন,—মহাপ্রভুকে কী বুঝেছ? হাতীর বাইরের দাঁত দেখে কী বুঝবে? তিনি শ্রীবিগ্রহ দর্শন ক'রে অন্তরে ব্রহ্মদর্শন ক'রতেন। ব্রহ্মই সব হয়েছেন। এ সব উঁচু কথা।

এই প্রসঙ্গে নাঙ্গাবাবা আবার সতর্কবাণী উচ্চারণ করিলেন,—ভগবান, মন্দির এ সব নিয়ে মিথ্যা ব্যবসা করা অতি হেয় কাজ। যারা একাজ ক'রে, তাদের উদ্ধার হওয়া বড় শক্ত।[১]

[১] উজ্জীবন—পুরীটামে ন্যাংটাবাবা—পৌষ, ১৩৬৯

আত্মজ্ঞানীদের প্রসঙ্গে নাঙ্গাবাবা একদিন কহিলেন, "আত্মজ্ঞানকো উদয় হোনেসে দেহ টুট্ জাতা হ্যায়।"

একজন তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করিয়া বসে, "তবে বাবা আপনি এই দেহে বিদ্যমান রয়েছেন কি ক'রে? আপনার তো দেহপাত হয়নি।"

নাঙ্গাবাবার চোখমুখ উদ্দীপিত হইয়া উঠে এক অপূর্ব্ব দিব্য ভাবে। গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দেন, "তুমি বালক, এর রহস্য তুমি কি বুঝবে? তবে একথা জেনে রাখো, ঈশ্বর স্বয়ং এসে হাত জোড় করে প্রার্থনা করেন, তার ফলেই পূর্ণ আত্মজ্ঞানী মহাসাধককে তার দেহটি বাঁচিয়ে রাখতে হয়। ঐ দেহ দিয়ে সম্পন্ন হয় ঈশ্বরের অনেক কিছু কাজ। আত্মজ্ঞানের দীপশিখা এক সাধকের দেহ থেকে সঞ্চালিত হয় অপরাপর সাধক দেহে। এমনি ক'রে রক্ষিত হয় সাধনা ও সিদ্ধির পবিত্র পরম্পরা।"

সরল হৃদয় একটি ভক্ত প্রতিদিন বাবার কাছে আসিয়া শাস্ত্র পাঠ শুনেন। অকপটে নিজের মনের কথাও এ সময়ে সুযোগ মত বলিয়া বসেন। তিনি প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা বাবা, যোগীদের যোগবিভূতির নানা চাঞ্চল্যকর কাহিনী আমরা সাধু মহাত্মা ও তাঁদের শিষ্যদের কাছ থেকে শুনতে পাই। আত্মজ্ঞানীরাও কি সেই সব শক্তির অধিকারী? না—তাঁরা শুধু জ্ঞানসুধা পান ক'রে দিনরাত বুঁদ হ'য়ে বসে থাকেন? প্রকৃতিবশীত্ব কি আত্মজ্ঞানীদের হয়?"

সকৌতুক হাসি হাসিয়া নাঙ্গাবাবা কহিলেন, "তুম্ কেয়া বেয়াকুফ কা মাফিক বাৎ করতে হো? আত্মজ্ঞানীকো ইচ্ছা হোনেসে সৃষ্টি উলট্ জাতা হ্যায়, লয় প্রলয় হো জাতা হ্যায়।"

"কিন্তু বাবা, বেদান্তের ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর তো স্বয়ং বলে গিয়েছেন, —জগৎ-ব্যাপার বর্জং—প্রকৃতির ওপর, সৃষ্টির ওপর আত্মজ্ঞানীর কোন কর্তৃত্ব নাই। তবে?"

"শঙ্কর বোল্‌নেসেই ঘাব্‌ড়াও মৎ। দেখো—শ্রুতিকে সাথ্ মিল্ হ্যায় কি নেই। শ্রুতিকে বাৎ ইয়াদ্ রাখ্‌না—ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি। যব্ ব্রহ্ম বন্ যায়, তব্ ব্রহ্মবিদ্‌কো কিসি প্রকার ঘাটতি কাহে রহেগা?"

কিছুদিন পরের কথা। আশ্রমের নিত্যকার রীতি অনুযায়ী বেদান্তপাঠ চলিতেছে। প্রসঙ্গক্রমে যোগশাস্ত্র ও যোগবিভূতির কথা উঠিল এবং নাঙ্গাবাবা এ সম্বন্ধে নানা চাঞ্চল্যকর বিবরণ দিলেন।

একটি পুরাতন উড়িয়া ভক্ত মাঝে মাঝে আশ্রমে আসিয়া বাস করেন, বাবার সঙ্গ এবং উপদেশ লাভের পর আবার স্বস্থানে ফিরিয়া যান। যোগবিভূতি ও সিদ্ধাইর উপর তাঁহার প্রবল ঝোঁক। মনে মনে প্রায়ই ভাবেন, বাবা তো যোগ এবং বেদান্ত—দুইয়েতেই পারঙ্গম। কোনমতে তাঁহার নিকট হইতে যোগবিভূতি অর্জ্জন করা যায় না?

শ্রীহেরম্বনাথ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা হইতে আসিয়া আশ্রমে কিছুদিন যাবৎ আছেন। বাবা তাঁহাকে বেশ স্নেহ করেন। উড়িয়া ভক্তটি স্থির করিলেন, শ্রীমুখোপাধ্যায় মহাশয়কে দিয়াই বাবাকে অনুরোধ করাইবেন। তাই তাঁহাকে কহিলেন, "আপনি বাবাকে ভাল ক'রে বলুন, আমাদের যেন স্বরোদয় যোগ শিক্ষা দেন। এটা শিখলে, জাগতিক নানা তথ্য অবলীলায় জানা যায়। কোন্ ব্যক্তি কোথায় আছে, কি ক'রছে কি ভাবছে, কিছুই জানার বাকি থাকে না। এসব শিখলে, আমাদের লাভ আছে। একটু শক্তি-টক্তি লাভ করলে সাধন পথে সাহস বাড়ে। মনে উদ্দীপনা আসে। বাবাকে ধরে পড়ুন না একবার।"

উড়িয়া ভক্তটির নির্ব্বন্ধাতিশয্যে শ্রীমুখোপাধ্যায় রাজী হইলেন। আবেদন করার সঙ্গে সঙ্গে নাঙ্গাবাবা সোৎসাহে যাহা কহিলেন তাহার মর্ম্ম এই:

—এ আবার একটা কি শক্ত কথা। এখনি ঐ আলমারী থেকে নিয়ে এসো স্বরোদয় যোগের গ্রন্থ। কয়েক দিনের ভেতর আমি তোমাদের সব গুহ্য রহস্য শিখিয়ে দিচ্ছি। শুধু স্বরোদয় যোগ কেন, পরকায় প্রবেশও শিখিয়ে দেব তোমাদের। কিন্তু সবই তো বুঝলাম। তারপর প্রশ্ন থেকে যায়—এর মাধ্যমে আত্মজ্ঞান লাভ হবে কি? স্পষ্ট করেই তবে জানাচ্ছি, তা কিন্তু হবে না, বরং আত্মজ্ঞান সাধনার পথে

এসব হয়ে উঠবে বাধা স্বরূপ। আমি এক সময়ে এসব শিখেছিলাম—তারপর তা ভুলে যেতে চাচ্ছি।”

শ্রীমুখোপাধ্যায় তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, “না—বাবা, তা হলে এতে আমাদের কোনই প্রয়োজন নেই।”

ভক্ত কল্যাণে বাবার দৃষ্টি ছিল সদা সজাগ, সদা সতর্ক। অনেক সময় তাঁহাকে এ সম্পর্কে কঠোর হইতেও দেখা যাইত।

প্রাক্তন রাজনৈতিক নেতা রামনন্দন মিশ্র বাবার অত্যন্ত স্নেহভাজন। সে-বার কিছুদিনের জন্য আশ্রমে আসিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহার পরিচিত এক ব্যক্তি বাবার ভক্ত, আশীর্ব্বাদ লাভের জন্য প্রায়ই তিনি আশ্রমে আনগোনা করেন। এই ব্যক্তি শিক্ষিত, সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং এককালে যথেষ্ট বিত্ত-বিষয়েরও অধিকারী ছিলেন। বর্ত্তমানে আর্থিক দুর্গতিতে পড়িয়াছেন, নাঙ্গা বাবাকে মাঝে মাঝে দর্শন করিতে আসেন। কিন্তু সে সময়ে ভয়ে সঙ্কোচে বাবাকে নিজের দুঃখ দুর্দ্দশার কথা মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারেন না। সুযোগ পাইলেই মিশ্রজীর কাছে গিয়া বসেন এবং নিজের অভাব অনটনের কথা পাড়েন। বাবা এত স্নেহ করেন, তবুও এদিকে একটিবার দৃষ্টিপাত করেন না—এই ধরণের চাপা অভিযোগও তাঁহার মুখে শোনা যায়।

ভক্তটির মানসিক কষ্ট ও আর্থিক দুরবস্থা দেখিয়া মিশ্রজীর হৃদয় বিগলিত হইল। বাবাকে একদিন ধরিয়া বসিলেন, আব্‌দারের সুরে কহিলেন, “বাবা, আপনার এ ভক্তটি এত দুঃখ দুর্দ্দশায় আছে, এর একটা বিহিত করা যায় না? আপনি একটু কৃপাদৃষ্টি করলেই তো সে তার বিত্ত-বিষয় ও সামাজিক মর্য্যাদা ফিরে পেতে পারে।”

নাঙ্গাবাবার গম্ভীর বদন আরো গম্ভীর হইয়া উঠে। মিশ্রজীকে কহেন, “উহ্ তুমহারা দোস্‌ত্ হ্যায়, আওর উসকা কল্যাণ তুম্ চাহ্‌তে হো—ঠিক হ্যায় কি নেই?”

“হ্যাঁ বাবা, নিশ্চয়ই চাই।”

“তব্ শুন্ লেও তুম্ মেরে বাৎ। উস্‌কো পকেটমে রূপেয়া আনেসে,

উহ্ বিষয়কা গাড্‌ডামে গির্ যায়গা। বলাৎকার কর্‌কে উস্‌কো অভাবমে রাখ্‌খা যায়, তব্ উসকো কল্যাণ হোয়।"—অর্থাৎ, আমার কথা কয়টি ভাল করে শুনে নাও। তোমার বন্ধুর পকেটে টাকা এলেই আরো বিষয় আশয় সে বাড়াবে, বিষয়ের বন্ধনে জড়িয়ে পড়বে। আসল কথাটি কি জানো? ওকে বল প্রয়োগ ক'রে অভাবের ভেতর যদি রাখো, তবেই হবে ওর প্রকৃত কল্যাণ।

মহাজ্ঞানী মহাপুরুষের কল্যাণের ধারণা আর সাধারণ মানুষের ধারণায় কত তফাৎ তাহা বুঝা গেল।

কাহারো সাধন জীবনের উন্নতি বা আত্মিক কল্যাণের জন্য চরমতম অপ্রিয় সত্য বলিতেও বাবা কখনো পশ্চাদ্‌পদ হইতেন না। এমন কি শক্তিমান ও প্রতিষ্ঠাবান সাধককেও প্রয়োজন বোধে অবলীলায় হানিয়া বসিতেন চৈতন্য-উৎপাদনকারী প্রচণ্ড আঘাত।

ভারত বিখ্যাত এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসী নাঙ্গাবাবার দীর্ঘকালের পরিচিত। বাবার সংস্পর্শে আসিয়া প্রধানতঃ তাঁহারই উৎসাহ উদ্দীপনায় এই সাধক সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করেন—একথা প্রায়ই তিনি বলিতেন এবং বাবার প্রতি অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করিতেন।

এই সন্ন্যাসী সুপরিণত বয়সে একটি শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন এবং এই গ্রন্থে সঙ্কলিত সূত্রসমূহ তিনি নাকি প্রাপ্ত হইয়াছেন ভগবৎ-কৃপায়। সেদিন নাঙ্গাবাবার এক ভক্তের কাছে এই গ্রন্থটি দিয়া সন্ন্যাসী কহিলেন, "বাবাকে আমি যৎপরোনাস্তি শ্রদ্ধা করে থাকি। হিমালয়ের নীচে এমন উচ্চকোটির মহাত্মা দুর্লভ। তাঁকে আমার এই শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করবেন। আর অনুরোধ জানাবেন, অবসর মত তিনি যেন আমার এই গ্রন্থ সম্বন্ধে তাঁর মতামত জ্ঞাপন করেন।"

ভক্তটি গির্ণারী বস্তার আশ্রমে পৌঁছিয়া যথাসময়ে বাবার আসনের কাছে বইটি রাখিলেন, জানাইলেন তন্ত্রাচার্য্যের সবিনয় নিবেদন।

পৃষ্ঠা দুই পাঠ করিয়া শোনানোর পর বাবা ভক্তটিকে থামাইয়া দিলেন। প্রশান্ত কণ্ঠে কহিলেন, "ইয়ে কিতাব লেখককো বোল্ দেও—

কিতাব লিখ্ না ছোড়্ কর্ উহ্ আত্মচিন্তনমে ধেয়ান দেনা। উস্‌সেই আস্‌লি কল্যাণ আ জায়গা।"

সেদিন ছিল বুদ্ধ পূর্ণিমা। ভক্ত ও দর্শনার্থীরা বাবার কক্ষে বসিয়া বুদ্ধের কথা কহিতেছেন, বর্ণনা করিতেছেন তাঁহার ত্যাগ তিতিক্ষা ও সাধনৈশ্বর্য্যের কথা।

জনৈক অভ্যাগত প্রশ্ন করিলেন, "বাবা, বুদ্ধ তো অবতারই ছিলেন। তাঁর সম্বোধি প্রাপ্তির কথা শুনে মনে হয়, পরাজ্ঞান তিনি অবশ্য লাভ করেছিলেন—প্রবিষ্ট হয়েছিলেন পরাব্রহ্মে। এতে তো কোন সন্দেহ নেই। আপনি কি বলেন?"

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া নাঙ্গাবাবা উত্তর দিলেন, "হ্যাখো, তোমরা কিন্তু অবতারকে বড় সহজলভ্য, আর সস্তা ক'রে ফেলেছো। অবতার এলে যুগ পাল্‌টে যায়, যেমন হয়েছে রাম আর কৃষ্ণের কালে। আজকাল তো প্রতি মহল্লায় অবতারের আবির্ভাব। আরে, আসল হিসাবে তো তুমিই এক অবতার—এই তামাম সৃষ্টিতে যত জীব আছে প্রত্যেকেই ব্রহ্মের অবতার।"

"কিন্তু বাবা, বুদ্ধের কথা আলাদা। পরাজ্ঞানের উদয় তাঁর মধ্যে হয়েছিল। তাঁকে অবতার বলে এ যুগের বহু লোকে মানে।"

"সবই বুঝলাম। কিন্তু বুদ্ধের গুরু কে? সদ্‌গুরুর সাহায্য ছাড়া, ঐশ্বরীয় শক্তির প্রয়োগ ছাড়া, পরম প্রাপ্তি বা পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান তো কখনো সম্ভব নয়।"—সোজা সরল ভাষায় বাবা এ কথা বলিয়া দিলেন।

গুরুকরণ সম্পর্কে, ব্রহ্মবিদ্ সদ্‌গুরুর করুণা-অবদান সম্পর্কে সনাতন-পন্থী সাধকদের এই আদর্শই নাঙ্গাবাবা মানিয়া চলিতেন। তাঁহাকে প্রায়ই বলিতে শুনা যাইত, সদ্‌গুরু যেখানে সশরীরে উপস্থিত নাই, সেখানে সাধকের পক্ষে দেহের সাধনায় সিদ্ধ হওয়া বা জ্ঞানের উচ্চতম সোপানে আরোহণ করা সম্ভব নয়।

অনেকের ধারণা নাঙ্গাবাবা—ভক্তিবাদের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু

তাহা সত্য নয়। সত্যকার একৈক-নিষ্ঠা ও শরণাগতিকে চিরদিনই তিনি গুরুত্ব দিতেন। তবে শূন্যগর্ভ ভক্তি এবং ভাবালুতার ফেনিল উচ্ছাসকে বড় একটা সহ্য করিতে পারিতেন না। বাবার স্বতস্ফূর্ত্ত আলোচনার মধ্য দিয়া ভক্তিধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার প্রকৃত মতামত মাঝে মাঝে প্রকাশ হইয়া পড়িত।

সেদিন ছিল জন্মাষ্টমীর দিন। স্বভাবভক্ত রামানন্দ মিশ্রজী মনে মনে পরমপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা স্মরণ করিতেছিলেন। বাবা সম্মুখেই উপবিষ্ট। মিশ্রজীর অন্তরের ভাব বুঝিতে অন্তর্য্যামী মহাপুরুষের দেরী হইল না। প্রসন্ন মনে আপনা হইতেই কহিতে লাগিলেন, :

"দ্যাখো, বাইরে থেকে লোকে ভাবে, আমি বুঝি ভক্তিকে তেমন আমল দিই না এবং কৃষ্ণের আমি বিরোধী। তা কিন্তু একেবারেই সত্যি নয়। শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের অবতার—তাতে সন্দেহ কি? যারা প্রেমভক্তি পেতে চায়, কৃষ্ণে ইষ্ট-ভাবনা তাদের রাখতেই হবে। কৃষ্ণভজন ও আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে পাবে তারা কৃষ্ণকে আর পাবে—পরাভক্তি। ব্রহ্মজ্ঞান যদি তাদের ভাগ্যে থাকে, তবে কৃষ্ণই সাহায্য করবেন সেই পরম প্রাপ্তিতে।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া নাঙ্গাবাবা আবার কহিলেন, "একটা কথা ভালভাবে স্মরণ রেখো। কৃষ্ণ গোপীদের নিয়ে রাসোৎসব করেছিলেন। এ সম্পর্কে ভাগবতে একটা জায়গায় ধ্রুবপদ থেকে চ্যুতির কথা বলা হয়েছে। অন্য নূতন রাগ ও তাল শুরু হলো এরপর। ভাবতে হয়, সেখানে ব্রহ্মধারণার ইঙ্গিত রয়েছে কিনা। সেখানে দেখা যাচ্ছে—রসের গাঢ়তার ফলে, ইষ্টসহ চিত্তের একাত্মকতার ফলে তাল ভঙ্গ হয়ে যাচ্ছে। বৈষ্ণবদের কীর্ত্তন ও ভজনে কি দেখতে পাও? সবাই বহিরঙ্গ সুর বা তালটিকে ধরে বসে আছে। তাই যদি হয়, তবে ইষ্টের সঙ্গে সত্যকার তাদাত্ম্যভাব হবে কি ক'রে? প্রকৃতপক্ষে ভাগবতে কথিত ধ্রুবপদ ভঙ্গ হওয়ার কথা যেখানে, সেখানেই হয়েছে আত্মজ্ঞানের শুরু।"

স্বনামধন্য এক সাধু সে-বার সদলবলে পুরীধামে আসিয়াছেন।

অজস্র মঠ মন্দির তাঁহার তাঁবে। যেমন দূরবিস্তারী তাঁহার সংগঠন, তেমনি বিপুল প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি। নাঙ্গাবাবার নাম আগে হইতেই অনেক শুনা আছে। সেদিন এই সাধুটি কয়েকজন ভক্তসহ বাবাকে দর্শন করিতে আসিলেন। বালিয়াড়ীর সান্নুদেশে আসিতেই একটি বিচিত্র ঘটনা ঘটিয়া গেল।

সুদাম নামে বাবার আশ্রমে এক অল্প বয়স্ক ভৃত্য থাকে। তাহার নিত্যকার প্রিয় খেলা—বালু-ঢিবির মধ্য হইতে খুঁচাইয়া খুঁচাইয়া সাপ বাহির করা। সাপ একবার বাহির হইলে আর রক্ষা ছিল না। সুদাম অমনি লাঠির ঘায়ে সেটিকে বধ করিত, তারপর বালিয়াড়ীর ঢালুতে লম্বা করিয়া বিছাইয়া রাখিত। নবাগত দর্শনার্থীরা এই মৃত সাপকে জ্যান্ত মনে করিয়া আঁৎকাইয়া উঠিলেই খিল্ খিল্ করিয়া সে হাসিয়া উঠিত, মনের আনন্দে দিত করতালি।

একদল ভক্ত সঙ্গে পূর্বোক্ত সাধুটি আশ্রমের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে যাইতেছেন। এমন সময়ে একজন 'সাপ' 'সাপ' বলিয়া চেঁচাইয়া উঠে। ভীতত্রস্ত সাধু অমনি চেঁচাইয়া উঠেন—"তোমরা কেউ এগিয়ো না। ঐ ছ্যাখো, সামনে রয়েছে প্রকাণ্ড বিষধর সাপ।" দলের লোকদের মধ্যে ছুটাছুটি পড়িয়া যায়, শুরু হয় ভয়ার্ত্ত কলরব।

পরক্ষণেই বালক-ভৃত্য সুদামের উচ্চহাস্য এবং হাত-তালিতে সকলে বুঝিলেন, সাপটি মৃত। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া সবাই এবার শুরু করিলেন হাস্য পরিহাস।

বালু পাহাড়ের শীর্ষে বসিয়া নাঙ্গাবাবা এই কৌতুককর দৃশ্য দর্শন করিতেছেন, তাঁহার চোখে মুখে ছড়াইয়া পড়িয়াছে স্মিত হাসির আভা। আগন্তুক সাধুর দল বাবার দর্শন ও কথাবার্ত্তা সাঙ্গ হওয়ার পর আশ্রম ত্যাগ করিলেন। ভক্তদের আলাপ আলোচনা আবার শুরু হইল।

জনৈক কৌতুহলী ভক্ত নাঙ্গাবাবাকে কহিলেন, "বাবা, কিছু মনে করবেন না। ঐ সাধুটি সম্পর্কে কথা জিজ্ঞেস করছি। ওঁর কয়েকজন অত্যুৎসাহী ভক্ত আছেন, তাঁদের ধারণা—উনি নাকি পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ।

ওঁর দেহে পূর্ণব্রহ্মের যেমনতর প্রকাশ ঘটেছে এমনটি নাক আর কোন মানবদেহে দেখা যায়নি। আপনি এ বিষয়ে কি বলেন ?"

বাবা মুচকি হাসিয়া কহিলেন, "থোরা আগে তো দেখা—মুর্দা সাপ্‌কো দেখ্‌কর উহ্‌ পূর্ণব্রহ্ম ক্যায়সা মায়া বিভ্রম্‌মে পড়্‌ গিয়াথা, অওর ক্যায়সা ঢংসে দৌড়তাথা ভি।"—অর্থাৎ, একটু আগেই তো স্বচক্ষে দেখ্‌লে, মরা সাপকে দেখে পূর্ণব্রহ্ম কেমন মায়া বিভ্রমে পড়ে গিয়েছিলেন, আর ভয় পেয়ে কেমন ছুটাছুটি শুরু করেছিলেন।

এধরণের কঠোর সত্যভাষণ যে ভক্ত শিষ্যদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনে সাহায্য করিত তাহাতে সন্দেহ নাই।

সেদিন সন্ধ্যার আরতি কিছুক্ষণ যাবৎ শেষ হইয়াছে। কক্ষমধ্যে তরল অন্ধকারে ভক্ত ও সেবকেরা নাঙ্গাবাবাকে ঘিরিয়া নীরবে বসিয়া আছেন। সবাই প্রতীক্ষমান—এই সময়ে মনখোলা অবস্থায় বাবার শ্রীমুখ হইতে যদি দুই চারিটি আধ্যাত্ম কথন শুনা যায়।

প্রসঙ্গক্রমে সৃষ্টি রহস্যের কথা উঠিল। বাবা কহিলেন, "এই সৃষ্টির রহস্য বড় দুর্জ্ঞেয়। যে সব উচ্চকোটির সাধকের পঞ্চভূতাত্মক জ্ঞান হয়েছে, শুধু তাঁরাই এ রহস্য অনায়াসে ভেদ করতে পারেন।"

ভক্তপ্রবর হেরম্বনাথ মুখোপাধ্যায় তখন পার্শ্বে উপবিষ্ট। সবিনয়ে কহিলেন, "বাবা, একথা আগেও আপনার মুখে দু'একবার শুনেছি। কিন্তু বাবা, বিশ্বখ্যাত পণ্ডিতদের কেউ-কেউ কিন্তু আপনার একথা মানতে রাজী নয়।"

"কেঁও নহি ?"

"বাবা, কিছুদিন আগে কলকাতায় এক মহাত্মার আশ্রমে বসে তাঁর উপদেশ শুনছিলুম। নানা কথাবার্ত্তাও হচ্ছিল। সেখানে সেদিন উপস্থিত ছিলেন বর্ত্তমান বিশ্বের এক শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানবিদ্‌ আচার্য্য। আপনার কথিত পঞ্চভূতাত্মক জ্ঞান সম্বন্ধে তাঁকে বললাম। তিনি কিন্তু, বাবা, অবিশ্বাসের হাসি হেসে এ কথা উড়িয়েই দিলেন।"

মহাপুরুষের নয়ন দুইটি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। রোষভরে কহিলেন, "ছোড় দেও, উসকো বাৎ। উহ্ কেয়া সমঝেগা? পঞ্চভূতকা থোড়াভি জ্ঞান নহি হুঁয়া উস্‌কো।"

কলিকাতায় আসিয়া শ্রীমুখোপাধ্যায় কথা প্রসঙ্গে একদিন ঐ প্রবীণ বিজ্ঞানীকে অকপটে জানাইলেন,—নাঙ্গাবাবা তাঁহার সম্বন্ধে কি উক্তি করিয়াছেন। বিশ্বখ্যাত পণ্ডিতের মুখ দিয়া অনেকক্ষণ একটি বাক্যও নিঃসৃত হইল না, ম্রিয়মাণ হইয়া তিনি বসিয়া রহিলেন।

আদি অন্তহীন সৃষ্টি পারাবারের বেলাভূমি হইতে মাত্র দুই একটি উপলখণ্ড তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন—সৃষ্টির রহস্য ভেদ করা তো দূরের কথা—আত্মসমীক্ষা করিয়া বিজ্ঞানবিদ্ কি নীরবে এই কথাই চিন্তা করিতেছিলেন?

কঠোর বেদান্তীর রুক্ষ বহিরঙ্গ জীবনের অন্তস্তলে সদাই বহিয়া চলিত জগৎ কল্যাণের ফল্গুধারা। দর্শনার্থী ও ভক্তদের আধার অনুযায়ী মাঝে মাঝে এই ধারার প্রকাশ দেখা যাইত।

মিসেস রোজেনবার্গ নামক এক ফরাসী মহিলা ভারততত্ত্ব ও ভারতীয় সাধনার পরিচয় লাভের জন্য এদেশে আসেন। কলিকাতায় অবস্থান করার কালে এক ব্রহ্মবিদ্ মহাত্মার স্নেহ-সান্নিধ্য তিনি লাভ করেন। মহাত্মাটি তাঁহাকে একদিন বলেন, "তুমি পুরীধামে গিয়ে নাঙ্গাবাবাকে একবার দর্শন করে এসো। এমন আত্মজ্ঞানী মহাসাধক কিন্তু সচরাচর দেখা যায় না।"

"তিনি তো শুনেছি বড় গুরুগম্ভীর, বড় শুষ্ক। তাঁর কাছে গিয়ে আমি টিঁকতে পারবো কি?"—রোজেনবার্গ সবিনয়ে জানান।

"নিশ্চয় পারবে। এখান থেকে যাচ্ছো, দেখ্‌বে তিনি তোমায় স্নেহের চোখেই দেখবেন।"

সত্যই তাই ঘটিল। ফরাসী মহিলাটি আশ্রমে পৌঁছা মাত্র বাবা তাঁহার প্রতি বিস্ময়কর স্নেহ প্রদর্শন করিলেন। বাহিরের কোন হোটেলে না থাকিয়া ক্ষুদ্র আশ্রমের একটি কুঠরীতে এই বিদেশিনী কিছু

দিন বাস করিলেন। বাবার অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য ও উপদেশ শ্রবণে তাঁহার অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠিল আনন্দরসে।

এ-সময়কার একটি ঘটনার কথা মিসেস রোজেনবার্গ লেখককে বিবৃত করিয়াছেন:

পুরীতে জনজীবনে তখন খুব চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠিয়াছে। গান্ধীজীর স্নেহধন্য শিষ্য, দেশের একজন অগ্রণী সমাজ-সংস্কারক নেতা, এ সময়ে শহরে আসিয়াছেন। জাতীয় জীবনের উজ্জীবনের জন্য কয়েকদিন ধরিয়া তিনি বক্তৃতাদি দিতেছেন। সেদিন তিনি বক্তৃতা দিলেন 'সমাধি' সম্পর্কে। কৌতূহলী মিসেস রোজেনবার্গ সভায় গিয়া ঐ ভাষণটি শুনিয়া আসিলেন।

কোথায় গিয়াছিলেন, কাহার বক্তৃতা শুনিয়া আসিয়াছেন, বিষয়বস্তু কি ছিল—ফিরিয়া আসিয়া বিদেশিনী-ভক্ত বাবাকে সব কহিলেন।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকার পর বাবা দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "বেকার তুম্ ইত্‌নি সময় নষ্ট্ কিয়া। সমাধি কৌন চীজ হ্যায়—উসকা কুছ্ মালুম নেই। তব্ ক্যায়সে তুমকো বাৎলায়েঙ্গে? যো সাধক সমাধিমে প্রবিষ্ট হুয়া, উহ্ কভি বাজারমে অওর্ সভামে খাড়া হো কর্ চিল্লাতে হেঁ? —অর্থাৎ, অনর্থক তুমি মূল্যবান সময় নষ্ট করেছো। সমাধি কি বস্তু, তা ওর জানা নেই। তবে তোমাকে বোঝাবে কি করে? তাছাড়া, যে সাধক সমাধির স্তরে প্রবেশ করেছে সে কি কখনো সভায় অথবা বাজারে দাঁড়িয়ে চেঁচায়?

অন্তরঙ্গ মহল হইতে নাঙ্গাবাবার সাধনা ও সিদ্ধির খ্যাতি শুনিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের রীডার ডক্টর অনিল রায়চৌধুরী আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হন। অধ্যাপক রায়চৌধুরী দারপরিগ্রহ করেন নাই, দীর্ঘকাল অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা নিয়াই রহিয়াছেন ব্যাপৃত। দর্শন-শাস্ত্র ও সাধনা সম্পর্কে নানা জটিল প্রশ্ন তাঁহার জীবনে বার বার উঠিয়াছে, এ যাবৎ তাহার সমাধান মিলে নাই। এবার মনে মনে

ভাবিলেন, কয়েকটা দিন বাবার সান্নিধ্যে থাকিয়া ঐ সব প্রশ্নের মীমাংসা করিবেন।

কিন্তু বাবার আশ্রমে পৌছিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার অন্তরে জাগিয়া উঠিল এক প্রবল ভাবোচ্ছ্বাস। বাবার প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তির দিকে বার বার দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতেছেন আর দুই চোখ তাঁহার অশ্রুতে ঝাপ্‌সা হইয়া উঠিতেছে।

অন্তর্য্যামী নাঙ্গাবাবা কি বুঝিলেন তাহা তিনিই জানেন। স্নেহপূর্ণ স্বরে ভাবাকুল, কম্পিত-দেহ অধ্যাপক রায়চৌধুরীকে তিনি নিকটে ডাকিলেন। পাশে আসিয়া বসিলে হস্ত দ্বারা তাঁহার দেহটি বেষ্টন করিয়া মাথাটিকে নামাইয়া আনিলেন নিজের বিশাল উরুর উপর। সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ রায় চৌধুরীর সারা অন্তর ছাপাইয়া, সারা অস্তিত্ব ছাপাইয়া, উদ্বেল হইয়া উঠিল কান্না আর বিলাপ। কেন এই কান্না, কেন এই বিলাপ তাহা বুঝিবার মত শক্তি তাঁহার নাই। কেবলি ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছেন, আর নাঙ্গাবাবার জঘনদেশ অশ্রুতে ভাসিয়া যাইতেছে।

অধ্যাপক রায়চৌধুরী একটু সুস্থ হইলে বাবা যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম্ম এই ঃ

কেন শুধু শুধু এমন অসহায়ের মত কাঁদছো ? ঈশ্বর তো তোমায় অনেক কিছু কৃপা করেছেন। স্ত্রী-পুত্র আর সংসারের বন্ধনে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধেন নি। সাত্ত্বিক মন ও বুদ্ধিও দিয়েছেন। তুমি শিগ্‌গীর চলে এসো আশ্রমে, এখানেই স্থায়ীভাবে জীবনের শেষ দিন অবধি থেকে যাও, আত্মচিন্তনে ক'রো দিনাতিপাত।

ডঃ রায়চৌধুরী উত্তরে কহিলেন, "বাবা, আমি যে এশিয়াটিক সোসাইটি এবং আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ, তাদের লেখাগুলো সমাপ্ত না ক'রে তো কলকাতা ছাড়তে পারছিনে।"

"না—না। ও সব এখনি ছেড়ে তুমি আশ্রমে এসে থাকো। বরং আর ফিরে যেয়োনা, এখন থেকেই এখানে থেকে যাও। ছাখো, জীবন

বড় ক্ষণস্থায়ী—আত্মচিন্তনের কাজে এক মুহূর্ত্তও অবহেলা করা ঠিক নয়। তুমি আমার কাছেই থেকে যাও, কি বল?"—কত অনুরোধই না বাবা তাঁহাকে বারবার করিতেছেন।

মহাপুরুষকে অনেক করিয়া বুঝাইয়া ডঃ রায়চৌধুরী কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময়ে লেখকের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে। বাবার কথা উত্থাপিত হইতেই যুক্তিবাদী, প্রবীণ দর্শন-অধ্যাপকের দেখা যায় অদ্ভুত রূপান্তর। কি এক অজানা ভাবাবেগে তিনি উদ্বেল হইয়া উঠেন, দুই নয়নে বহিয়া যায় অশ্রুর বন্যা।

কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই কিন্তু ডঃ রায়চৌধুরী তাঁহার কলিকাতার বাসভবনে আকস্মিকভাবে পরলোক গমন করেন। জনৈক সন্ন্যাসী মহাত্মা এই ঘটনাটি শোনার পর বলেন, "রায়চৌধুরীর প্রাক্তন খণ্ডিত হয়ে আসছে,—নাঙ্গাবাবা এটা বুঝেছিলেন। রায়চৌধুরী যদি বাবার আশ্রমে থেকে যেতো তবে তাঁর আয়ুষ্কাল বর্দ্ধিত হতো, আর আত্ম-সাক্ষাৎকারের পথেও তিনি যেতে পারতেন এগিয়ে।"

সেদিন শাস্ত্রপাঠ সবেমাত্র সাঙ্গ হইয়াছে, শুরু হইয়াছে নানা আধ্যাত্মিক আলোচনা। ভক্তদের দিকে চাহিয়া বাবা কহিলেন, "যে মানুষ আত্মজ্ঞান অর্জ্জন করেনি, প্রবৃত্তির তাড়নায় অসহায় হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সে মানুষ তো পশুর সামিল।"

জনৈক ভক্ত সেদিন মন্তব্য করিলেন, "বাবা, আমাদের মত গৃহস্থেরা প্রবৃত্তি মার্গেই বেশীর ভাগ পড়ে থাকে। ত্যাগী সাধুরা ছাড়া আত্মজ্ঞান লাভ আর ক'জনা করতে পারে?"

"তা ঠিক নয়। গৃহস্থদের ভেতর সৎ, ত্যাগী ও আত্মজ্ঞানী লোক আমি অনেক দেখেছি। আর সাধু হলেই সে সাচ্চা হবে, জ্ঞানী হবে, তা ভেবোনা। অনেক ভেজাল আজকাল রয়েছে। হিমালয়ের বরফান অঞ্চলে দেখেছি, লৌহ ফলকযুক্ত দণ্ড হাতে নিয়ে কোন কোন সাধু ঘুরে বেড়াচ্ছে, পায়ের নীচে ঐ লৌহ ফলক দিয়ে ঠুকছে অবিরত। মনের গোপন বাসনা—স্পর্শমণির যদি হঠাৎ সন্ধান পাওয়া যায়, লোহা যদি

ভাগ্যবশে সোনা হয়ে ওঠে। আবার কেউ কেউ খোঁড়াখুঁড়ি করছে কন্দমূলের সন্ধানে—পেটের ধাঁধায়।

"এজন্যই তো, বাবা, আমাদের দেশের এক শ্রেষ্ঠ নেতা সাধুদের সাধু বলেই স্বীকার করতে চান না। ঐ সেদিনও তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন—সাধুরা সমাজের পরগাছা।"

কথাটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে বাবার চোখমুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। ক্রুদ্ধ স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "লেকিন্ আস্‌লি সাধুলোগ তুম্‌হারা উহ্ নেতাকো দেখতেহেঁ চুট্‌কাকো মাফিক"—অর্থাৎ, সত্যকার খাঁটি সাধু তোমাদের ঐ নেতাকে গণ্য ক'রে একটা পিঁপড়ের মতন।

এই মন্তব্য ক'রার পর বাবা কহিলেন,—এবার তবে পুরাণের একটা কহানী শোন :

শাস্ত্রে দধীচি নামে স্বর্গের এক ঋষির কথা আছে। এই ঋষি যেমনি ত্যাগ-তিতিক্ষাবান তেমনি তেজস্বী, সবাই সম্মানও তাঁকে খুব ক'রে। দেবরাজ ইন্দ্রের রাজসভায় সকল ঋষিরাই দর্শন দিয়ে যান, একমাত্র দধীচি বাদে। ইন্দ্র কিন্তু এটা লক্ষ্য করে দুঃখিত ও রুষ্ট হন। তবে ইন্দ্র তো তোমাদের মত বেয়াকুব মানুষের রাজা নন—তিনি বুদ্ধিমান দেবতাদের রাজা। চিন্তা ভাবনার পর ঠিক করলেন, দধীচি ঋষির কাছে তাঁর নিজেরই যাওয়া দরকার।

ইন্দ্র সেদিন তপোবনে গিয়ে ঋষিকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন, যুক্ত করে বল্‌লেন, "ঋষিবর, আপনি আমাদের ওদিকে যান না, কাজেই আমি নিজেই আপনাকে দর্শন করতে এলাম। কিন্তু প্রথমেই একটা প্রশ্ন নিবেদন করি'—আমার সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা? কি রকম আমাকে মনে হয়?"

"কুকুরের মত"—নির্বিকার চিত্তে বললেন ঋষি দধীচি।

দেবরাজ ইন্দ্র চম্‌কে উঠ্‌লেন,—"সে কি! এ আপনি কি বলছেন ঋষিবর?"

দধীচি সোজা স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলেন, "দেবরাজ, আমি ঠিকই

বলেছি। তুমি রাজত্ব করছো, ইন্দ্রিয়ের পুজোয় নিরত আছো। ইন্দ্রিয় চর্চ্চাতো কুকুরেরই কাজ। তাই তোমার আর কুকুরের মধ্যে আমি তো —কোন পার্থক্য দেখিনে।"

গল্প শেষ করিয়া নাঙ্গাবাবা মহারাজ প্রশ্নকারী ভক্তটির দিকে কট্‌মট করিয়া তাকাইয়া কহিলেন, "সব সময়ে মনে রেখো—সাচ্চা ও শক্তিমান সাধু যাঁরা, ইচ্ছামাত্র সৃষ্টিতে তাঁরা আনতে পারেন পরম কল্যাণ অথবা ধ্বংস। তোমাদের তাঁরা দেখে থাকেন তাচ্ছিল্যেরই দৃষ্টিতে।"

কলিকাতার এক তরুণ ব্যারিষ্টার, ধনাঢ্য ঘরের ছেলে, নিজ স্বভাবের দোষে দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগিতেছেন। আধুনিক শীর্ষ স্থানীয় ডাক্তারদের সকল কিছু চেষ্টা বিফল হওয়ার পর হতাশ হইয়া তিনি দিন যাপন করিতেছেন। একদিন জনৈক বন্ধুর মুখে নাঙ্গাবাবা মহারাজের মাহাত্ম্যের কথা শুনিলেন। প্রাণে আশার সঞ্চার হইল। বন্ধুটি নাঙ্গাবাবার স্নেহভাজন ভক্ত; দিন কয়েকের মধ্যেই পুরীতে বাবার আশ্রমে যাইবেন বলিয়া ঠিক করিয়াছেন। ব্যারিষ্টার তাঁহাকে কহিলেন, "আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান আমার এ দুশ্চিকিৎস্য গোপন ব্যাধি কখনো আরোগ্য করতে পারবে না। তাই বাবার যোগবিভূতির ওপরই আমার একান্ত ভরসা! আমার আবেদন তাঁকে জানাবেন, তিনি অন্তর্য্যামী—কোন কিছুই তাঁর অজ্ঞাত নয়। কৃপাদৃষ্টি দিয়ে আমায় যেন তিনি রোগের কবল থেকে মুক্ত করেন।"

আশ্রমে পৌঁছানোর পরদিনই ভক্তটি এক সুযোগে বাবার কাছে ঐ ব্যারিষ্টারের কথা পাড়িলেন, নিজেও আবেদন জানাইলেন, "বাবা, এ ভদ্রলোক মর্ম্মান্তিক দুঃখ পাচ্ছেন। আপনি এর প্রতি একটু প্রসন্ন হোন।"

"উস্‌সে তুমহারা কেয়া হোগা, বাতাও। আত্মজ্ঞানকা রাস্তা খুল্ যায়গা?"—ধমকের সুরে নাঙ্গাবাবা বলিয়া উঠিলেন।

"না বাবা, তা নয়। তবে কিনা উনি আপনার নাম ক'রে বার বার মিনতি করলেন, তাই আপনাকে বলছি।"

"তবে শুনো হামারা বাৎ। তুমহারা দোস্ত্‌কা বেমারী হ্যায় পুরুষত্বহীনতা। পহেলি উস্‌কো দারু অওর পরদার ছোড়নে বোলো। লেকিন হ্‌ম্‌সে ইয়ে ভি শুন্‌লেও—উহ্‌ দারু অওর পরদার ছোড়নে কভি সকেগা নেহি। তব্‌ ক্যায়সে হম উস্‌কো বাঁচায়েঙ্গে, বোলো? উসকো প্রারব্ধ উসকো ওহি পাপচারমেই রাখ্‌ দেগা।"—অর্থাৎ, তবে শোন তবে আমার কথা। তোমার বন্ধুর রোগ হচ্ছে পুরুষত্বহীনতা। সর্ব্বাগ্রে ওকে সুরা পান আর পরস্ত্রী গমন বন্ধ করতে বলো। তবে তুমি একথাও শুনে নাও—ও দুটো কখনো সে ছাড়তে পারবে না। কি ক'রে তা'হলে আমি ওকে বাঁচাই, ব'ল? ওর প্রারব্ধ ওকে ঐ পাপ-পঙ্কের মধ্যেই এবার রেখে দেবে।

ভক্তটি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া ব্যারিষ্টার-বন্ধুকে বাবার মন্তব্য শুনাইলেন। এ কথা শুনিয়া নীরবে ব্যারিষ্টার কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন। আত্মগ্লানিতে দুই চোখ বাষ্পাকুল হইয়া উঠিয়াছে, মৃদু স্বরে কহিলেন, "বাবা অন্তর্য্যামী—শক্তিধর মহাপুরুষ। কোন কিছুই তাঁর দিব্য দৃষ্টির অগোচর নেই। তিনি ঠিকই বলেছেন। ঐ দুটো পাপ কার্য্যের মোহ থেকে এ জীবনে আমি বোধহয় আর মুক্তি পাবো না।"

সেদিন সকাল বেলায় বালিয়াড়ীর সোপান বাহিয়া বাবার কক্ষে আসিয়া দাঁড়ান এক আর্ত্ত দর্শনার্থী। আশ্রমের এক ভক্তের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় আছে—ভক্তটি কহিলেন, "বাবা, এর নাম মাধব পাল, বাড়ী বরিশালে। এক সময়ে খুব বর্দ্ধিষ্ণু ব্যবসায়ী ছিলেন এরা, কিন্তু পাকিস্থান হবার পর সর্ব্বস্ব হারিয়েছেন, দিন যাপন ক'রছেন ভিখারীর মত। আপনার আশীর্ব্বাদের জন্য এসেছেন।"

আগন্তুককে আশীর্ব্বাদ দিয়া এবং দুই-চারিটি প্রবোধবাক্য বলিয়া বাবা সেদিনও বিবৃত করিলেন একটি সুন্দর কাহিনী :

বৈকুণ্ঠে বসে নারায়ণ আর লক্ষ্মী সেদিন বিশ্রম্ভালাপ করছেন। কথা-প্রসঙ্গে লক্ষ্মী বললেন, "প্রভু, তুমি এই বিশ্বচরাচর সৃষ্টি করেছো বটে,

কিন্তু মানুষ তোমায় পাবার জন্য মোটেই ব্যাকুল নয়, আসলে তারা চায় আমাকেই।”

দু'জনে কিছুটা বিতর্ক হলো, তারপর ঠিক হলো—এ-কথার সত্যতা যাচাই করতে হবে। মর্ত্যের এক ধনী শেঠের ভবনে দু'জনে হলেন উপস্থিত। লক্ষ্মী গিয়ে ঢুকলেন অন্দর মহলে, আর নারায়ণ এক দরিদ্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে আশ্রয় নিলেন ভবন-সংলগ্ন বাগিচার এক বেত-ঝোড়ে।

শেঠ-গৃহের সব দ্রব্য লক্ষ্মী স্পর্শ করছেন আর তা সোনা হয়ে যাচ্ছে। খাট, আলমারী, তৈজসপত্র, খাদ্যশস্য—সমস্ত কিছু এভাবে হলো সোনায় রূপান্তরিত। শেঠ ও তার ছেলে-মেয়েদের উৎসাহের অবধি নেই, সারা ঘর বাড়ী বোঝাই করে ফেললো স্বর্ণ দ্রব্য দিয়ে। স্থান সঙ্কুলান হচ্ছে না—এখন কি করা যায়? স্থির হলো, বাগিচায় নূতন অস্থায়ী ঘর তৈরী ক'রে সোনা-দানা রাখার ব্যবস্থা হবে। একাজ করতে গিয়ে শেঠের লোকজন ব্রাহ্মণ বেশী নারায়ণকে করলো উৎখাত। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের করুণ মিনতিতে তাদের হৃদয় দ্রব হলো না। দেখা গেল, লক্ষ্মীর কথাই যথার্থ। লোকে জগৎ-স্রষ্টা পরম পুরুষকে চায় না, আত্মজ্ঞানের পরম প্রাপ্তিকে চায় না—চায় অর্থ বৈভব, যা হচ্ছে বন্ধনের প্রধান কারণ।

আগন্তুক শ্রীপালকে বাবা কহিলেন, “দ্যাখো, জীবন হচ্ছে শ্বাস, বহু শ্বাস তো বাজে কাজেই নষ্ট করেছো এতগুলো বৎসর ধরে। এবার অবশিষ্ট শ্বাসগুলো ঈশ্বর ভাবনাও লাগাও। তাতেই প্রকৃত কল্যাণ হবে, প্রাণে আসবে সত্যকার শান্তি।”

এবার ভক্তদের দিকে তাকাইয়া প্রশান্ত কণ্ঠে নাঙ্গাবাবা কহিলেন, “আমার কাছে তো কতো লোকেই এসে ভীড় করে, আসে মনের কত কথা নিয়ে। কিন্তু আমি যে বসে আছি শুধু একটি মাত্র দাওয়াই নিয়ে; তা হচ্ছে ভবরোগের দাওয়াই। দুর্ভাগা মানুষ আমার কাছে এসে দাঁড়ায় ভব বন্ধনেরই জন্য। নূতন নূতন আকাঙ্ক্ষা পূরণের আবেদন

নিয়ে তারা ছুটে, আসে। কিন্তু আমার আস্‌লি দাওয়াইর কথায়, পরমা মুক্তির কথায় তারা তো কাণ দেয় না।”

করুণার অমৃত-ভাণ্ড হস্তে নিয়া আত্মজ্ঞানী শিবকল্প মহাপুরুষ এই বিশাল ভারতের দিকে দিকে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন দুই শতাধিক বৎসর ; আর্ত্তজনের কল্যাণে আর অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারে হইয়াছেন মুক্তহস্ত। এবার এই মহাজীবনের শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্য হয় সমাগত।

বারো বৎসর পূর্ব্বে ডায়েবেটিস রোগগ্রস্ত এক মৃতকল্প রোগী বাবার আশীর্ব্বাদে বাঁচিয়া উঠে। এই রোগটিকে বাবা এতদিন নিজ দেহে পুষিয়া রাখিতেছিলেন। সেবক-ভক্ত জ্ঞানানন্দ একবার এ বিষয়ে বাবার দৃষ্টি আকর্ষণ করায় তিনি উত্তর দেন,“জ্ঞানানন্দ, উহ্‌ হ্যায় হমারা তূণ্‌মে এক্‌ঠো বাণ্‌ জিসনে দেহান্তকো রাস্তে পর হমকো লে জায়গা।” অর্থাৎ, “জ্ঞানানন্দ, এ রোগটা হচ্ছে আমার তূণে রক্ষিত একটা প্রাণঘাতী বাণ। লগ্ন যখন আস্‌বে তখন এই বাণটিই ঠেলে দেবে আমায় দেহত্যাগের পথে।

এই বাণই বাবা এবার তাঁহার তূণ হইতে বাহির করিলেন। দেহটি হইল কাল রোগে আক্রান্ত।

কয়েক দিনের মধ্যেই, ১৯৬১ সালের ২৮শে আগষ্ট তারিখে, আসিয়া গেল মর্ত্তলীলার অবসানের পালা। পুরী তীর্থের এক নিভৃত কোণে গির্ণারী বস্তার পাহাড় শীর্ষে যে আত্মজ্ঞানের আলোক-স্তম্ভ এতদিন ছিল দেদীপ্যমান, এবার চিরতরে তাহা হইল অপসৃত।

ভারতের সাধক
শঙ্করনাথ রায়